SUVOM

Banglapdf.net Exclusive

মাসুদ রানা

ক্ষ্যাপা নর্তক

শয়তানের দূত

কাজী আনোয়ার হোসেন

দুটি বই একত্রে

সেবা প্রকাশনী

ANIK

কাজী আনোয়ার হোসেনের

মাসুদ রানা

[দুটি বই একত্রে]

ক্ষ্যাপা নর্তক

বারো জন প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক নিখোঁজ। শেষের জন নিখোঁজ হয়েছেন চোখের সামনে থেকেই।
ডক্টর সাদেকের মাকে কথা দিয়েছে রানা, যেমন করেই হোক খুঁজে এনে দেবে সে তাঁর ছেলেকে।
একমাত্র সূত্র হুবার্ট ডনফিল। ছুটল রানা লন্ডন হয়ে মিউনিখ।

শয়তানের দূত

অদ্ভুত গতিসম্পন্ন গোলাকৃতি একটা উড়ন্ত বস্তু ধরা পড়ে রাডারে দুই সেকেন্ডের জন্যে, পরমুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে যায়। শব্দের চেয়ে এগারো গুণ বেশি গতিবেগ। কি ওটা? জানার ভার পড়ল পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ) কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের অপারেটার মিস সোহানা চৌধুরীর উপর।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

মাসুদ রানা

ক্ষ্যাপা নর্তক

শয়তানের দূত

(দুটি বই একত্রে)

কাজী আনোয়ার হোসেন

A
BANGLAPDF.NET
PRESENTS

সেবা প্রকাশনী

Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!
Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!
Don't Remove This Page!
EDIT & SCAN
SUVOM
Visit Us at Banglapdf.net
If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

বত্রিশ টাকা

ISBN 984-16-7606-0

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব প্রকাশকের

প্রথম প্রকাশ: ১৯৭১
পঞ্চম প্রকাশ: ১৯৯৮

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা: রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩ ৪১ ৮৪
জি. পি. ও. বক্স নং ৮৫০

পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

Masud Rana
KSHYAPA NARTAK

SHOYTANER DOOT
Two Thriller Novels
By: Qazi Anwar Husain

Rana- 23, 24

ক্ষ্যাপা নর্তক

শয়তানের দূত

কাজী আনোয়ার হোসেন

Scan & Edited By:

Suvom

Website:

www.Banglapdf.net

FACEBOOK:

https://www.facebook.com/groups/Banglapdf.net/

ক্ষ্যাপা নর্তক : ৫—১০১
শয়তানের দূত : ১০২—১৮৪

A SUVOM CREATION

এক নজরে
মাসুদ রানা সিরিজের সমস্ত বই

ধ্বংস-পাহাড় *ভারতনাট্যম *স্বর্ণমৃগ *দুঃসাহসিক *মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা দুর্গম দুর্গ *শত্রু ভয়ঙ্কর *সাগরসঙ্গম *রানা! সাবধান!! *বিস্মরণ *রত্নদ্বীপ নীল আতঙ্ক*কায়রো *মৃত্যুপ্রহর*গুপ্তচক্র *মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র *রাত্রি অন্ধকার *জাল *অটল সিংহাসন *মৃত্যুর ঠিকানা *ক্ষ্যাপা নর্তক *শয়তানের দূত* এখনও ষড়যন্ত্র *প্রমাণ কই? *বিপদজনক *রক্তের রঙ *অদৃশ্য শত্রু পিশাচ দ্বীপ *বিদেশী গুপ্তচর *ব্ল্যাক স্পাইডার *গুপ্তহত্যা *তিন শত্রু অকস্মাৎ সীমান্ত *সতর্ক শয়তান *নীলছবি *প্রবেশ নিষেধ *পাগল বৈজ্ঞানিক এসপিওনাজ *লাল পাহাড় *হৃৎকম্পন *প্রতিহিংসা *হংকং সম্রাট *কুউউ! বিদায় রানা *প্রতিদ্বন্দ্বী *আক্রমণ *গ্রাস *স্বর্ণতরী *পপি *জিপসী *আমিই রানা সেই উ সেন *হ্যালো, সোহানা *হাইজ্যাক *আই লাভ ইউ, ম্যান সাগর কন্যা *পালাবে কোথায় *টার্গেট নাইন *বিষ নিঃশ্বাস *প্রেতাত্মা বন্দী গগল *জিম্মি *তুষার যাত্রা *স্বর্ণ সংকট *সন্ন্যাসিনী *পাশের কামরা নিরাপদ কারাগার *স্বর্গরাজ্য *উদ্ধার *হামলা *প্রতিশোধ *মেজর রাহাত লেনিনগ্রাদ *অ্যামবুশ *আরেক বারমুডা *বেনামী বন্দর *নকল রানা রিপোর্টার *মরুযাত্রা *বন্ধু *সংকেত *স্পর্ধা *চ্যালেঞ্জ *শত্রুপক্ষ চারিদিকে শত্রু *অগ্নিপুরুষ *অন্ধকারে চিতা *মরণ কামড় *মরণ খেলা অপহরণ *আবার সেই দুঃস্বপ্ন *বিপর্যয় *শান্তিদূত *শ্বেত সন্ত্রাস *ছদ্মবেশী কালপ্রিট *মৃত্যু আলিঙ্গন *সময়সীমা মধ্যরাত *আবার উ সেন *বুমেরাং কে কেন কিভাবে *মুক্ত বিহঙ্গ *কুচক্র *চাই সাম্রাজ্য *অনুপ্রবেশ যাত্রা অশুভ *জুয়াড়ী *কালো টাকা *কোকেন সম্রাট *বিষকন্যা *সত্যবাবা *যাত্রীরা হুঁশিয়ার *অপারেশন চিতা *আক্রমণ '৮৯ *অশান্ত সাগর শ্বাপদ সংকুল *দংশন *প্রলয়সঙ্কেত *ব্ল্যাক ম্যাজিক *তিক্ত অবকাশ ডাবল এজেন্ট *আমি সোহানা *অগ্নিশপথ *জাপানী ফ্যানাটিক সাক্ষাৎ শয়তান *গুপ্তঘাতক *নরপিশাচ *শত্রুবিভীষণ *অন্ধ শিকারী দুই নম্বর *কৃষ্ণপক্ষ *কালো ছায়া *নকল বিজ্ঞানী *বড় ক্ষুধা *স্বর্ণদ্বীপ রক্তপিপাসা *অপচ্ছায়া *ব্যর্থ মিশন*নীল দংশন *সাউদিয়া ১০৩*কালপুরুষ নীল বজ্র *মৃত্যুর প্রতিনিধি *কালকূট *অমানিশা *সবাই চলে গেছে* অনন্ত যাত্রা রক্তচোষা *কালো ফাইল *মাফিয়া *হীরকসম্রাট *সাত রাজার ধন।

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভাড়া দেয়া বা নেয়া, কোনভাবে প্রতিলিপি তৈরি করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোন অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা নিষিদ্ধ।

ক্ষ্যাপা নর্তক

প্রথম প্রকাশ: জুলাই, ১৯৭১

SUVOM

এক

'বেঁচে থাকো। শতবর্ষ পূর্ণ হোক তোমার।' মনে মনে মেজর জেনারেল রাহাত খানকে আশীর্বাদ করল রানা।

তেহরানের অভিযান শেষ করে করাচী, ওখান থেকে সরাসরি ব্যাঙ্কক, সেখান থেকে ঢাকায় ফিরে রিপোর্ট করার পরদিনই দুরু দুরু বুকে ছুটির দরখাস্ত করেছিল রানা। একটি কথাও বলেননি রাহাত খান। মুখ তুলে তাকিয়েছিলেন একবার ভুরু কুঁচকে। তারপর অ্যাশট্রে থেকে চুরুটটা বাঁ হাতের দু'আঙুলে তুলে ডান হাত দিয়ে কলমটা উঠিয়ে সই করে দিলেন খস্ খস্ করে। খস্ খস্ শব্দটা রানার সারা শরীরে ঠাণ্ডা নরম পরশ বুলিয়ে দিল যেন। হাঁপ ছেড়ে আশীর্বাদ করে বসল ও।

দরজার কাছে এসে নবে হাত দিতেই বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত অপ্রত্যাশিত শব্দটা কানে ঢুকল, এবং ধড়াস করে লাফিয়ে উঠল বুকের ভিতর হৃৎপিণ্ডটা।

'শোনো।'

ধীর পায়ে ফিরে এল রানা ডেস্কের কাছে। শুকিয়ে গেছে মুখ। যেন মস্ত কোন অপরাধ করে ধরা পড়ে গেছে হাতেনাতে।

'ছুটি নিচ্ছ বিশ্রামের জন্যে?'

'জী, স্যার।' উত্তর নিয়ে বিস্ময়বোধক চিহ্নের মত একই জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল রানা।

'আচ্ছা, যাও।' টাইপ করা কাগজগুলোর ওপর থেকে চোখ না সরিয়ে বিদায় দিলেন রাহাত খান।

বড়সড় একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন বুকের ভিতর নিয়ে বেরিয়ে এল রানা। এমন তো হয় না। পিছু ডেকে ও-কথা জানতে চাওয়ার মানে? প্রশ্নটা করে উপদেশই বিতরণ করেছে বুড়ো: 'ছুটি নিচ্ছ, বিশ্রাম নিয়ো।' কেন? তবে কি···

রক্ত ছলকে উঠল বুকের ভিতর। গাড়ির রিয়ার ভিউয়ে কঠোর দেখাল নিজের মুখটা। উত্তেজনার আমেজ ছড়িয়ে পড়ল সারা দেহে। দশ জোড়া চোখ ওঁর, কোনও কিছু ফাঁকি দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারে না। কোথাও না কোথাও বিপদ সঙ্কেত দেখেছেন। তাই ইঙ্গিতে সতর্ক করে দিয়েছেন। তার মানে আবার অ্যাসাইনমেন্ট।

কুছ পরোয়া নেই। একটা দিন হেসে খেলে স্ফূর্তি করে কাটানো যাক। তারপর মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ওয়ালাইকুম সালাম বলে মৃত্যুকে ফেরত

পাঠানো যাবে আরও একবার। মৃত্যুর সামনে গিয়ে দাঁড়ানো—সে তো ওর প্রিয় গন্তব্যস্থল। ভয় হয়, কিন্তু কেমন একটা নেশাও আছে।

বাড়িটা খাঁ খাঁ করছে। রাঙার মা গেছে মীরপুর মাজারে সিন্নি দিতে। বিদেশ থেকে রানা ফিরলেই ছোটে রাঙার মা মোখলেসকে নিয়ে। রানাকে বহাল তবিয়তে রাখার প্রার্থনা মঞ্জুর হয় দেখে মীরপুরের মাজারের প্রতি একনিষ্ঠ বিশ্বাস রাঙার মার।

গরম পানিতে শাওয়ার সেরে সুটেড বুটেড হয়ে বেরিয়ে এল রানা বাথরুম থেকে। রিস্টওয়াচ পরতে পরতে সময় দেখল: পাঁচটা পঁয়তাল্লিশ। শীতকাল। সন্ধ্যা ঝাঁপিয়ে পড়েছে ঢাকার বুকে। রুম বন্ধ করে গাড়িতে এসে উঠল রানা। মনের ভিতর সারাক্ষণ এধার থেকে ওধার দুলছে পেন্ডুলামের মত মেজর জেনারেল রাহাত খানের কথাটা।

বিলিয়ার্ড খেলার প্রোগ্রাম আজ সন্ধ্যায় ক্লাবে। মেজাজটা বিগড়ে গেল হঠাৎ রানার। এই মেন্টাল টর্চারের কোনও মানে হয় না। কথাটা না বললে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেত?

গাড়ি ছেড়ে দিল রানা। ওর রাগের কোন মানে হয় না একথা ভাল করেই জানে রানা। যেটা যতটুকু বলা প্রয়োজন ততটুকুই বলবে বুড়ো।

আজ গাঢ় কুয়াশা নেমেছে শীতকালীন সন্ধ্যায় ঢাকার বুকে। আরে—এ কি! আনন্দে বিস্ময়ে এদিক ওদিক তাকাল রানা। খেয়াল হয়নি এতক্ষণ ওর। কিন্তু কখন হলো এই অকাল বৃষ্টি! রাস্তা ভিজে। দু'পাশের উঁচু গাছগুলোর পাতা চিকচিক করছে নিওনের ধবধবে সাদা আলো লেগে! এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। রানার সাথে একই সময়ে প্ল্যান করে নিয়েছে রূপসী ঢাকা শহর।

রমনা পার্কের পাশ ঘেঁষে চলেছে গাড়ি। অলস ভঙ্গিতে ড্রাইভ করছে রানা। চোখের সামনে ভাসছে বিয়ারের ফেনা। গা গরম করে নিয়ে খেলা শুরু করবে ও। সোহানাকে অফিস থেকে আধ ঘণ্টা আগে ছুটির ব্যবস্থা করে দিয়েছে আজ রানা। অপেক্ষা করছে সে ক্লাবে। দুটো গেম শেষ করেই ডিনার খাবে পূর্বাণীতে। কাল থেকে ছুটি রানার। দশ দিনের সময় কাটাবার ছক তৈরি করার চেষ্টা করল রানা। পকেট থেকে চেস্টারফিল্ডের প্যাকেট বের করল।

গাড়ি ঘোড়া রাস্তায় একটাও নেই। ডাইনে পার্ক। বাঁয়ে রেসকোর্স। কুয়াশায় দৃষ্টি চলে না মাঠের দিকে। এদিককার স্ট্রীট নিওনগুলো জ্বলছে না। দূরের চৌমাথায় কুয়াশাবৃত টুকরো টুকরো আলো। রাস্তার দু'পাশে প্রায় অন্ধকার। হঠাৎ কথাটা মনে পড়ল রানার। শহরে অসামাজিক কার্যকলাপ উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। নির্জন রাস্তায় একা পেলে আর কথা নেই। ঝাঁপিয়ে পড়ছে গুণ্ডাদল। পেশাদারীরা তো চিরকাল আছেই। অপেশাদার গুণ্ডাদলও মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে অসংখ্য। এদের মধ্যে শিক্ষানবীশ ভদ্র পরিবারের ছেলে ছোকরারাও আছে। ঘড়ি, কলম, টাকা ছিনিয়ে নিচ্ছে সুযোগ পেলেই। কিলঘুসি জুটছে নিরীহ পথিকদের পেটে-কপালে, একটু বাধা দেবার চেষ্টা করলে প্রাণ নিয়ে টানাটানি হচ্ছে। কিন্তু কেন এমন হয়?

আসল কারণ অর্থনীতি। শোষণ, দুর্নীতি ইত্যাদি বন্ধ না হলে এসব বাড়তেই থাকবে। জনসংখ্যা হু হু করে বাড়ছে। অথচ অর্থের সুষম বণ্টন হচ্ছে না। ওয়েলফেয়ার স্টেটের প্রচলন দরকার দেশে। চিন্তার কিছু নেই। মনকে প্রবোধ দিল রানা। দেশ সেদিকেই এগোচ্ছে। জাতীয়তাবাদ তারই প্রথম পদক্ষেপ। কিন্তু দিল্লী অনেক দূরস্ত।

জ্বলন্ত সিগারেটটা তুলে এক সেকেন্ড দেরি করল ঠোঁটে ঠেকাতে রানা। সুষ্ঠু সমাজ কিভাবে গড়ে উঠবে সেই চিন্তায় মগ্ন ছিল বলে আগে থেকে গাড়িটা নজরে পড়েনি ওর। বিরাট একটা ওপেল রেকর্ড রেসকোর্সের কাঠের ঘেরের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ড্রাইভিং সীটে কেউ আছে কিনা লক্ষ করার সময় পেল না রানা। ওপেলের পিছনে একটা বেবীট্যাক্সি। ট্যাক্সি ড্রাইভার মাটিতে নামতে উদ্যত। পাশেই একটি যুবতী দাঁড়িয়ে। কার্ডিগান আর শাড়ি দেখতে পেল শুধু রানা। রাস্তার মাঝখান দিয়ে গাড়ি নিয়ে ছাড়িয়ে এসেছে ওদেরকে ও। যুবতীকে আড়াল করে একজন লোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে রানা। খটকা লাগল। শাড়ি দেখে আর আকার-আকৃতি আন্দাজ করে যুবতীটিকে এ দেশীয় বলে ধরে নেয়া যায়। কিন্তু লোকটা নিগ্রো।

এদিকটা অন্ধকার আর ফাঁকা বলে দেহ ব্যবসার গোপন কাণ্ডকারখানা চলে। কিন্তু এ ব্যাপারটা বোধ হয় তা নয়। রিয়ার ভিউয়ে তাকাল রানা। দেখতে পাওয়া গেল না পরিষ্কার। স্লো করল গাড়ি ও। ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাবার একমুহূর্ত পরই ইতি-কর্তব্য স্থির করে ফেলল রানা। নিগ্রোটা যুবতী মেয়েটিকে জাপটে ধরে খেলনা পুতুলের মত অনায়াসে তুলে নিয়েছে দুই হাতের উপর। শূন্যে হাত পা ছুঁড়ে কৈ মাছের মত লাফাচ্ছে মেয়েটি।

ঘোড়ার মত লাফ মেরে উঠল গাড়িটা। ডান দিকে নাক ঘুরে গেল মুহূর্তে। রাস্তা ছেড়ে মাটিতে পড়ল সামনের দুটো চাকা। বিরতি না নিয়ে স্টিয়ারিং ঘোরাল রানা। তীর বেগে বিপরীতমুখী হলো গাড়ি। মাঝ রাস্তা ছেড়ে রঙ সাইডে চলে এল। ওপেলটার নাক বরাবর ছুটছে। মেয়েটিকে পরাস্ত করে ওপেলের ব্যাক সীটে তুলে নিয়েছে নিগ্রো। বেবীট্যাক্সির ড্রাইভার তার ত্রিচক্রযানের পাশে পড়ে রয়েছে মাটিতে মুখ থুবড়ে।

ওপেল স্টার্ট নিল। এক সেকেন্ড পরই রানার গাড়ি ওপেলের মুখোমুখি আধ হাত ব্যবধানে ঝাঁকুনি দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। ড্রাইভার মাথা বের করে চেঁচিয়ে উঠল অশ্রাব্য ভাষায়। সামনে এগোবার রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে রানা তার। পিছনে বেবীট্যাক্সি।

এক ঝটকায় দরজা খুলে নেমে পড়ল রানা। গাড়ির হেড লাইটে চকচক করছে ড্রাইভারের হাতের ড্যাগারটা। লোকটা সীটের উপর থেকেই ড্যাগার তুলে ধরেছে ভয়ঙ্কর ভঙ্গিতে। ভয় দেখিয়ে ভাগাতে চায় রানাকে।

ওপেলের জানালাগুলোর কাঁচ তুলে দেয়া। দরজা চারটেই বন্ধ করে দিয়েছে। মেয়েটি ধস্তাধস্তি করছে ব্যাক সীটে। নিগ্রোটা তার মুখে রুমাল চেপে ধরে সেঁটে ধরেছে সীটের সাথে। দু'পা মাত্র এগোল রানা। তারপর

শান্ত, নিরীহ ভাব করে একটা আঙুল তুলে ইঙ্গিত করল ড্রাইভারকে। ওকে বেরিয়ে আসতে বলছে ওপেল থেকে রানা। ব্যাপারটা যেন আদৌ বুঝে উঠতে পারেনি ও। ড্রাইভারকে ডাকছে প্রকৃত ঘটনা শোনার কৌতূহলে।

দাঁতের সাথে দাঁত ঘষে বাংলার ৫-এর মত বিকৃত মুখ ভঙ্গি করে আবার গাল দিল ড্রাইভার। দরজা খোলার লক্ষণ নেই। ছোরাটা দিয়ে ইঙ্গিত করল: গাড়ি সরিয়ে না নিলে গেঁথে ফেলবে রানাকে।

মুখের নিরীহ ভাব একটুও বদলাল না রানার। ওর ভালমানুষী ড্রাইভার বুঝতে পারেনি বলে অসহায় বোধ করছে যেন ও। আস্তে আস্তে আরও দু'পা এগোল। তারপরই বিদ্যুৎ খেলে গেল সারা দেহে।

একটা পা বাড়িয়েই মুঠো পাকানো হাতটা প্রচণ্ড বেগে মারল জানালার কাচে। কাঁচ ভেঙে কনুই অবধি ঢুকে গেল হাত। ড্রাইভারের কানের নিচে পনেরো সের ওজনের ঘুসিটা টক্কর খেল। ব্যথায় দাঁতে দাঁত চাপল রানা। কাঁচের সাথে সংঘর্ষে হাতের চামড়া ছিঁড়ে গেছে। ভিতর থেকে হাতল টেনে দরজাটা খুলে ফেলল ও। দ্রুত বাঁকা হলো ড্রাইভার হাত থেকে খসে পড়া ছোরাটা পায়ের নিচে থেকে কুড়িয়ে নেবার জন্য। বাইরে থেকে রানার সবুট লাথি পেটে খেয়ে 'কোঁত' করে শব্দ করে কুঁকড়ে গেল লোকটা সেই নুয়ে পড়া অবস্থায়। পিছনের সীট থেকে আর্তনাদটা উঠল তখনই। রিভলভারের বাঁটটা পলকের জন্যে নিগ্রোটার হাতে দেখতে পেল রানা।

বাঁটের ঘা দিয়ে মেয়েটিকে সাময়িকভাবে ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে রিভলভারটা ঘুরিয়ে নিল নিগ্রো। চোখ দুটো চঞ্চল হয়ে উঠল। রানাকে দেখতে পাচ্ছে না সে আগের জায়গায়। পালিশ করা কালো জুতোর মত মুখটায় হিংস্র হাসি ফুটল একটু। যার অর্থ: রিভলভারের সাথে চালাকি করে পালাবে কোথায় বাছাধন। মেয়েটির উপর ঝুঁকে পড়ে বাইরে তাকাল সে। বাঁয়ে নেই রানা। ডান দিকটা দেখল। নেই।

ঘর্মাক্ত মুখটা কদর্য হয়ে উঠল। নিরস্ত্র রবাহুতের ক্ষুদ্র চালাকির মর্ম বুঝতে না পেরে রাগে গায়ের চামড়া জ্বালা করছে। ছিঁড়ে খেয়ে ফেলবে সে রানাকে হাতের নাগালে পেলে। ড্রাইভিং সীটের দিকে তাকিয়ে সিদ্ধান্ত নেবার চেষ্টা করল লোকটা। বিপদটা টের পাচ্ছে ক্রমশ। সামনের গাড়ি না সরালে সামনে বাড়বার কোনও উপায় নেই। পিছনে বেবীট্যাক্সি। প্রকাণ্ড দেহ নিয়ে ব্যাক ডোর খুলে নিচে নামল সে। ট্রিগারে চেপে বসেছে আঙুল। আগুন বেরুচ্ছে কুচকুচে কালো মুখের উপর বসানো টকটকে লাল চোখ জোড়া থেকে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেলে খোঁজার চেষ্টা করল রানাকে। কান পেতে দেখল মুখোমুখি রানার গাড়িটার দিকে তাকিয়ে। মাথার পিছনে ঝট্ পট্ ঝট্ পট্ শব্দ হলো। সবেগে দেহ মুচড়ে ঘুরে দাঁড়াল লোকটা।

মাথার উপর দিয়ে উড়ে যেতে যেতে ডেকে উঠল একটা বাদুড়। জ্বলন্ত চোখ দুটো উপর পানে তুলে বাদুড়টাকে ভস্ম করে দিতে চাইল যেন লোকটা।

মাত্র এক সেকেন্ড সময় পেল রানা। রিভলভার দেখে বসে পড়ে হামাগুড়ি

দিয়ে ওপেলের পিছনে চলে এসেছে ও। জুতোর খাপ থেকে ছুরিটা হাতে নিয়ে রেখেছে আগেই। ছুঁড়ে দিল সেটা সবেগে। উড়ন্ত ছুরিটা রিভলভার ধরা হাতটার কব্জির উপরে এসে বিঁধে গেল নিগ্রোর। ডাইভ দিল রানা। ছুরিবিদ্ধ হবার বিস্ময় কাটবার আগেই রানার উড়ন্ত দেহটা সজোরে এসে টক্কর খেল নিগ্রোর বুকে। নিগ্রো ভূপাতিত হলো রানাকে বুকে নিয়ে।

বাঁ কনুই ঠুকে গেল মাটির সাথে রানার। নিগ্রো ফেলে দিল ওকে বুকের উপর থেকে। পেটা শরীর লোকটার। রিভলভার খুইয়ে নার্ভাস হয়নি একটুও। ঘুসি মারল সে রানার ডান চোখ লক্ষ্য করে। সবেগে মাথা কাত করে চোখ বাঁচাল রানা। রানার বুকের উপর বুক চেপে ধরেছে নিগ্রো। নিগ্রোর কণ্ঠনালী চেপে ধরল ও। উভয়সংকটে পড়ল লোকটা। উপুড় হয়ে পড়ে থাকার ফলে গলা বাঁচাবার জন্যে হাত ব্যবহার করা অসম্ভব। এই সুযোগে পা দুটো দিয়ে পাশ থেকে জোড়া লাথি মারল রানা।

নিগ্রো বক্ষচ্যুত হলো। গলা ছেড়ে দিয়ে দুই পায়ের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়েই ডান পা চালাল রানা। চিবুকে লাথি খেয়ে মুখ হাঁ করে অবোধ্য ভাষায় যন্ত্রণাক্ত শব্দ বের করল নিগ্রো। বুক ভরে শ্বাস নিয়ে দ্বিতীয় লাথি চালাল রানা।

অপেক্ষাতেই ছিল লোকটা। লুফে নিল রানার পা। সেটা ধরে উঠে বসতে বসতে সজোরে ঠেলে দিল সামনে। চিৎ হয়ে পড়ল দূরে রানা। ডাইভ দিল নিগ্রো। গড়িয়ে সরে গেল রানা। দেড় সেকেন্ড পর রয়েল বেঙ্গল টাইগার আর আফ্রিকান লায়ন মুখোমুখি দাঁড়াল মাঝখানে পাঁচ হাত ব্যবধান রেখে। ঘাড় নিচু করে সিংহের মতই ছুটে এল নিগ্রো।

তৈরি ছিল রানা। চোখের পলকে পাশে সরে এগিয়ে আসা নিগ্রোর মুখে ঘুসি মারল ও। দাঁড়িয়ে পড়ল, তারপর পিছিয়ে গেল এক পা লোকটা। ঝাঁপিয়ে পড়ল রানা। পরপর আরও দুটো ঘুসি যোগ করল নিগ্রোর মুখে। মুখ রক্ষার চেষ্টা করল নিগ্রো। নাক বরাবর মারল রানা। ঠোঁটের কষ বেয়ে রক্ত ঝরছে লোকটার। তলপেট বেছে নিল রানা। 'কোত' করে আওয়াজ বেরুল। দ্বিতীয় লাথিটা উঠিয়ে ক্ষান্ত হলো রানা। পালাচ্ছে নিগ্রো। পিছন থেকে কাঁধে কারাতের কোপ মারল। এতক্ষণে মুখ থুবড়ে পড়ল প্রকাণ্ড দেহ। এগিয়ে গিয়ে লাথি চালাল রানা।

এক হালি সবুট লাথি খেয়ে জ্ঞান হারাল আফ্রিকান লায়ন। হাত ঝাড়তে ঝাড়তে পিছিয়ে এল কয়েক পা রানা। ঘুরে দাঁড়াল ও। দুটো নরম বাহু জড়িয়ে ধরল ওকে। বুকের কাছে প্রায় মুখ ঠেকিয়ে কেঁদে উঠল মেয়েটি। ওপেল থেকে কখন বেরিয়ে এসে পিছনে দাঁড়িয়েছিল।

অস্বস্তিবোধ করল রানা। ছাড়াবার চেষ্টা করল নিজেকে ও। বেশ আঁট করে আঁকড়ে ধরেছে মেয়েটি। এদিক ওদিক তাকাল রানা। কিছু বলার চেষ্টা করল। কিন্তু কি বলবে ভেবে না পেয়ে চুপ করে রইল ও। থরথর করে কাঁপছে মেয়েটি রানার গায়ের সাথে গা ঠেকিয়ে। দুর্বল, অসহায় একটি যুবতীর সারা শরীরের কাঁপন অনুভব করছে রানা।

'মাসুদ ভাই···মাসুদ ভাই,'—মেয়েটি ফুঁপিয়ে উঠল আবার। তারপর আবার বলল, 'আপনি না এসে পড়লে কুকুরটা আমার সর্বনাশ···'

চোখ পিট পিট করে তাকাল মেয়েটির মাথার দিকে রানা। চেনা মেয়ে নাকি।

'দেখি,' জোর করে হাত দুটো ধরে মৃদুভাবে টেনে আনল রানা পিছন থেকে। তারপর পিছিয়ে এল একটু। মুখ তুলল মেয়েটি। চেনা চেনা ঠেকল মুখের আদলটা। স্মৃতির পাতা উল্টে যেতে লাগল রানা। বলে উঠল, 'তুমি! তুমি না ডক্টর সাদেকের ছোট বোন?' সবিস্ময়ে তাকিয়ে রইল রানা। মাথা নেড়ে সায় দিল মেয়েটি। রানা বলল, 'চলো, গাড়িতে উঠি।' রিভলভারটা কুড়িয়ে নিল ওপেলের পাশ থেকে রানা। একটি ল্যুগার।

গাড়ি ছেড়ে দিয়ে রুমালটা বাড়িয়ে দিল ফিরোজার দিকে রানা, 'কোথায় যাচ্ছিলে তুমি? কার সাথে এসেছ ঢাকায়?'

'মহম্মদপুরে মামার বাড়ি। সবাই এসেছি আমরা। শপিং করতে বেরিয়েছিলাম ভাইদের সাথে। ওরা সিনেমায় গেল ইভনিঙ শোয়ে। আমার মাথাটা ধরেছিল বলে বাড়ি ফিরছিলাম।' ভাঙা গলায় বলে চলল ফিরোজা, 'দশ বারোদিন হলো এসেছি আমরা। বাইরে বের হলেই পিছু নিত ওই গাড়িটা। আমি···'

'নিগ্রোটাকে চেনো?'

'না। তবে···'

'তবে?'

'বড়দার সাথে ক'বার আমাদের টঙ্গীর বাড়িতে দেখা করেছে লোকটা। শেষ দিকে এলে আমরা বলতাম বড়দা বাড়ি নেই। বড়দাই শিখিয়ে দিয়েছিল আমাদেরকে। লোকটার কথা জানতে চাইলে কোনও উত্তর না দিয়ে শুধু গম্ভীর হয়ে যেত বড়দা।'

'কোথায় এখন ও?'

একটু ইতস্তত করে ফিরোজা বলল, 'করাচী গেছে। এসে পড়বে আগামীকাল। কিন্তু কথাটা কেউ জানে না। বড়দা কেন জানি সবার কাছে চেপে রাখতে বলেছে ওর যাবার কথাটা। আমার মনে হয় সে ওই নিগ্রো লোকটার ভয়েই।'

রানা কথা বলল না সাথে সাথে। চিন্তা করছিল ও। ডক্টর সাদেকের চরিত্র সম্পর্কে অজ্ঞ নয় ও। নিরীহ, সাংসারিক, বিজ্ঞান সাধক সে। তার সাথে নিগ্রোটার সম্পর্ক কি?

রানা জিজ্ঞেস করল, 'আগামীকালই ফিরবে ও?'

মাথা কাত্ করে ফিরোজা বলল, 'ফিরবে। কাল যে আমাকে···' কলেজে পড়ুয়া মেয়ে ফিরোজার গাল লাল হয়ে উঠল।

রানা বলল, 'কাল বুঝি তোমাকে দেখতে আসবে বরপক্ষ?'

'জ্বী।' ফিরোজা ঘাড় নিচু করে বলল, 'আপনাকে থাকতে হবে কিন্তু, মাসুদ ভাই।'

হাসি হাসি মুখ করে গাড়ি চালাতে লাগল নিঃশব্দে রানা।

চার বোন ঘিরে ধরল রানাকে। ফিরোজা রুগ্না মার বুকে মুখ গুঁজে কান্না জুড়ে দিয়েছে গাড়ি থেকে নেমে বাড়িতে ঢুকেই। ভাইগুলো আর ওদের বড় বোনটি ছাড়া পরিবারের সবাই উপস্থিত। বড়টির বিয়ে দেয়া হয়েছে গত বছর। মামা-মামীও রয়েছে ওদের চার বোনের সাথে। পাঁচটি মিনিট অস্বস্তিকর ভাবে কাটল। তারপর ধীরে ধীরে সব কথা বলল ফিরোজা। শুনতে শুনতে আঁতকে উঠল সবাই। চার বোন চোখ বড় বড় করে দেখছে রানাকে। বৃদ্ধা মায়ের চোখে পানি। মামার চোখে প্রশংসা আর বিস্ময়। মামী ব্যস্তসমস্ত হয়ে পড়েছে রানাকে বসতে দেবার জায়গা বাছতে।

চোখের পানি শাড়ির আঁচলে মুছতে মুছতে ডক্টর সাদেকের আম্মা রানার সামনে এসে দাঁড়িয়ে কাঁপা হাতে ওর একটা হাত ধরে বলে উঠল, 'এসো বাবা, বসো। তুমিও আমার নিজের ছেলে। যে উপকার করলে আজ আমাদের তা খোদা ছাড়া আর কেউ বুঝবে না। কালকে ওকে দেখতে আসবে। একটা কিছু ঘটে গেলে কি করে মুখ দেখাতাম!' শিউরে উঠল বৃদ্ধা।

রানা বলল, 'কিন্তু লোকটা সম্পর্কে জানা গেল না কিছু।'

'কি জানি বাবা—আমার সাদেক যেন কেমন গুম মেরে গেছে। জিজ্ঞেস করলে চুপ করে থাকে। কাল ফিরবে ও। তুমিই জিজ্ঞেস করে দেখো। বউমাকে নিয়ে কাল বিকেলে তোমাকে আসতে হবে বাবা একবার।'

রানা চমকাল না। সব কথা মনে আছে ওর। ডক্টর সাদেকের টঙ্গীর* বাড়িতে অনীতাকে স্ত্রীর পরিচয় দিয়ে নিয়ে গিয়েছিল একবার ও। যুক্তি দেখাল ও একটু ভেবে নিয়ে, 'আপনার বউমা বাপের বাড়ি গেছে।'

মেঝ বোনটি এই প্রথম কথা বলে উঠল সবার আগে, 'বেশ তো। আপনি তো আর ভাবীর সাথে শ্বশুর বাড়ি যাননি। আপনাকে আসতে হবে, মাসুদ ভাই।'

'কিন্তু—'

রানা কথা শেষ করতে পারল না। ফিরোজা সামনে এগিয়ে এসে বলল, 'আচ্ছা সে দেখা যাবে। আপনাকে আনবার ব্যবস্থা আমরা করব। এখন চলুন মুখ হাত ধুয়ে নেবেন, মাসুদ ভাই।'

ক্লাবে গিয়ে বিলিয়ার্ড খেলা চুলোয় গেল। পরবর্তী দেড়ঘন্টা জোর করে আটকে রাখল ওরা রানাকে। শেষ পর্যন্ত রাত্রির খাওয়াটা না খাইয়ে ছাড়ল না।

যাবার কথা বলে দিয়েছিল পাঁচটায়। যাবে কিনা ভাবছিল রানা। কিন্তু সিদ্ধান্ত নেবার আগেই, চারটের সময়, গেট দিয়ে হৈ হৈ করে ঢুকে পড়ল চার বোন

---

* নীল আতঙ্ক দেখুন।

তিন ভাই। মোখলেস ওদেরকে ভিতরে নিয়ে এসে বসাল। খিলখিল করে হেসেই সারা সবাই। সেজটি বুকে হাত বেঁধে বলে উঠল, 'ইউ আর আন্ডার অ্যারেস্ট, মাসুদ রানা দি গ্রেট। পাঁচ মিনিট সময় দেয়া হলো কাপড় পরতে। দেরি হলে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে নিয়ে যেতে বাধ্য হব।'

অজুহাত এখানে অচল বুঝতে পারল রানা। ওদের উচ্ছল আনন্দে যোগ না দিয়ে উপায় নেই দেখে বেরিয়ে এল ও। গ্যারেজ থেকে গাড়ি বের করা হয়ে গেছে দেখে প্রশ্নবোধক চোখে তাকাল রানা। মোখলেস বলল, 'দিদিমণিরা বললেন কিনা।'

খিলখিল করে হেসে উঠল চার বোন তিন ভাই। সে হাসিতে যোগ দিল রানাও। নিজেকে ওদের মাঝে হারিয়ে ফেলে কেমন যেন পরম আনন্দ পেল হঠাৎ রানা। পুরানো অভাবটা তখনই বিঁধল খচ্ করে বুকে। এ জীবনের স্বাদ পায়নি সে কোনদিন।

বড় অদ্ভুত লাগে এই পরিবারটিকে রানার। পরকে আপন করে নেবার আশ্চর্য মানসিকতা আছে ওদের। মেঝ ছেলেটি ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করে বেরিয়েছে। সংসারে স্বচ্ছলতা না এলেও স্বাভাবিকতা এসেছে এখন। ডক্টর সাদেকের মাথার বোঝা হালকা হয়েছে খানিকটা। মারীতে হাওয়া বদলাতে পাঠিয়েও বৃদ্ধা মার অসুস্থতা কাটেনি পুরোপুরি। সংগ্রামী পরিবার। দুই ভাই, চার বোন পড়ে, কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে। প্রচুর খরচ। স্বচ্ছলতা নেই, কিন্তু হেসে খেলে সরগরম করে রেখেছে পুরানো ধাঁচের চুন বালি খসা বাড়িটাকে সবাই মিলে।

মেহমানরা এসে পড়ল ওরা পৌঁছবার খানিক পরই। ডক্টর সাদেক সেই শিশুসুলভ হাসি দিয়ে আপ্যায়ন করল সবাইকে। ফিরোজার কথা তুলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেও ভুলল না রানাকে। কিন্তু তার চোখে মুখে মানসিক দ্বন্দ্বের চিহ্ন দৃষ্টি এড়াল না রানার। নিগ্রোটার কথা জিজ্ঞেস করার জন্যে সুযোগের অপেক্ষায় রইল ও।

ভিতরের একটা রুমে বসানো হলো মেহমানদেরকে। পাত্র নিজে আসেনি। দুই বোন, দুই ভাবী, মামা, গোটা তিনেক ছেলেমেয়ে নিয়ে পাত্রের বাবা-মা এসেছে মেয়ে দেখতে। চায়ের প্রস্তাব তুলতেই পাত্রের মামা বলল, 'এখুনি কেন? আগে মেয়ে দেখি তার পর না হয়...' পাত্রের ভাবীরা সায় দিল মামা-শ্বশুরের কথায়। অগত্যা ফিরোজাকে আনতে গেল বোনেরা। পাত্রের এক ভাই রানার দিকে চোখ তুলে ডক্টর সাদেককে প্রশ্ন করল, 'ওকে তো চিনলাম না?'

ছোট বোন হাসিনা উত্তর দিল, 'আমাদের আর এক ভাই উনি।'

পাত্রের মামা মাথা নাড়লেন, 'তাই নাকি! বেশ বেশ। কিন্তু আমি যেন শুনেছিলাম তোমরা বাবারা চার ভাই।'

'জ্বী, ঠিকই শুনেছিলেন।' উত্তর দিল ডক্টর সাদেক, 'ও আমাদের খালাতো ভাই। লন্ডনে ছিল।'

ফিরোজাকে সাজিয়ে গুজিয়ে আনা হলো। পাত্রের মামা ফিরোজার মুখ

পরখ করতে করতে সহাস্যে বললেন, 'এসো মা।'

জুতোর শব্দ শুনে দরজার দিকে তাকাল ডক্টর সাদেক। ফিরোজার গতিবিধির উপর চোখ কান পড়ে আছে সকলের। পাত্রের দুই ভাবী উঠে দাঁড়িয়ে ধরল নতমুখী ফিরোজাকে। ওকে সিঙ্গল একটা সোফায় বসিয়ে দিয়ে নিজেদের আসনে বসল ওরা। পাত্রের বাবা সিগারেট বের করে ম্যাচ জ্বাললেন ফশ্ করে। জুতোর শব্দ এসে থামল দোরগোড়ায়।

রুমের ভিতর নিস্তব্ধতা ছিল। হঠাৎ আঁতকে উঠে অস্ফুট শব্দ করে উঠল একসাথে কয়েকজন। ঝট্ করে মাথা তুলে তাকাল ফিরোজা। ভীত গলায় চিৎকার করে উঠেই থেমে গেল ও। তারপর আবার অটুট নিস্তব্ধতা।

দোরগোড়ায় প্রকাণ্ড নিগ্রোটা রিভলভার উঁচিয়ে আছে।

ফিরোজার তিন ভাইয়ের সাথে দরজার মুখোমুখি বসেছিল একটা সোফায় রানা। হতবাক হয়ে সবাই নিস্পন্দ হয়ে গেলেও আলগোছে ডান হাতটা নেমে যাচ্ছে ওর জুতোর দিকে। নিগ্রোর চোখের দৃষ্টি আর হাতের রিভলভারের নল সরাসরি তাকিয়ে আছে ডক্টর সাদেকের মুখের দিকে।

জুতোয় হাত ঠেকতেই কাঁধে স্পর্শ অনুভব করল রানা। স্থির হয়ে গেল হাত। খোঁচা লাগছে কাঁধে। ঠাণ্ডা স্পর্শ।

'খবরদার।' কর্কশ গলা এল পিছন থেকে। ঘাড়ের চামড়া ভেদ করে সামান্য একটু ঢুকে গেছে ছোরার নখ। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল না রানা। পিছন থেকে দ্বিতীয় গলা শোনা গেল, 'হাত তোলো।'

কোনও চালাকি চলবে না বুঝতে পারল রানা। মাথার উপর হাত তুলল ও। কে যেন গলা চিরে চিৎকার করে উঠল। পাত্রপক্ষের কে যেন গলা চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'বাঁচাও বাঁচাও! ডাকাত···বাঁচাও!'

গুলির শব্দ শোনা গেল তারপর। নিঃশব্দ হয়ে উঠল রুম আবার। রশির বাঁধন এঁটে বসল হাত দুটোয় রানার। নিগ্রোটা রুমের ভিতর ঢুকে ডক্টর সাদেককে রিভলভারের নল দিয়ে ইঙ্গিত করল। আড় চোখে তাকাল ডক্টর সাদেক মায়ের দিকে। সাদা কাগজের মত হয়ে গেছে মুখ বৃদ্ধার, 'এসব···বাবা মাসুদ··· কে ও।' বৃদ্ধা জ্ঞান হারিয়ে ঢলে পড়ল হাসিনার কোলে।

আবার গুলি করল নিগ্রোটা। এবারও ডক্টর সাদেকের মাথার এক ইঞ্চি উপর দিয়ে গুলি ছুটে গিয়ে বিঁধল দেয়ালে। রানাকে ছেড়ে দিয়ে লোক দু'জন ডক্টর সাদেকের দু'পাশে গিয়ে দাঁড়াল। সকলের অজান্তে দ্বিতীয় দরজাটা দিয়ে রুমে ঢুকেছে।

কোনও কথা হলো না। ডক্টর সাদেককে নিয়ে বেরিয়ে গেল ওরা। সবার পিছনে নিগ্রোটা। বাইরে থেকে দরজার শিকল তুলে দেবার সময় রানার দিকে তাকিয়ে কুৎসিতভাবে চোখ টিপল সে।

আর্তনাদ, চিৎকার, কান্না, প্রলাপ আর হুটোপুটি শুরু হয়ে গেল সাথে সাথে রুমের ভিতর।

বাঁধন খুলে রানা যখন তিন ভাইকে নিয়ে বাড়ির বাইরে এসে দাঁড়াল তখন কেউ নেই আশপাশে। গাড়িতে চড়ার আগেই রানা বলে উঠল, 'কাঁচা

লোক নয় ওরা। গাড়ির চাকার বাতাস ছেড়ে দিয়ে গেছে।'

গট গট করে পা ফেলে অফিসে ঢুকল রানা। তাকাল না কারও দিকে চোখ তুলে। সোজা ঢুকল নিজের রুমে। রিসেপশনিস্ট মেয়েটির সাথে গল্প করছিল সোহানা। মুখ তুলে যেতে দেখল ও রানাকে। রুমের বন্ধ হয়ে যাওয়া দরজাটার দিকে হতবাক হয়ে তাকিয়ে রইল ও।

সোহানা ভিতর ভিতর রাগে ফুলে আছে বেলুনের মত। রাগ ঝাড়ার দিন আজ ভেবেছিল ও। ও জানে রানার ছুটি শেষ হয়ে গেছে কাল। ছুটি নেবার দিন রানার ব্যবহারের কোনও সংগত কারণ আজ পর্যন্ত খুঁজে পায়নি সোহানা। ক্লাবে অপেক্ষা করছিল সে। রানার পৌঁছুবার কথা ছিল ছটার মধ্যে। অথচ রাত সাতটা অবধি অপেক্ষা করেও দেখা পায়নি ও রানার। পরদিন সকালে বাড়িতে গিয়েছিল জবাবদিহি চাইতে। পায়নি ও রানাকে সেদিন। তারপরও গেছে সোহানা। কিন্তু রানাকে গত দশ দিন একবারও বাড়িতে পায়নি ও। ভেবেছিল কথা বলবে না ও রানার সাথে। কিন্তু রাগের কথা ভুলে চিন্তিত হয়ে উঠল মনে মনে সোহানা। এমন অস্বাভাবিক ব্যবহার কখনও দেখেনি রানার। কি হয়েছে লোকটার?

দরজায় টোকা পড়ল। রেহানা ক'দিন থেকে ছুটি নিয়েছে। রানা ডাকল, 'এসো।'

সোহানা দরজা খুলে দেখল টেবিলের উপর পা তুলে দিয়ে সিগারেট টানছে রানা সিলিঙের পানে চোখ তুলে। পাশে গিয়ে দাঁড়াল সোহানা। কেমন যেন অস্বাভাবিক ঠেকল রানার চোখের দৃষ্টি। জিজ্ঞেস করল সোহানা, 'এতদিন কোথায় কোথায় ঘুরেছ তুমি, রানা? কি হয়েছে বলো তো তোমার?'

চোখ নামিয়ে সোহানার মুখপানে তাকিয়ে রইল রানা। তারপর বলল, 'আমি দুঃখিত, সোহানা। সেদিন তোমাকে কথা দিয়ে রাখতে পারিনি। কিছু মনে কোরো না। একটা কাজে আটকা পড়ে গিয়েছিলাম হঠাৎ।'

অভিমান উথলে উঠল সোহানার নরম নরম কথা শুনে। ফোঁস করে উঠল ও, 'কি এমন কাজ সেটা শুনি? জানো আমাকে একা দেখে ক্লাবের অন্য সব মেয়েরা কেমন করুণ চোখে তাকাচ্ছিল। সবাই এসেছিল সঙ্গী নিয়ে, আর আমি...' মাঝপথে থেমে গিয়ে গোমড়া মুখ করে তাকিয়ে রইল সোহানা। রানা বলে উঠল, 'ক্ষমা করে দাও এবার আমাকে। কিন্তু সত্যি হঠাৎ একটা কাজে জড়িয়ে পড়েছিলাম আমি। এখনও কিছুই করতে পারিনি সেটার।'

'আমাকে বলবে?'

'কেন বলব না, কিন্তু...' রানা ইন্টারকমের শেষ বোতামটা টিপে বলল, 'কফি, দুটো।'

'তোমার অর্ধাঙ্গিনী কই?' রেহানার কথা জিজ্ঞেস করল সোহানা।

মুচকি হাসল রানা। বলল, 'আমার সামনে বসে রয়েছে।'

পাল্টা রসিকতায় অপ্রতিভ হয়ে পড়ল সোহানা। কিন্তু উত্তর দেবার আগেই শব্দ উঠল ইন্টারকমে। মেজর জেনারেল রাহাত খানের যান্ত্রিক গলা

ভেসে এল, 'রানা, আমার রুমে এসো।'

রাহাত খানের ডেস্কের উপর খোলা ফাইল দেখতে না পেয়ে তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল রানার অনুভূতি। তার মানে সব কাজ সরিয়ে রেখেছে রানার সাথে কথা বলবার জন্য।

'বসো।' নিভে যাওয়া চুরুটে অগ্নিসংযোগ করলেন রাহাত খান। কোন শব্দ না করে মুখোমুখি চেয়ারটায় বসল রানা।

'এদেরকে চেনো?' একটা কাগজের টুকরো বাড়িয়ে দিলেন রাহাত খান রানার দিকে। হাত বাড়িয়ে সেটা নিয়ে পড়ল রানা। বারোজন লোকের নাম। সবাই বিদেশী। নামগুলো পড়তে পড়তে শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত হলো রানার। ব্যাপার কি! সবাইকে চেনে না রানা। কিন্তু পলো নারডনোচি, প্রফেসর অ্যান্টন নোভেনিক, হুবার্ট ডনফিল, আলভারেজ সিনরোকে না চেনবার প্রশ্নই উঠে না। জগদ্বিখ্যাত বিজ্ঞানী ওরা।

'সবাইকে চিনি না। নাম শুনেছি পলো নারডনোচির, রোমের রকেট ফুয়েল এক্সপার্ট। অ্যান্টন নোভেনিক, চেকোস্লোভাকিয়ার রসায়ন বিশেষজ্ঞ। আলভারেজ সিনরো, ব্রাজিলের এ্যাটমিক পাওয়ার অর্গানাইজেশনের প্রেসিডেন্ট। হুবার্ট ডনফিল, আমেরিকার লেসার গবেষক। সান লিয়াও—'

'ডক্টর সাদেককে মনে আছে তোমার?'

চমকে উঠে তাকাল রানা। তাকিয়ে আছেন রাহাত খান। রানা বলে উঠল, 'জী, আছে স্যার। মাইক্রোবায়োলজিক্যাল রিসার্চ সেন্টারের এক নম্বর ল্যাবে কাজ করত। পৃথিবীর অনেকগুলো এ্যাসট্রোনমিক্যাল এসোসিয়েশনের মেম্বার।'

'আজ থেকে দশদিন আগে কিডন্যাপ করা হয়েছে ডক্টর সাদেককে।'

রানা কথা বলে উঠতে চাইলে রাহাত খান হাত দেখিয়ে থামিয়ে দিলেন ওকে, 'লিস্টের বারোজন সাইন্টিস্টের মধ্যে এগারোজন গত দু'মাসে বিভিন্ন দিনে নিখোঁজ হয়েছে। প্রায় সব দেশের বড় বড় সাইন্টিস্ট এদের মধ্যে আছে। কেউ বলতে পারছে না কোথায় গেছে ওরা। পুলিস, ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়িয়েছে। কিনারা করতে পারেনি।' চুরুট জ্বাললেন রাহাত খান, 'রিপোর্ট পাচ্ছিলাম আমরা গত মাস থেকে। সাহায্যের আবেদন ক্রমাগত আসছিল। সিরিয়াসলি নিইনি আমরা ব্যাপারটাকে আগে।'

রানা বলে উঠল, 'ডক্টর সাদেক কিডন্যাপড হবার পর?'

'হ্যাঁ,' রাহাত খান রানার কথার খেই ধরে বললেন, 'ডক্টর সাদেকের অন্তর্ধানের পর আমরা আর চুপ করে বসে থাকতে পারি না। অপারেশন শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু রেজাল্ট পাওয়া যাচ্ছে না। যাবেও না। কোন সূত্র না পেলে কিভাবে এগোনো যায়। গত সপ্তাহের প্রথম দিকে খবর পেয়েছি হুবার্ট ডনফিলের। আমেরিকা থেকে নিখোঁজ সে।'

SECRET লেখা একটা ফাইল বের করে বাড়িয়ে দিলেন রানার দিকে, 'এটা পড়তে পারো। বিশেষ সাহায্য পাবে না। বারোজন সাইন্টিস্টের জীবনী

পাবে শুধু। নিউ ইয়র্ক, মস্কো, পিকিং, রোম, নয়াদিল্লী—সব জায়গা থেকে পাওয়া রিপোর্টের কপি আছে ওতে।'

'ভারত থেকেও…?'

'কয়েকজন। বুঝতেই পারছ শত্রুপক্ষ পরিচিত নয়। কেউ বা কোন দল প্রতিভাবান মাথা চুরি করছে। এই অপারেশনে দ্রুত কাজ করতে হবে তোমাকে, রানা। অপেক্ষা করবার মত সময় নেই। চারদিকে লাল সিগন্যাল জ্বলে উঠেছে।' রিপিট করলেন মেজর জেনারেল শেষ শব্দটি।

রানা চুপ করে রইল।

'ডক্টর সাদেককে ফিরে চাই আমরা। তোমার অনুসন্ধান শুরু হবে শেষ নিখোঁজ সাইন্টিস্টের সূত্র ধরে। হুবার্ট ডনফিল। ফাইলে ওর সম্পর্কে সব কথা পাবে। ফাইলে যা নেই তা শোনো।' রাহাত খান একমনে চুরুট টানলেন খানিকক্ষণ। তারপর বললেন, 'সবার চেয়ে বিপজ্জনক ডনফিল। আলাবামার লেসার ল্যাবরেটরির গবেষক সে। কোনও পাগলের হাতে পড়ে সে যদি নিজের ব্রেন তার কাজে লাগায় তাহলে দুনিয়াকে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ছাই করে দিতে পারে সেই পাগল। ডনফিলকে মুক্ত করে আনতে না পারলে যা ভাল মনে হয় করবে তুমি।'

'মানে!' রানা নিজেই চুপ করে গেল। রাহাত খান চুরুটের ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে বললেন, 'মেরে রেখে এসো।'

দুই

লন্ডন যাবার পথে ফাইলটা পড়ল রানা। হুবার্ট ডনফিলের সম্পর্কে সব তথ্য মুখস্থ হয়ে গেল ওর। ল্যাবরেটরিতে গিয়ে ফাইলটা কুটিকুটি করে আটলান্টিকের উপর উড়িয়ে দিল ও।

লন্ডনের টিকিট পেয়ে অবাক হয়েছিল রানা। পরে জানানো হয় ব্যাপারটা ওকে। ডনফিল আলাবামা থেকে লন্ডন, সেখান থেকে এডেনবার্গ, ওখান থেকে মিউনিক গিয়েছিল।

লন্ডনের রিসার্চ টেকনিশিয়ানদের সাথে আলাপ করে কিছুই অবগত হলো না রানা। এডেনবার্গে এসে গুজব শুনল মিউনিকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে ডনফিলকে। কিন্তু এমন একজনকেও পাওয়া গেল না যে দেখেছে BEA জেটে ডনফিল চড়েছে মিউনিকে যাবার জন্যে। জার্মানীর দিকে মোড় নিল রানা।

হুবার্ট ডনফিলের জীবন বড় বেশি অপরিচ্ছন্ন। পূর্ব জার্মানে জন্ম ওর। কুড়ি বছর আগে নিষ্ঠুর একটা খুন করে দেশ থেকে পালায় সে। কুৎসিত জঘন্য একটা খুন সেটা। ডনফিল খুন করে নিজের ভাইকে। দেশ থেকে পালাবার সময় দু'বছরের মাতৃহীন মেয়েটাকেও সঙ্গে নিয়ে যায়নি সে। সে জানত না

মেয়েটি বেঁচে আছে কিনা। কিন্তু মাত্র কিছুদিন আগে সেই মেয়ে চিঠি পাঠায় বাপকে।

আমেরিকা সরকার সিটিজেন করে নিয়েছিল ডনফিলকে নিজের স্বার্থে। ডনফিল যে অফিশিয়ালি নাজী গিলটি তাও অজানা ছিল না কারও। কিন্তু গত কুড়ি বছর ধরে কেউ জানত না ডনফিলকে কোথায় রাখা হয়েছে।

অ্যাঙলো-আমেরিকান রিসার্চ কনফারেন্সে যোগ দেবার জন্যে লন্ডন আসে সে। লন্ডন থেকেই আমন্ত্রণ পায় এডেনবার্গ ইউনিভার্সিটিতে লেসারের উপর লেকচার দেবার। এডেনবার্গে লেকচার দেবার পর তার খবর কেউ বলতে পারেনি।

মিউনিকে নেমে এয়ারপোর্টে দেখা পেল রানা কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স মিউনিক ব্রাঞ্চের অপারেটর ইউনুসের। খবর পাওয়া গেল তার কাছে। জার্মান ফেডারেল অথোরিটি হুবার্ট ডনফিলকে ওয়ার ক্রিমিন্যাল হিসেবে অ্যারেস্ট করার একদিন পর জেল থেকে পালিয়েছে সে। তারপর তার আর কোন খবর নেই গোটা পশ্চিম জার্মানীতে।

এয়ারপোর্ট থেকেই বিদায় দিল ইউনুসকে রানা।

এক ঘণ্টার মধ্যেই ওকে অনুসরণ করা হচ্ছে বুঝতে পারল রানা। ওকে লক্ষ্য করতে যাতে অসুবিধে বোধ না করে মেয়েটি তার জন্যে সতর্ক রইল ও। এত তাড়াতাড়ি অনুসরণ করছে দেখে সন্তুষ্ট বোধ করছে রানা।

মেয়েটিকে বিপজ্জনক বলে মনে হলো না প্রথমে রানার। বাজে টেকনিক ফলো করছে। তা না হলে ওর চোখে ধরা পড়ে গেল কেন?

মিউনিকের বিলাসবহুল হোটেল প্লাজা ইন-এ উঠল রানা। সন্ধ্যা ঘনিয়ে না আসা অবধি বারে কাটাল সময়টা। রুমে গেল ছ'টার পর। মেয়েটি ঠিকই দেখে গেল রুমটা। রানার সঙ্গে সে-ও বারে সময় কাটাল।

সন্দেহটা হলো রানার ডিনার খেতে নিচে নামার পর। রানা টেবিলে বসতেই মেয়েটিকে ঢুকতে দেখা গেল হলে। কয়েকটা টেবিলের পর একটায় বসল সে। ভাল করে দেখে নিল রানা। একহারা গড়নের ইউরোপীর মেয়ে। চোখে চশমা। গ্লোভ পরা হাত দুটো থেকে থেকে কচলায় পরস্পরকে। গায়ের রঙ পুড়ে তামাটে হয়ে গেছে। মিডল ইস্টের মরুভূমিতে অনেকদিন কাটিয়েছে হয়তো। এত সহজে ওকে ধরা গেল কেন? মনে মনে সন্দেহ জাগল রানার। ধরা পড়ার জন্যে স্ব ইচ্ছায় এমন অমনোযোগী নয়তো মেয়েটি?

ডিনার খেয়ে ব্যাভারিয়ান নাচ গানকে উপেক্ষা করে বাইরে বেরিয়ে পড়ল রানা। যা আশা করেছিল তাই। তাকে অনুসরণ করে পিছন পিছন এল মেয়েটি।

প্রাচীন ব্যাভারিয়া ডিউকদের বাসস্থান Alter Hof-এ চলে এল রানা হাঁটতে হাঁটতে। খানিকক্ষণ ঘোরাঘুরি করার পর উজ্জ্বল আলোয় ঝলমল করা Marienplatz-এর দিকে পা বাড়াল ধীরে ধীরে ও। জায়গাটা মিউনিকের কেন্দ্রস্থল। সত্যি তাক লাগাবার মত। এমন আলোক সজ্জা পৃথিবীর আর

কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। ডেকোরেশন এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থান পেয়েছে। নানা কিরণমালার বর্ণচ্ছটা উপরে নিচে ডানে বাঁয়ে। ডিপার্টমেন্টাল স্টোরগুলো সংখ্যায় অগুনতি। স্টোরগুলোর চিত্তাকর্ষক হাজার হাজার আসবাব আর দ্রব্য অদ্ভুত রূপ পেয়েছে সাজানোর কৌশলে। একটি দোকানের শো কেসে একদল প্রমাণ সাইজের বাঁদর মাথা নেড়ে লেজ দুলিয়ে ধূমপান করছে। সবক'টা চেইন স্মোকার। ব্যাপারটা বিশেষ একটি সিগারেটের বিজ্ঞাপন। রাস্তা অতিক্রম করল রানা। মেয়েটি ইতোমধ্যে স্টোরগুলোর চাকচিক্যে ক'মুহূর্তের জন্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে। কিন্তু বেশিক্ষণ আনমনা রইল না সে।

রাস্তা টপকে একটা বারে ঢুকল রানা। পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে আবার সামনের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল ও। শিকারীকে শিকারে পরিণত করার ইচ্ছা ওর।

মিডিয়াভ্যাল ডোরওয়ের ফাঁক দিয়ে রানা দেখল কালো রিমের চশমাটা খুলছে মেয়েটি বারের ভিতর দাঁড়িয়ে। ভিতরে রানাকে দেখতে না পেয়ে ভ্যানিটি ব্যাগে চশমাটা ভরে রাখতে রাখতে বেরিয়ে এল সে বাইরে।

মেয়েটিকে অনুসরণ করা খুব সহজেই সম্ভব হলো। অন্য কোথাও গেল না সে। সিধে পৌঁছুল প্লাজা ইন-এ। মেয়েটি আবার সেই বারে বসল। রানা ব্যাক ডোর দিয়ে হাজির হলো ম্যানেজারের প্রাইভেট রুমে।

খুব বেশি কথা জানা গেল না মেয়েটি সম্পর্কে। নাম: মিস্ ক্যারল লিসিল। ব্রিটিশ পাসপোর্ট আছে সঙ্গে। প্লাজা ইন-এর থার্ড ফ্লোরের আড়াইশো নম্বর রুমে থাকছে গত দু'সপ্তাহ ধরে। সেই রাত্রেই হোটেল ত্যাগ করল রানা পিছন দরজা দিয়ে।

মিউনিকের বৃহত্তম হোটেল Bayerischer Hof-এ ঘুম ভাঙল পরদিন রানার। ব্রেকফাস্ট সেরে ইউনুসকে ফোন করল ও। তারপর ইন্টারকম টিপে লন্ডন টাইমস আর হেরাল্ড ট্রিবিউনের প্যারিস সংস্করণ পাঠাবার নির্দেশ দিল রুম সার্ভিসকে।

কাগজে খবর নেই। ডনফিলের আগমন, গ্রেফতার, পলায়ন—সব খবরই উত্তেজনা হারিয়ে ফেলেছে ইতোমধ্যে। প্রাক্তন নাজী অপরাধী প্রায়ই ধরা পড়ে। জার্মান ট্রাইবুন্যালে বিচার হয় তাদের। নতুনত্ব নেই কিছু।

রানা অপেক্ষা করছিল ওয়েস্ট জার্মান ফেডারেল ইন্টেলিজেন্স সারভিসের জেনারেল ইন্সপেক্টর বেলচার ফোনের। কিন্তু ফোন নিঃশব্দ।

ব্যাপারটা ভাল ঠেকল না রানার।

ইউনুস পৌঁছুল। মেয়েটির কথা শুনে বেরিয়ে গেল ও। ঘণ্টাখানেক পর ফিরল আবার। বলল, 'ক্যারল লিসিল লন্ডন ইউনিভার্সিটির এম. এ.। ব্রিটিশ সিটিজেন। আরকিওলজিস্ট। মিডল ইস্টে প্রায়ই গিয়ে কিছুদিন করে থাকে। বসন্তের ছুটিতে বেড়াতে এসেছে এখানে। দু'সপ্তাহ হলো এসেছে মিউনিকে। তার মানে ড. ডনফিল পৌঁছুবার আগেই। অর্থবহ, স্যার?'

'হয়তো। ব্রিটিশ M. I. 6 কি বলে? ওদের হয়ে কাজ করছে নাকি?'

রানা জানতে চাইল।

'চেক করেছি। ওরা স্বীকার করেনি। বলা যায় না, কালই হয়তো স্বীকার করবে। ওরা এভাবেই কাজ করে। এক কাজ করব, স্যার? নিয়ে আসব ওকে? এনে জিজ্ঞেস করা যায় কেন ইন্টারেস্টেড সে আপনার প্রতি?'

ইউনুসকে আপাতত বেকার করে দিয়ে বলল রানা, 'না। ও কাদের হয়ে কাজ করছে তাই শুধু জানতে চাই আমি।'

'কারুরই কাজ করছে না, যদ্দূর মনে হয়।'

রানা বলল, 'আরও ভাল করে খবর নাও, ইউনুস।'

ইউনুস চলে গেলে দেড়ঘন্টা পর এগারোটা সাতাশে ফোন বাজল।

'হের মাসুদ রানা?'

'বলছি।' জার্মান বলল রানা।

'দেরির জন্যে ক্ষমা চাইছি, হের মাসুদ রানা। ব্যাপারটা বুঝবেন আশা করি। বড় ব্যস্ত এখন আমরা।'

'ব্যস্ত আমরা সবাই। যাক। কথাবার্তা টেপ করছেন কি?'

'ইট ইজ রুটিন, স্যার, যাতে আমাদের সহযোগিতা সম্পর্কে ভুল বোঝাবুঝি না হয় ভবিষ্যতে।' বেলচা দম নিল, 'আমরা নিখোঁজ প্রিজন গার্ডটাকে পেয়েছি যে মি. ডনফিলকে পালাতে সাহায্য করেছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় লোকটা মৃত।'

অবাক হলো রানা, 'মার্ডার?'

'না। সম্ভবত সুইসাইড।'

'লাশ দেখতে চাই আমি।'

'ন্যাচারেলি। আমি কয়েক মিনিটের মধ্যেই আসছি আপনার হোটেলে।'

ইন্সপেক্টর জেনারেল ফ্রাঞ্জ বেলচাকে কালো মার্সিডিজ সিডানে করে নিয়ে এল শোফার। সেপ্টেম্বরের রৌদ্রকিরণে বিরক্ত দেখা গেল তাকে। রানা পাশে উঠে বসতে মিউনিকের অভিজাত এলাকার একটি ঠিকানা বলল সে শোফারকে।

সাধারণ উচ্চতা জেনারেল বেলচার। মাথাটা প্রকাণ্ড। কোমর আর পেট পাল্লা দিয়ে ফুলে উঠেছে। ছোট্ট নাক। লোকটার জন্ডিস আছে কিনা সন্দেহ হলো রানার। চোখ দুটো হলুদ। গ্রে রংয়ের স্যুটের সাথে নীল ফুটকিঅলা টাই পরেছে। সরু একটা ছড়ি হাতে। সব মিলিয়ে ভদ্রলোককে ফ্রেডারিক দ্য থার্ডের আমলের নাগরিক বলে মনে হয়।

ভারী গাড়িটা সাবলীল বেগে ছুটে চলেছে। জেনারেল বেলচা রিয়্যার সীটে আর ড্রাইভারের মাঝখানে স্লাইডিং গ্লাস তুলে দিয়ে বলল, 'সম্পূর্ণ সাউন্ড প্রুফ এদিকটা, হের রানা। মন খুলে কথা বলতে পারেন।'

দরজার ফ্লাওয়ার ভাস থেকে ফুলগুলো তুলে নিয়ে ভিতর থেকে একটা ক্ষুদ্রাকৃতি মাইক্রোফোন বের করে সেটা দেখতে দেখতে বলল রানা, 'গাড়ির বুটে টেপ রেকর্ডারটা বুঝি?'

জেনারেল বেলচা হাসল। নীল ফুলগুলো নিয়ে কোলের উপর ফেলে

বলল, 'আমাদেরকে সব আলোচনার অফিশিয়াল ডকুমেন্ট রাখতে হয়, মাই ডিয়ার হের মাসুদ রানা।'

'কিন্তু এখানে অফিশিয়ালি আসিনি আমি। হুবার্ট ডনফিলকে খুঁজতে আর তাকে আলাবামায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছি।'

'আপনার হাতে মি. ডনফিলকে তুলে দিতে পারলে যার পরনাই আনন্দিত হতাম, হের রানা।' জেনারেল বেলচার চোখে কৌতুক, 'কিন্তু ইউ.এস. সরকার একজন ওয়ার ক্রিমিন্যাল সম্পর্কে এতটা দয়াপরবশ কেন?'

'ইউ.এস. সরকার হাতের কাছে যা পান তাই দিয়ে কাজ করে যাবার নীতিতে বিশ্বাসী। গত আঠারো বছর ধরে ডনফিল আলাবামায় কাজ করছিল একজন অপটিকস্ এক্সপার্ট হিসেবে। এর বেশি কিছু জানে না ইউ.এস. সরকার। সে তার কাজে একনিষ্ঠ ছিল। কোনও রেকর্ড নেই তার মেয়ে এখানে বেঁচে আছে কি নেই।'

'মি. ডনফিল নাকি রিমার্কেবল উন্নতি করেছেন লেসারের। তাঁকে ফাদার অভ দ্য ডেথ রে বলা হয়।'

রানা কথা বলল না। জেনারেল বেলচা বলে চলল, 'আমরা ভুল একটা ধারণা করে ঘুমোচ্ছিলাম এতদিন। রাশিয়া মি. ডনফিলকে লুকিয়ে রেখেছে মনে করে ওঁর ফাইলটা ক্লোজ করে দিয়েছিলাম। ধাঁধাটা হচ্ছে এই যে জার্মানীতে এলেই আমরা তাঁকে যুদ্ধ অপরাধী হিসেবে গ্রেফতার করব একথা জানার পরও তিনি এলেন কেন! ওরকম নিষ্ঠুর লোক শুধু মাত্র মেয়ের খাতিরে এতবড় রিস্ক নেবেন তা আশা করতে পারিনি।'

'ইউ.এস. সরকারের ধারণা ডনফিলের কোন অপরাধ নেই। তার মেয়ে বেঁচে আছে একথারও কোন রেকর্ড নেই ওদের কাছে। ডনফিল যদি অপরাধী হত তাহলে কুড়ি বছর আগেই নাম বদলে নিত।'

'কিন্তু তাঁর নিজের মেয়েই অভিযোগ করেছে, মাই ডিয়ার ফেলো! আমরা জানি ডনফিল মেয়ের কাছে গিয়ে দেখা করেছিলেন। বাপের মুখের ওপর মেয়ে বলেছে তুমি আমার বাবা নও। যে লোক পোল্যান্ডের প্রিজন-ক্যাম্পে ইলেকট্রনিক এক্সপেরিমেন্ট চালাতে পারে সে আমার জনক হতে পারে না।'

'এই অভিযোগের রেকর্ড আছে আপনাদের হাতে?'

'নিশ্চয়। কিন্তু আমরা ভেবেছিলাম হয় তিনি মরে গেছেন নয়তো রাশিয়ায় আছেন।' জেনারেল বেলচা সিগারেট বের করে ধরল নিকোটিনের দাগঅলা আঙুলে, 'তার মেয়ে বাপকে ও কথা বলেই থামেনি। হেডকোয়ার্টারে ফোন করে পুলিসকে জানায় বাপের উপস্থিতি। সাংবাদিকদেরকেও ডাকে। অ্যারেস্ট না করে কি করি বলুন?'

'হুঁ,'—রানাকে চিন্তিত দেখাল, 'জেলে একদিন কাটাবার পর হ্যানস্ ডর্পলার নামে একজন গার্ডের সাহায্যে পালায় ডনফিল, তাই না? ডর্পলার প্রাক্তন SS সার্জেন্ট। সেও লাপাত্তা হয়?'

'হ্যাঁ, হের রানা।'

'ডনফিলের কোনও খবর নেই তারপর থেকে?'

'না। তবে আজ সকালে হ্যানস্ ডর্পলারকে পেয়েছি। যার নাম উল্লেখ করলেন আপনি।'

'এই ডর্পলার সুইসাইড করেছে? শিওর?'

'ইয়েস, হের রানা।'

তিন

জেনারেল বেলচা ডনফিলের ফাইল ক্লোজ করে রেখেছিল। কিন্তু বাপের সব কথা জানল কিভাবে ডনফিলের মেয়ে? ডনফিল যখন দেশ ছেড়ে পালায় তখন সে একেবারে শিশু। কেউ নিশ্চয় সরবরাহ করেছে সব খবর তাকে। বেলচা?

জেনারেল বেলচা কি জানত সব কথা? জানলে জার্মান ইন্টেলিজেন্স সার্ভিস চোখকান বুজে ছিল কেন এতদিন? ডনফিলের কথা ভাবতে গিয়ে আবার বিস্ময়বোধ করল রানা। লোকটা দোষী হলে জার্মানী এল কেন! নামই বা বদলায়নি কেন এতদিনে?

রানা দেখল ডনফিলের জার্মানী আগমন, কার্যকলাপ, গ্রেফতার আর পরিকল্পিত পলায়ন—সবই জটিল। এর পিছনে কেউ কলকাঠি নাড়ছে। অন্যান্যরাও নিরুদ্দেশ হয়েছে ব্যক্তিগত সমস্যায় জড়িয়ে পড়ার পরবর্তী সময়ে। কিন্তু—কোথায় যাচ্ছে সবাই নিখোঁজ হয়ে?

কোনও ধারণা নেই রানার। জেনারেল বেলচা সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে রইল রানা। লোকটা হয়তো অনেক কিছু জানে।

Deutsches Science Museum ডানে রেখে গাড়ি মোড় নেবার সময় পিছনে তাকাল রানা। একটা লাল VW অনুসরণ করে আসছে মাঝ শহর থেকে। শহরতলির দিকে ছুটে চলেছে সিডান। একটা ইঁটের ব্রিজ অতিক্রম করে মোড় নিল দু'পাশে উঁচু উঁচু গাছঅলা অপেক্ষাকৃত সরু রাস্তায়। খানিকপর জলাভূমি পড়ল দু'পাশে। তারপর বন এলাকা। বনের মাঝখানে মিডিয়্যাভাল গেট দেখা গেল প্রকাণ্ড একটা বাড়ির। বেলজিয়ান কেবল দিয়ে ঘেরা গোটা বাড়িটা। সরু লম্বা জানালাগুলোর কাঁচে রোদ প্রতিফলিত হচ্ছে। গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়তে জিজ্ঞেস করল রানা, 'এটা কোন্ জায়গা?'

'হাসপাতাল একটা। যাদের ডিফেক্ট আছে তাদেরকে রাখা হয় এখানে।' গাড়ি থেকে নামতে নামতে বলল জেনারেল বেলচা। লেদার এ্যাপ্রন পরা একজন লোক আর একজন পুলিস অফিসার সেন্ট্রাল ডোর খুলে বেরিয়ে এল। জেনারেল বেলচা রানার দিকে ফিরে বলল, 'কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের ভিকটিমদের জন্যে তৈরি করা হয়েছিল এটা। তারপর তাদের আর তাদের প্রতি নির্ভরশীলদের জন্যে হাসপাতাল হিসেবে চালু করা হয়েছে এটাকে।'

'ডর্পলারকে পাওয়া গেছে এখানে?' রানা প্রাপ্ত রিপোর্টগুলো স্মরণ করতে করতে বলল, 'মিস বনবন ডনফিল জড়িত এই হাসপাতালের সাথে?'

'হ্যাঁ, কাগজগুলোয় উল্লেখ ছিল বটে। আজ সকাল ছ'টায় হ্যানস্ হর্পলার মিস বনবনের অ্যাপার্টমেন্ট থেকে লাফিয়ে পড়ে। এই এস্টেট বনবনের প্রপিতামহের ছিল আসলে। এখানকার চীফ মেডিক্যাল অ্যাডমিনিসট্রেটরের সাথে কাজ করত ও। খুব ভাল মেয়ে। সপ্তায় সপ্তায় বাড়িতে থাকত ছুটি কাটাবার জন্যে। কিন্তু বাড়িটা সরকার তালা-বন্ধ করেছে ক'দিন আগে। ডনফিলের সেটা।' কাঁধে টাই উড়িয়ে, ছড়ি দোলাতে দোলাতে বিরাট বপু উঁচিয়ে ভিক্টোরিয়ান ড্যান্ডিদের চালে এগিয়ে চলল জেনারেল বেলচা। দরজা দিয়ে হলরুমে পা দিতে একজন সার্জেন্ট নেমে এল তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে।

'ছ'টায় ডর্পলার ঝাঁপ মারে মিস বনবনের টাওয়ার অ্যাপার্টমেন্ট থেকে, হের ইন্সপেক্টর জেনারেল। মিস বনবনের সাহায্য চেয়েছিল সে। মি. ডনফিলকে পালাতে সাহায্য করে তাকে কোর্ট মার্শাল থেকে আর নাজী আদর্শকে অপমানিত হতে দেয়া থেকে বাঁচিয়েছে বলে দাবি করে সে। মিস বনবন তাকে সাহায্য করবে না একথা বোঝাবার পর, আর পুলিসে খবর দেয়া হবে জানতে পেরে টাওয়ার উইন্ডো থেকে লাফিয়ে পড়ে সে—মিস বনবন জানায়।'

'দুঃখজনক।' বিড়বিড় করে উঠল জেনারেল বেলচা। রানা জিজ্ঞেস করে, 'মিস বনবন জানতে পারেনি কোথায় আছে তার বাবা?'

'না, স্যার।'

'ওর সাথে কথা বলতে চাই আমি।'

'আমি দুঃখিত, স্যার। ওর এক সহকারীকে কথাগুলো বলে নিজের রুম থেকে নিচে নেমে আসে সে। সবাই তখন লাশের কাছে। নিজের গাড়ি নিয়ে চলে যায় মিস বনবন। মি. ডনফিলের মত সে-ও কমপ্লিট ভ্যানিশড।'

যেখানে পড়েছে সেখানেই সাদা কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে লাশটাকে। কাপড় সরানো হলে রক্ত দেখল রানা। কিন্তু মুখটা অক্ষত রয়েছে। ঠোঁট বেয়ে রক্ত বেরিয়ে জমাট বেঁধে গেছে শুধু। ডর্পলারের পরনে এখনও প্রিজনগার্ড ইউনিফর্ম। বসে পড়ল রানা মৃতদেহের পাশে। ঘ্রাণ নিল ও জোরে। বলল, 'হ্যাশিশ?'

'সম্ভবত।' ডর্পলারের পকেটে হাত ঢোকাল জেনারেল বেলচা। একটা কাগজের প্যাকেট পাওয়া গেল। আরবী লেখা প্যাকেটটায়। পকেট থেকে সামান্য কিছু টাকা ছাড়া কিছুই পাওয়া গেল না আর। উপর পানে চোখ তুলে টাওয়ারটা দেখতে দেখতে বলল রানা, 'ডর্পলারের অ্যারাবিয়ান বন্ধু ছিল কিনা জানেন?'

'চেক করব আমরা। বোঝা যাচ্ছে লাফিয়ে পড়ার সময় নেশাগ্রস্ত ছিল ও।' জেনারেল বেলচা রানাকে সঙ্গে নিয়ে মিস বনবনের টাওয়ার রুমে উঠে এল। সিঁড়ির মুখে গার্ড। আর একজন মিস বনবনের রুমের দরজার সামনে।

রুমটা বড় নয় খুব। লম্বা, সরু সরু জানালা। বাইরের দিকের একটা জানালা এখনও খোলা। উঁকি মেরে লাশটা দেখল রানা নিচে। হ্যাশিসের গন্ধ এখনও ভেসে বেড়াচ্ছে রুমের ভিতর। জেনারেল বেলচা আধপোড়া

সিগারেটের একটা টুকরো মেঝে থেকে দু'আঙুলে ধরে তুলল। রানার দিকে বাড়িয়ে দিল সেটা। দেখল রানা। ঘ্রাণ নিল জেনারেল টুকরোটার। মাথা নাড়ল সবজান্তার মত।

কিন্তু খুঁত খুঁত করতে লাগল রানার মন। ও অনুভব করল সব কিছুই যেন অত্যন্ত বেশি সহজ সরল। সবাই যেন ওকে সন্তুষ্ট করার জন্যে অতিরিক্ত তৎপর।

লাঞ্চের আগেই জেনারেল বেলচা হোটেলে নামিয়ে দিয়ে গেল রানাকে।

হোটেল ডেস্কে কোন মেসেজ নেই দেখল রানা। লাঞ্চ করার সময় অনুসন্ধানী চোখ বুলিয়ে নিতে দেখল একজন লোককে রানা। কয়েকটা টেবিলের পরে বসেছে সে। জেনারেল বেলচার লোক। গুরুত্ব দিল না রানা। লাঞ্চ শেষ করে পাবলিক বুদ থেকে ইউনুসের অটো এক্সপোর্ট এজেন্সিতে ফোন করল ও। ইউনুসকে সব জানিয়ে রানা বলল, 'মিস বনবন উত্তর দিতে পারে সব কথার। জেনারেল বেলচার আগে পেতে চাই ওকে আমি। আমার ধারণা ভয়ে পালিয়েছে সে।' ইউনুসকে কি কি করতে হবে বুঝিয়ে দিয়ে রিসিভার রাখল রানা।

কুড়ি মিনিট ধরে মিউনিকের পথে-ঘাটে হাঁটল রানা। কেউ অনুসরণ করছে না ওকে। প্লাজা ইন-এর বিপরীত ফুটপাথে এসে দাঁড়াল ও। ইউনুস শুরু করে দিয়েছে ইতোমধ্যে কাজ। ক্যারল লিসিল বেরিয়ে আসবে কিছুক্ষণের মধ্যে। ইউনুসের কাজ লিসিলকে গ্রেফতার করবার ভয় দেখানো।

তিন মিনিটের মধ্যে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল লিসিলকে। গেটের বাইরে এসে রাস্তার দুদিক দেখল সে চঞ্চল চোখে। একটা ট্যাক্সি যাচ্ছিল। হাত নেড়ে সেটাকে দাঁড় করিয়ে দ্রুত চড়ে বসল সে।

পিছন পিছন ট্যাক্সি নিয়ে ইংলিশ গার্ডেন অবধি অনুসরণ করল ওকে রানা। মিনিট দশেক বসল লিসিল পার্কের একটা বেঞ্চিতে। তারপর হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বেরিয়ে এল বাইরে। ট্যাক্সি স্ট্যান্ড থেকে ট্যাক্সি নিল আবার। নদীর কিনারায় মধ্যবিত্তদের অ্যাপার্টমেন্টগুলোর কাছে নামল লিসিল। দূরত্ব রেখে ট্যাক্সি দাঁড় করাল রানা। ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে দ্রুত পায়ে সরু একটা গলিতে ঢুকে অনুসরণ করে চলল লিসিলকে ও। বাঁ দিকের একটা বাড়ির ভিতর ঢুকে পড়ল লিসিল। পনেরো সেকেন্ড পর ভিতরে ঢুকল রানা।

লিসিলের হাই হিলের শব্দ হচ্ছে সিঁড়িতে। সিঁড়ি টপকাতে শুরু করল রানা। করিডরে উঠে লিসিলকে দেখতে পেল না রানা। কিন্তু একটা রুমের দরজা বন্ধ হয়ে যেতে দেখল ও।

রুমটার গায়ে কোনও নেম প্লেট নেই। বেল টিপে দাঁড়িয়ে রইল রানা।

বেশ খানিকটা সময় কেটে গেল। তারপর জুতোর শব্দ এল। খুট করে শব্দ হলো। সামান্য একটু ফাঁক হলো দরজা। মিস বনবন।

মেয়েটি রানাকে দেখেই দরজা বন্ধ করে দেবার উপক্রম করল। রানা বলে উঠল, 'মিস বনবন, লেট মি ইন।' হাত দিয়ে ঠেলে ধরল দরজার পাল্লা

রানা। নিঃশ্বাস বন্ধ করে দরজা বন্ধ করে দেবার চেষ্টা করছে বনবন। জোর দিয়ে কবাট দুটো খুলে ফেলে ভিতরে পা রাখল রানা, 'ভয়ের কিছু নেই। তুমি আমাকে আশা করেছিলে, তাই না?'

'তোমাকে আমি চিনি না।' চাপা উৎকণ্ঠা প্রকাশ পেল বনবনের গলায়।

দরজা বন্ধ করে দিয়ে রানা বলল, 'মিস লিসিলকে ডাকো। তাড়াতাড়ি। আমার কথা বলেনি ও তোমাকে কিছু?'

'তুমি…মাসুদ রানা। তুমি?'

'সন্দেহ কোরো না। ভয় পাবারও নেই কিছু। জেনারেল বেলচা এসব জানে না।' বনবনের ভরাট মুখাবয়ব খুটিয়ে খুঁটিয়ে নিরীখ করছে রানা, 'তুমি ভালই করেছ ওখান থেকে পালিয়ে এসে। বিপদ ঘটত কপালে ওখানে থাকলে। লোকটা খুন হবার পর ব্যাপারটা জটিল হয়ে পড়েছে। ব্যক্তিগতভাবে এখন কথা বলতে পারব আমরা তোমার বাবার বিষয়ে।'

'কিন্তু আমি খুন করিনি ডর্পলারকে…'

'বেশ তো; ভয় পাচ্ছ কেন? বসো। কথা বলতেই তো এসেছি। সব শুনব আমি। কিন্তু তার আগে কফি।'

প্রায় বাতিল একটা কাউচের উপর নানা রকম আসবাবের সাথে ট্রে রয়েছে একটা। কাপড়, ব্যাগ, জুতো, ফ্লাস্ক বিশৃঙ্খলভাবে রাখা হয়েছে। বনবনের লাবণ্যমাখা চেহারার সাথে বেমানান পরিবেশ। গোল কপাল বনবনের। সুন্দর করে কাটা চুল। লাল ঠোঁট দুটো উত্তেজনায় মৃদু কাঁপছে। সোনার চেইনের রিস্টওয়াচটা চোখে পড়ে ফর্সা গোলগাল হাতে। কফি বানাতে বানাতে দমকা নিঃশ্বাস ফেলছে ও শুনতে পেল রানা।

'কিছু মনে কোরো না, প্লীজ,'—কফির পেয়ালা সামনে ধরে ফ্যালফ্যাল চোখ মেলে তাকাল বনবন, কটা দিন বড় আতঙ্কের মধ্যে দিয়ে গেছে। ডর্পলার লোকটা আজ সকালে ভয় পাইয়ে মেরে ফেলেছিল প্রায় আমাকে। তাই এখানে চলে আসি আমি; আমার এক বান্ধবীর অ্যাপার্টমেন্ট—সুইজারল্যান্ডে ছুটি কাটাতে গেছে সে। লিসিল সম্পর্কে…'

বন্ধ বেডরুমের দরজার দিকে না তাকিয়ে রানা বলল, 'ওর কথা পরে হবে। আমার ধারণা লিসিলই তোমাকে প্রথম প্রস্তাব দেয় মি. ডনফিলের এখানে আগমনের ব্যাপারে?'

বনবন মাথা নাড়ল। রানা কাপে চুমুক দিয়ে একটা কাঠের চেয়ারে বসল। 'ডর্পলার সম্পর্কে সব কথা জানতে চাই আমি। আজ সকালের ব্যাপারটাও পরিষ্কার করে বলো।'

'ভয়ঙ্কর লোক ডর্পলার,'—মৃদু গলায় বলল বনবন, 'বাবাকে ওয়ার ক্রিমিন্যাল ট্রাইবুন্যাল থেকে বাঁচাবার জন্যে পালাতে সাহায্য করেছে বলে আমার কাছ থেকে প্রতিদান চায় সে। অস্বীকার যাই আমি। বলি, বাবা দোষী, সে উচিত শাস্তি পাবে। খেপে উঠতে থাকে সে। পাগল বলে ভুল হচ্ছিল ওকে আমার। বারবার বলে ওর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে।'

'কে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে?'

'পরিষ্কার করে বলেনি সে। "ওরা" ঠকিয়েছে আমাকে একথাই বলছিল বারবার।'

'মিডল ইস্ট বা সাউথ আমেরিকায় যে-সব অভিযুক্ত নাজীরা আত্মগোপন করে আছে ডর্পলার তাদের হয়ে কাজ করছিল কিনা জানো?'

'কেউ কেউ বলে ওরকম লোকদের কয়েকটা অর্গানাইজেশন আছে। ডর্পলার আগে নাকি তাদের কাজ করত। কিন্তু তার কথা শুনে আমার ধারণা হয় জার্মানীতেই কেউ তাকে ধোঁকা দিয়েছে। নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক। ওকে লুকোবার জায়গা বা টাকা দিতে অস্বীকার যাই আমি।'

'কেন? বাবাকে ভালবাস না তুমি? সে নিরাপদে আমেরিকায় ফিরে যাক এ তুমি চাও না?'

থমথমে দেখাল বনবনের মুখ, 'বাবা বেঁচে আছে শুনে ঘৃণা হয় আমার। মিউনিকে আসার পর কথাটা জানতে পারি। আমার সাথে দেখা করে বলে, সে নাকি কেবল আমার টানেই বিপদ মাথায় করে ছুটে এসেছে। সে নাকি ভালবাসে আমাকে। কিন্তু কোন কথা শুনতে চাইনি আমি। মুখের ওপর তাকে বলি তুমি আমার বাবা নও। তুমি একটা পশু।'

'তোমার বাবা অস্বীকার যায়নি তোমার অভিযোগ? নাকি বলবার সুযোগই দাওনি তাকে?'

'বলবার আছেই বা কি। যুদ্ধ অপরাধীরা সবাই একই কথা বলে। তার কোন কথাই শুনতে চাইনি আমি।' কাঁপা কাঁপা শোনাল বনবনের গলা। বাপের ওপর নিষ্ঠুরতা দেখিয়ে ভিতর ভিতর দগ্ধে মরছে নিজেই।

'ভুল করেছি কি? বলো তুমি, আর কি করার ছিল আমার। জানি, আমি তার মেয়ে, কিন্তু সে একটা খুনী।' রানার দিকে তাকিয়ে চুপ করে গেল বনবন। তারপর হঠাৎ বলে উঠল, 'চুপ করে থাকলে কেন? কিছু বলো তুমি। তুমি কি মনে করো বাবা নির্দোষ?'

সেন্টিমেন্টাল ব্যাপারটার ইতি করার জন্যে রানা বলল, 'খোঁজ করে দেখব আমরা।' প্রসঙ্গ বদলাল ও, 'তোমার জানালা দিয়ে ডর্পলার পড়ল কিভাবে বলো।'

'ক্ষ্যাপা কুকুরের মত হয়ে উঠেছিল সে। আমার ওপর নানা অত্যাচার করে বাধ্য করতে চাইছিল সাহায্য করতে। পিস্তল বের করে হুমকি দিই আমি পুলিসে খবর দেবার। পিছিয়ে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ায় ও। তারপর হঠাৎ লাফ দিয়ে পড়ে। আমি দৌড়ে ধরতে যাই। কিন্তু ছুঁতে পারলেও ধরে রাখতে পারিনি ওকে।'

'পিস্তলটা কোথায়?'

'ওকে ধরার জন্যে সামনে যেতেই সেটা ছিনিয়ে নেয় ও। ওটা বোধহয় ওর সঙ্গেই ছিল শেষ মুহূর্তে।' বনবন হঠাৎ প্রসঙ্গ বদলাল, 'আমাকে বোঝার চেষ্টা করো, প্লীজ। এছাড়া আর কিছু করার কথা ভাবতে পারিনি আমি। আমি জানতাম আমার বাবা বেঁচে নেই। আমি জানতাম আমার বাবা ছিল একটা খুনী। সে যদি হঠাৎ সশরীরে সামনে এসে দাঁড়ায় তাহলে…'

'তোমার সন্ধান কিভাবে পেল মি. ডনফিল?'

'আমি একটা চিঠি পাই প্রথমে তার কাছ থেকে। লিখেছিল, আমিই নাকি তাকে ঠিকানা জানিয়ে চিঠি পাঠিয়েছি। সুযোগ পেলেই দেখা করতে আসবে সে আমার সাথে।'

'চিঠিটা তুমি লেখোনি বলতে চাইছ?'

'না, আমার লেখবার প্রশ্নই ওঠে না। বাবা যে বেঁচে আছে তাই জানতাম না।'

'মি. ডনফিল চিঠিটা দেখিয়েছে তোমাকে?'

'না।'

'তার মানে নকল চিঠির ধোঁকায় পড়ে তোমার বাবা মিউনিকে এসেছিল। তারপর ডর্পলার তাকে জেল থেকে পালাবার ব্যবস্থা করে দেয়। ডর্পলার সম্ভবত কোন একটি "ক্ষমতার" হয়ে কাজ করত। মি. ডনফিলকে অন্য কোথাও পাচার করার উদ্দেশ্য ছিল তার।'

'সেরকমই মনে হয়।'

'বনবন, তোমার বাবা তোমাকে ভালবাসে। তাই সে নিজের প্রাণের মায়া ত্যাগ করে এখানে আসে। আর তুমি তাকে অপমান করো, পুলিস ডেকে গ্রেফতার করাও। কিন্তু এসব আইডিয়া কে তোমার মাথায় ঢুকায়? তোমার বাবা দোষী একথা কে বুঝিয়েছিল তোমাকে? মিস ক্যারল লিসিল?'

'কিন্তু লিসিলকে বিশ্বাস করি আমি...' হঠাৎ মরিয়া হয়ে উঠল বনবন রানাকে বন্ধ বেডরুমের দরজার দিকে পা বাড়াতে দেখে। ওকে বাধা দেবার জন্যে এক পা এগিয়ে গিয়ে শ্রাগ করে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। দরজায় করাঘাত করে রানা ডাকল, 'মিস লিসিল, দরজা খোলো।'

দরজাটা খুলে গেল রানার হাতের ধাক্কা লেগে। লিসিল তৈরি হয়ে অপেক্ষা করছে দরজার সামনেই।

রানার তলপেট লক্ষ্য করে ধরেছে লিসিল পিস্তলটা।

চার

লিসিলের ওয়রটাইম বেরেটার দিকে হাত পেতে বলে উঠল রানা, 'সময় নষ্ট কোরো না, লিসিল। ওটা দাও। তোমাকে অনুসরণ করে এখানে পৌঁছুই আমি তাই চাইছিলে তুমি। আমরা সবাই সম্ভবত হুবার্ট ডনফিলকে চাই। কাজের কথায় এসো তাড়াতাড়ি।'

ইতস্তত করল লিসিল। তারপর বেরেটার নল নিচু করল ঠোঁটের কোণে দ্রুত হাসি ফুটিয়ে তুলে। বলল, 'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ তুমি। প্রথমে মি. ডনফিলকে চাই আমরা। আর তাকে পেতে হলে তার পায়ের ছাপ খুঁজে বের করতে হবে আগে। হোক কাজের কথা।'

'বনবনকে কতদিন থেকে জানো তুমি?'

'দেড়-দু'মাস হবে বোধহয়।'

'ডর্পলার আজ সকালে বনবনের কাছে সাহায্যের জন্যে গিয়েছিল। কোথায় ছিলে তখন?'

'যেখানেই থাকি, বনবনের সাথে ছিলাম না। আমরা নিজেরা নিজেদের হাতে চাই মি. ডনফিলকে। জীবিত। তার কাছ থেকে সবরকম ইনফরমেশন পেতে চাই আমরা। দুর্ভাগ্যের কথা—' লিসিল বিরতি নিয়ে হাসল রানার চোখে চোখ রেখে। 'এ সম্পর্কে বনবন আমাকে ফোন করলে আমি এখানে চলে আসতে বলি ওকে।' একটু চুপ করে থেকে লিসিল আবার বলল, 'ডর্পলার যা করেছে এটা তার ফল ভোগ, বলব আমি।'

'আর হুবার্ট ডনফিল?'

লিসিল একবার তাকাল বনবনের দিকে, 'সে একটা ক্রিমিন্যাল। যোগ্য শাস্তি তার পাওয়া উচিত।'

'বনবনের নাম চুরি করে মি. ডনফিলকে চিঠি লিখেছিলে কেন?'

উত্তর না দিয়ে কফি ঢালল লিসিল কাপে। ফিরে এসে বলল, 'আমরা শত্রু নই পরস্পরের, মি. রানা। বনবনকে দুঃখ দেবার কোন ইচ্ছাও আমার ছিল না। কিন্তু ওকে ব্যবহার না করে উপায় ছিল না আমার। ওর বাবার ব্রেন ওয়াশ করে লেসার টেকনিক সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে অনেকগুলো ইন্টারন্যাশনাল এজেন্সি ওত পেতে আছে। বিখ্যাত "ডেথ-রে"-এর মালিক হবার ইচ্ছা সকলের। আমিও কোন এজেন্সির হয়ে কাজ করছি তা মনে কোরো না। তবে আমাদের উদ্দেশ্য ছিল মি. ডনফিলকে হাতের কাছে প্রথমে আনা—এই মিউনিকে। তারপর তাকে বিশেষ একটি প্রতিষ্ঠানের খপ্পরে ফেলে দেয়া তাদের অজান্তে।'

'লিসিল! তুমি তা হলে চাইতে—' বনবন বোকার মত চেঁচিয়ে উঠল।

'হ্যাঁ। অ্যারেস্ট হোক মি. ডনফিল তা চাইতাম কিন্তু বিচার হোক তা চাইতাম না। কেননা তাকে অনুসরণ করার উদ্দেশ্য ছিল আমাদের।'

'তার মানে জেল থেকে বাবাকে পালাতে সাহায্য করেছ তোমরা।'

'ডিয়ার বনবন, তোমার বাবার জেল থেকে পালানোটা অপরিহার্য ব্যাপার ছিল একটা। ডর্পলারের মত সহানুভূতিশীল লোক সব জায়গাতেই আছে। নিজেদের দলে ঢুকিয়ে কাজ করিয়ে নেবার ইচ্ছা ওদেরই থাকে।'

'গোলমালটা হলো কোথায়?' রানা প্রশ্ন করল।

'আমরা চেয়েছিলাম মি. ডনফিলকে নির্দোষ ঘোষণা করে ছেড়ে দেয়া হবে। কিন্তু ঘটল অন্য রকম। আমরা চাইছিলাম ডর্পলারকে কে ভাড়া করেছিল তা জানতে। কিন্তু ডর্পলার নেই। নিজেকে দোষ দিয়ো না, বনবন। ডর্পলারকে মরতে হত তার এমপ্লয়ারের হাতে আগে বা পরে।'

'তার মানে মি. ডনফিলকে তোমরা ব্যবহার করতে চাইছিলে একটি আন্ডারগ্রাউন্ড অর্গানাইজেশনের পরিচয় জানার জন্যে? এই অর্গানাইজেশনই ব্রেন স্মাগল করছে জার্মানী থেকে?'

'শুধু জার্মানী থেকে না। পৃথিবীর সব দেশ থেকে ব্রেন স্মাগল করছে ওরা।'

'পরিচয় জানতে পেরেছ?'

'বোধহয় পেরেছি।' লিসিল চাপা গলায় বলল, 'কমপক্ষে আমরা নামটা জানি। ওরা নিজেদেরকে কায়রো ড্যান্সার বলে।'

'বলে যাও।' রানা বলল।

'এর বেশি কিছু জানি না এখনও আমরা।'

'আমরা?'

লিসিল উত্তর দিল না। স্মৃতির পাতা উল্টে চলল রানা। কিন্তু নামটা শুনেছে বলে মনে পড়ল না। কায়রো ড্যান্সার—না, নতুন শুনল রানা। ওদেরকে বসে থাকার ইঙ্গিত করে ক্রাডল থেকে রিসিভার তুলে ডায়াল করল রানা, 'মাসুদ রানা বলছি। কেউ শুনছে আমাদের কথা?'

'জেনারেল বেলচা হলে হতে পারে—আর কেউ না।' ইউনুস বলল।

'অলরাইট। ওর রিপোর্ট কি?'

'জেনারেল সহযোগিতা করছেন। ডর্পলারের মেডিক্যাল রিপোর্টে বলা হয়েছে শরীরে কোনও আঘাতের চিহ্ন নেই। নেশাগ্রস্ত ছিল শেষ মুহূর্তে।'

'ডনফিল সম্পর্কে?'

'জেনারেলের ধারণা সে মিউনিকেই আছে। প্রতিটি রাস্তা, ট্রেন, বাস, এয়ার লাইন চেক করা অব্যাহত আছে। জেনারেল খবরের কাগজগুলোকে জানিয়েছে ডর্পলার সুইসাইড করেছে। কিন্তু, স্যার, আমি বোধহয় কিছু খবর পাচ্ছি…'

'বটল ইট আপ। একঘণ্টা অপেক্ষা করো। মিট মি এ্যাট লোকেশন ফোর।' রিসিভার নামিয়ে রাখতে গিয়ে চোখ পড়ল রানার জানালার দিকে। বিচ্ছিরি সংঘর্ষের শব্দ উঠে কাঁচ ভেঙে পড়ল। ভারী পর্দাটা উড়ে এল রানার দিকে। বুলেটটা ভোমরার মত শব্দ করে টক্কর খেল দেয়ালে দেয়ালে। রিভলভার চলে এল রানার হাতে।

বনবন চেঁচিয়ে উঠল তীক্ষ্ণ কণ্ঠে।

একই সময় সশব্দে ছিটকিনি ভেঙে খুলে গেল দরজাটা। ছায়াটা চোখে পড়তেই গুলি করল রানা। দুটো গুলি একই সময় ছুটে এল রূমের ভিতর ছায়াটার হাতের পিস্তল থেকে। কাঁচের টুকরোর উপর দিয়ে লাফ দিয়ে দোরগোড়ায় গিয়ে দাঁড়াল রানা। লোকটা পড়ে গেছে। দুটো গর্ত পাশাপাশি কপালের উপর। নিচের তলায় একটি লোক 'হেলপ হেলপ' করে চেঁচিয়ে উঠল। দরজা বন্ধ করে দিয়ে ফিরল রানা ওদের দিকে, 'ঠিক আছ তোমরা?'

বনবন মাথা নেড়ে দেখাল লিসিলকে। ম্লান হয়ে গেছে লিসিলের মুখ। বনবন ধরে ফেলল ওকে। লিসিল মুখ বাঁকাল যন্ত্রণায়, 'গুলি খেয়েছি। প্রথম বুলেটটা, দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে…' যন্ত্রণায় কথা শেষ করতে পারল না লিসিল।

'হাঁটতে পারবে?'

'বোধহয়।'

'এসো, বেরিয়ে যাই এখান থেকে।' দরজা খুলে লাশটার পাশে বসে পড়ল রানা। জার্মানীতে এই মুখ ব্যতিক্রম। পিস্তলটা ছাড়া পকেট হাতড়ে পাওয়া গেল না কিছু। লিসিল দম বন্ধ করে জিজ্ঞেস করল যন্ত্রণার মধ্যেই, 'কে ও?'

'জানি না। আলজিরিয়ান? ড্যান্সারদের কেউ? ইজিপশিয়ান হতে পারে।'

অ্যাপার্টমেন্টের নিচ তলায় শোরগোল দানা বাঁধছে। পিছনের সিঁড়ি বেয়ে গ্রাউন্ড ফ্লোরে নেমে এল ওরা। লোকজন নেই আশপাশে। রানা বলে উঠল, 'আরও একজন আছে। সাবধান!'

কিন্তু সরু গলিটা দিয়ে আসার সময় কাউকে দেখা গেল না। বড় রাস্তায় পৌঁছে ট্যাক্সি নিল রানা। হোটেলের ঠিকানা বলল ড্রাইভারকে।

লবির কাছের বার থেকে ব্র্যান্ডি নিয়ে উপরে নিজের রুমে এল রানা। চাবি দিয়ে বনবন আর লিসিলকে পাঠিয়ে দিয়েছিল আগেই। লিসিলের দিকে গ্লাসটা এগিয়ে দিয়ে বলল, 'সবটুকু পান করো। তারপর তোমার জখম দেখছি।'

আপত্তি করে লিসিল বলে উঠল, 'না, সে আমি পারব না!'

'শরমের সময় নয় এখন। বনবন, তুমি আমাকে সাহায্য করবে।'

বিছানায় শুইয়ে দিল বনবন লিসিলকে।

রানাকে বড় বড় চোখে দেখতে লাগল বনবন। চোখ বন্ধ করে যন্ত্রণা সহ্য করার চেষ্টা করছে লিসিল। ব্লাউজ খুলে ফেলে জখম পরীক্ষা করছে রানা।

কাপটা রক্তে ভরে উঠল। বুলেটটা ভিতরে ঢুকতে পারেনি। সহজেই বেরিয়ে এল সেটা। ব্যান্ডেজ তৈরি করা হলো বেডশিট দিয়ে। রানা বলল, 'পরে ডাক্তার দেখালে চলবে। পুলিসী ঝামেলা পোহাতে চাই না এত তাড়াতাড়ি।'

ইউনুসকে ফোন করে পেল না রানা। লিসিলের ব্যাগটা চোখে পড়ল ওর। সঙ্গে করে নিয়ে আসতে ভোলেনি দেখে বিস্মিত হলো ও। সেটা তুলে নিয়ে খুলতে যেতেই বিড়বিড় করে আপত্তি করল লিসিল।

মেয়েলী জিনিস ভিতরে। লিপস্টিক, টিসু, পাউডার কেস, ব্রিটিশ পাসপোর্ট, বিভিন্ন দেশের খুচরো পয়সা, তার মধ্যে ইসরাইলী পাউন্ড নোটও দেখল রানা। লিসিল ঠাণ্ডা গলায় বলে উঠল, 'অ্যাসপিরিনও আছে। দয়া করে দাও একটা।'

রানা বলে উঠল, 'এবার সময় হয়েছে তোমার সঙ্গীদের নাম বলার, লিসিল।'

'না। এখন সেকথা বলতে পারব না আমি।'

ব্যাগটা সার্চ করল আবার রানা। ওয়ালেট দেখল। ইন্টারন্যাশনাল ড্রাইভিং লাইসেন্স দেখা গেল একটা। সাইড পাউচ থেকে বেরুল লং সাইজের ফটো একটা। ফটোটা মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগল রানা।

মরুভূমিতে তোলা হয়েছে ছবিটা। ভাঙা পাথরের খিলান, পিরামিড, তাঁবু দেখা যাচ্ছে দু'জন মানুষের পিছনে। একজন লিসিল। লোকটার গায়ে সাদা শার্ট।

লিসিল বিছানা থেকে সকৌতুকে বলে উঠল, 'চেনো ওকে?'

'ছবি দেখেছি ওর আগে।' রানা বলল, 'আমাদের কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের ফাইলে। হ্যাঁ জানি ওকে, আত্হার হোসেন।'

'দ্যাটস রাইট। হোসেন।' লিসিলের গলার স্বরে মাদকতা অনুভব করল রানা। মুখ তুলে তাকাল ও। আত্হার হোসেন ডেঞ্জারাস লোক। আগুনের মত উত্তাপ লোকটার ভিতর। মিশরের দামী অপারেটর সে। মেজরের পোস্টে ছিল সে আর্মিতে। পনেরো দিন আগে রানা জানত আত্হার আলজিরিয়ায় আছে।

ছবিটা ব্যাগে ভরে রেখে জানতে চাইল, 'কতদিন থেকে জানো তুমি আত্হারকে?'

'গত জন্ম থেকে।' হাসল বিছানায় শুয়ে শুয়ে লিসিল। 'হোসেন চেয়েছিল আমি তোমাকে খুঁজে বের করে সব কথা জানাই। কিন্তু আমার পদ্ধতিটা জগাখিচুড়ি হয়ে গিয়েছিল।' বিছানায় উঠে বসে পা দুটো ঝুলিয়ে দিয়ে আলতোভাবে মেঝেতে ঠেকাল।

'জেনারেল বেলচাকে যা বলতে চাও না আমাকে তা বলে খালাস হও, লিসিল।'

হাসল লিসিল। রানা বলল, 'তোমার প্রেমিক কেন আমাকে খুঁজে বের করার নির্দেশ দিয়েছিল?'

উত্তর না দিয়ে চুপ করে তাকিয়ে রইল লিসিল। রানা বলল, 'কায়রো ড্যান্সারের সাথে এর সম্পর্ক আছে?'

'আছে। সর্বশেষ সংবাদও আমরা রেখেছি, সর্বপ্রথমও। আমরা না বলে আত্হার বলাই ভাল। ওর সাথে কাজ করার সময় ঘনিষ্ঠতা হয় আমাদের। আরকিওলজিস্ট আমি। ওরও শখ আছে এতে। কয়েকবার মাত্র দেখা হয়েছে আমাদের আর্জেন্টিনায় প্রত্নতাত্ত্বিক বিষয়ে গবেষণা শেষ করার পর। কিন্তু নিয়মিত চিঠি আদান প্রদান হয় আমাদের মধ্যে। আত্হার সব জানায় আমাকে। পৃথিবীর সব দেশ থেকেই পণ্ডিত বিজ্ঞানীরা স্রেফ নিরুদ্দেশ হয়ে যাচ্ছে।' রানার মুখের দিকে নিষ্পলক চোখ রেখে আবার শুরু করল লিসিল, 'কেন, শোনোনি কর্নেল সেলিম আল-রশিদ-এর নাম? এটা তার কভার নেম, ধারণা করি। লোকটা কে বা কি এখনও আমরা জানি না। সিরিয়ান ন্যাশনালিস্ট, অরিজিনালি, তবে মিডল ইস্টের বহু রেভ্যুলেশনের জন্যে সে দায়ী। একবার সে নাসেরের বিরুদ্ধে কু করার চেষ্টাও চালিয়েছিল। আরাবিয়ান নাইটস্-এর দানবের মত ভয়ঙ্কর সে। একটা মনস্টার। এবং বর্তমানে হুবার্ট ডনফিল আল-রশিদের হাতে পড়েছে গিয়ে।'

'তার উদ্দেশ্য কি?'

'মি. ডনফিলকে পাচার করা অন্যত্র। যেখানে সে আর তার ড্যান্সাররা

শাসন কায়েম করেছে। কোথায় জানি না। আমরা মি. ডনফিলকে ফিরে চাই নিশ্চয়। কিন্তু বিশ্ববাসীর কপালে দুর্ভাগ্যজনক কিছু ঘটার আগে চাই কায়রো ড্যান্সারদেরকে ধ্বংস করতে।'

'সেলিম আল-রশিদ এখন মিউনিকে?'

'হোসেন তাই মনে করে।'

ওদেরকে বিশ্বাস করা যায় কিনা বুঝতে পারল না রানা। তবু বলল, 'কেউ এলে যেন দরজা খোলা না হয়।' ইউনুসের সাথে দেখা করা দরকার ওর। দরজার বাইরে অবধি এল বনবন ওর সাথে।

'তোমার কথা ভুলব না কখনও, রানা। ওর কথায় বাবাকে দোষী ভাবা উচিত হয়নি। বোধহয় জীবনের সবচেয়ে বড় ভুলটি করে ফেলেছি। তুমি কি ভাব, রানা? আমার বাবা নাজী অপরাধী?'

'ঠিক জানি না, বনবন। সব কথা জানাব আমরা সময় হলে।' বেরিয়ে পড়বার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে রানা। কিন্তু বনবন ওর গালে তিনটে আঙুল ঠেকিয়ে বুলিয়ে দিচ্ছে আনমনে। মেয়েটির চোখের দৃষ্টি অসহায়। অস্ফুটে কথা বলে উঠল ও, 'তোমার জীবন আমি বুঝতে পারিনি যেমন লিসিল বোঝে। তুমি হয়তো নিষ্ঠুর, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে তুমি খুব ভাল লোক। আর তোমার ওপর খুব বিশ্বাস রাখতে ইচ্ছে হচ্ছে আমার। সাহায্য আর উপদেশ পাবার জন্যে একজন ভাল মানুষ দরকার আমার।'

'লিসিলের সাথে থাকো।' রানা বলল, 'সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'আমার বাবাকে...আমি আর একবার দাঁড়াতে চাই আমার বাবার সামনে, জানো?' বনবন ফিসফিস করে উঠল, 'আমার অপরাধের জন্যে ক্ষমা চাইব আমি বাবার কাছে।' গলা কাঁদ কাঁদ হয়ে উঠতে নিজেকে সামলে নিল বনবন, 'তুমি তো খুঁজছ বাবাকে, রানা। আমাকে সঙ্গে নেবে তোমার?'

'পারব কিনা জানি না। চেষ্টা করব।'

'ধন্যবাদ, রানা। ধন্যবাদ।' হাতটা রানার গাল থেকে নামিয়ে নিয়ে ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াল বনবন।

'শোনো।' রানা ডাকল। দাঁড়িয়ে রইল বনবন পিছন ফিরেই। মেজর জেনারেল রাহাত খানের কথাটা মনে পড়ে গেল রানার—মেরে রেখে এসো।

বনবনের দুটো কাঁধ ধরে ঘুরিয়ে আনল ওকে মুখোমুখি রানা। বলল, 'তুমি বড় ভাল মেয়ে, বনবন।' বনবনের চোখের পানিতে ভিজে গেল রানার গাল।

সময়মত পৌঁছুল রানা। কিন্তু সাইন্স মিউজিয়ামের আলোকিত গেটের কাছে ইউনুসকে দেখা গেল না। পায়চারি করে বেড়াল খানিকক্ষণ। তবু দেখা নেই ইউনুসের। চিহ্নিত হবার সাধ হলো না রানার। হাঁটতে শুরু করল ও। পাঁচ মিনিট পর আবার এল গেটের কাছে। আকাশের দিকে তাকাল ও। মেঘ জমেছে। পার্কিং লটের দিকে তাকাল। অনেক গাড়ির ভীড়। ইউনুসের দেখা নেই। রানা আবার অন্ধকার দিকটা বেছে নিয়ে পা বাড়াল মিউজিয়ামটা চক্কর মারার জন্যে।

'রানা!' শান্ত গলা ভেসে এল অদূর থেকে।
দাঁড়িয়ে পড়ল ও। একই সাথে পকেটে ঢুকে গেছে হাতটা ওর। ঘুরে দাঁড়িয়ে দৃঢ় পায়ে এগিয়ে আসতে দেখল রানা মেজর আত্হার হোসেনকে।
ছোট ছোট মাথার চুলগুলা বুরুশের দাঁড়ার মত খাড়া আত্হারের। কালো স্থির চোখ দুটো বুদ্ধির ও কঠোরতার পরিচয় দেয়। মজবুত স্বাস্থ্যটা বোঝা যায় যেন কোটের বাইরে থেকেও। প্রায় চারকোনা হাতের পাঞ্জা বাড়িয়ে দিল আত্হার রানার দিকে। করমর্দনে আন্তরিকতার ছোঁয়া পেল রানা। কিন্তু আত্হারের চোখের দৃষ্টিতে অনুসন্ধান আর সামান্য চ্যালেঞ্জ দেখল ও। তারপর হাসি ফুটে উঠল সারা মুখে। হাসলে ছেলেমানুষ ছেলেমানুষ দেখায় ওকে।
'ইউনুস একটা অ্যাক্সিডেন্টে পড়ে দেরি করে ফেলেছে। খানিক পর পৌঁছুবে ও। আমাদের দেখা হওয়া উচিত ভেবে সুযোগটা নিলাম।'
'ইউনুসের দেরির জন্যে তুমি দায়ী নও তো?'
'না। আপাতত আমার কথা বিশ্বাস করতে হবে তোমাকে। আমার ধারণা আমরা কাজ করতে পারি একসাথে।'
'দেখা যাবে। ইউনুস তোমাকে এই সাক্ষাৎকারের কথা বলতে পারে না।'
'ওর ফোন ট্যাপ করেছি আমরা। তোমার সাথে এখানে দেখা করবে সে তা জানার পরই সম্ভব হলো। অবাক হয়ো না, মেজর মাসুদ রানা। আমি ইতিমধ্যে শুনেছি লিসিল গুলি খেয়েছে। তোমার সাহায্যের জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। তোমার হোটেলে মেসেজ পাঠিয়েছি, যাতে লিসিল এখানে এসে পৌঁছোয়। ওকে আমার দরকার।'
'ভুল করেছ।' রানা বলল, 'ওকে হত্যার চেষ্টা চলছে।'
'আমাদের সবাইকে হত্যার চেষ্টা চলছে, তাই নয় কি?'
—আতহার হাসল আবার। 'লিসিলকে আমি ভালবাসি। কিন্তু তুমি জানো আমাদের চরিত্রে ব্যক্তিগত বিষয় সব সময় দ্বিতীয়-তৃতীয় স্তরের গুরুত্ব পায়। তাছাড়া লিসিল বলল সে তোমাকে সব কথা জানায়নি। সেজন্যেই ওকে আমাদের সাথে মিলিত হতে বলেছি এখানে।'
'কি ধরনের গাড়িতে আসছে ও?' মাথার ভিতর ওয়ার্নিং সিগন্যাল বাজতে শুরু করেছে রানার।
'কালো ক্যাডিলাক...'
'চলো, দেখি আসছে কিনা।'
বৃষ্টি নেমেছে। ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টি। গেটের ছাত ত্যাগ করে পার্কিংলটের দিকে পা বাড়াল রানা। পাশে আত্হার। কয়েক পা এগিয়েই পার্কিংলটের বিপরীত দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে উঠল ও, 'ওই যে,—ওই যে লিসিল।'
লিসিলকে না, কালো ক্যাডিলাকটাকে দেখা যাচ্ছে। দাঁড়িয়ে আছে সেটা। কখন এসে পৌঁছেছে বুঝতে পারল না রানা। রানাকে ছাড়িয়ে দ্রুত পা বাড়াল সেদিকে আত্হার।

'দাঁড়াও।' রানা বলে উঠল।

রানার কণ্ঠস্বরের কাঠিন্য অনুভব করে দাঁড়িয়ে পড়ল আত্হার, 'হোয়াট ইজ ইট? হোয়াটস্ দ্য ম্যাটার?'

'জানি না।'

'লিসিল বসে আছে গাড়ির ভিতর।'

'এখানে দাঁড়াও, আত্হার।' তীক্ষ্ণ চোখে অল্প দূরের গাড়িটার ভিতরে কিছু দেখা যায় কিনা লক্ষ্য করার চেষ্টা করল রানা। আত্হার আবার পা বাড়াল। খপ করে ধরে ফেলল হাতটা রানা। বলল, 'আমি আগে যাব।'

'কিন্তু লিসিল—!'

'আই অ্যাম সরি।' রানা বলল। মাত্র কয়েক মিনিট আগে লিসিলকে বারবার সাবধান করে দিয়ে এসেছে ও রুমের দরজা না খুলতে! কিন্তু আত্হারের নির্দেশে দরজা খুলে বেরিয়ে এসেছে সে। ব্যাপারটা মনে প্রাণে বিশ্বাস করতে পারল না রানা।

লিসিল বসে আছে একেবারে শান্ত হয়ে। ক্যাডিলাকের হুইলে এখনও ওর হাত দুটো। ওর ব্রাউন চোখ দুটো সামনের শূন্য বিল্ডিংটার দেয়ালটার গায়ে নিবদ্ধ। কিন্তু অত্যন্ত নিখুঁতভাবে জবাই করা হয়েছে ওকে।

গলাটা এক কান থেকে আর এক কান পর্যন্ত কাটা লিসিলের।

পাঁচ

আত্হার হোসেন গাড়ির দিকে এগোল। রানা সামলাল ওকে। বলল, 'পিছনে থাকো, মেজর। ওকে দেখার দরকার নেই তোমার।'

কেঁপে উঠল লোকটার গলা, 'লিসিল?'

'শি ইজ ডেড। ইটস্ এ মেস।'

'লিসিল!' দু'হাতে নিজের গাল চেপে ধরল আত্হার। গাড়ির দরজা বন্ধ করে দিয়ে সরিয়ে নিয়ে এল ওকে রানা। চোখের সামনে অন্ধকার দেখছে আতহার। বিক্ষিপ্ত পায়ে দূরে দাঁড়াল এসে রানার সাথে।

'আমরা—আমরা বিয়ের প্ল্যান করেছিলাম—লিসিল…!' ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল আত্হার শোকাবহ কালো রঙের গাড়িটার দিকে। ঝির ঝির করে বৃষ্টি পড়ছে মাথায়। আত্হারের কাঁধে একটা হাত রাখল রানা।

আত্হার বলে উঠল, 'ওর কোনও দোষ ছিল না। আমার জন্যে শুধু কাজ করছিল এটায় ও। আমরা বিয়ের কথা ভাবছিলাম…'

'একটু থামো, আত্হার।' রানা কাঁধে চাপ দিল আত্হারের।

'কায়রো ড্যান্সাররা দায়ী—ওই ফ্যানাটিক ডেভিল বা—।' ঝট্ করে তাকাল আত্হার রানার চোখের দিকে, 'আমাকে সাহায্য করবে, রানা?'

'করব। পারলে চেষ্টা করব।'

একটা মোটর সাইকেল সশব্দে এগিয়ে আসছে ওদের দিকে। ক্যাডিলাকটার পাশে এসে থামল সেটা। ইউনুস মোটর সাইকেল থেকেই দেখতে পেল গাড়ির ভিতরটা। নেমে পড়ে দ্রুত এসে দাঁড়াল সে ওদের দু'জনার কাছে, 'আমাদের সাথে পূর্ণ সহযোগিতা করার নির্দেশ দেননি কেন আপনি মিস্ লিসিলকে?'

'শাট আপ,' ধমকে উঠল রানা, 'ওকে এখন কিছু বোলো না।'

'কিন্তু মিস্ লিসিল আপনার রূমে মি. আত্হারের জন্যে কয়েকটা জিনিস লুকিয়ে রেখেছিল, স্যার!'

আত্হার বলে উঠল, 'আমার দোষ। ভুল হয়ে গিয়েছিল অনুমানে। কিন্তু আমি জানতাম না তোমরা আমাকে সাহায্য করবে কি করবে না। যদি ওকে শুধু আমি বলতাম যে…'

রানা ইউনুসকে বলল, 'এখন বেশি সময় নেই আমাদের। লিসিল কি লুকিয়ে রেখেছিল?'

'দুটো জিনিস আপনার বিছানার নিচে লুকিয়েছিল, স্যার। আপনি চলে আসার পর মিস বনবনকে কথাটা জানায় সে। আর আপনাকে অনুসরণ করার জন্যে বাইরে বেরুবার সিদ্ধান্ত নেয়। ও বেরুবার খানিক পর আমার অ্যাক্সিডেন্টের খবর দেবার জন্যে আপনার রূমে যাই আমি। মিস বনবন দেয় এগুলো আমাকে।' পকেট থেকে একটা পোস্টকার্ড আর অ্যাডমিশন টিকেটের মত দেখতে একটা জিনিস বের করে দেয় রানাকে ইউনুস।

দুটো জিনিসের পরস্পরের সাথে কোন যোগাযোগ পেল না রানা। পোস্টকার্ডটা সাধারণ মিউজিয়াম স্যুভেনির, কেনা হয়েছে মিউনিকের Altee Pinakothek থেকে। জিনিসটা বাইজেনটাইন মোজাইকের রিপ্রোডাকশন। গোল মাথা উঁচু করে একজন দেবতাকে আঁকা হয়েছে কার্ডের উপর। দেবতার এক পা উঁচু করে তোলা, বাহুদ্বয় সান্ত্বনা দেবার ভঙ্গিতে ওঠানো শূন্যে। অদ্ভুত দেখাচ্ছে। দেবতা যেন নাচছেন।

দ্বিতীয় জিনিসটা একটা টিকিট। একজনের অ্যাডমিশন অক্টোবারফেস্ট জাভেরিয়্যান ক্যালিডস্কোপ থিয়েটারে। উলঙ্গ ফোক ড্যান্সের আস্তানা অক্টোবারফেস্ট। দুটো জিনিসই পকেটস্থ করল রানা। ইউনুসের দিকে ফিরল ও, 'অ্যাক্সিডেন্ট?'

'একটা ট্রাক পাশ থেকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয় গাড়িটাকে রাস্তার পাশে। খাদে পড়ে গেছে গাড়ি। আগেই লাফিয়ে পড়ে জান বাঁচিয়েছি আমি।'

'ট্রাকটা?'

'লোকাল ট্রাক। অক্টোবারফেস্ট থিয়েটারের সাইন ছিল গায়ে।'

'গুড এনাফ,' বলে উঠল রানা।

বৃষ্টি তেরছাভাবে ঝরতে শুরু করেছে। চারপাশে কোথাও লোকজন নেই। লিসিলের লাশ আর গাড়িটার একটা ব্যবস্থা করা দরকার। রানা বলল আত্হারকে, 'জেনারেল বেলচাকে ডাকতে হবে। তোমার মতই খুব একটা আস্থা নেই ওর ওপর আমার। তবু।' ঘড়ি দেখল রানা, 'আমাকে যেতে

হচ্ছে। ওকে খবর পাঠিয়ে অপেক্ষা করো তোমরা।'

ইউনুস বলল, 'কি ভাবছেন?'

'একা একটা কাজ করতে চাই আমি।'

'সঙ্গে যাচ্ছি আমি,' ঘোষণা করল আত্হার, 'তোমার যদি ধারণা থাকে কোথায় জানোয়ারগুলোকে পাওয়া...'

'পরে, আত্হার। তুমি ওদেরকে নিজের হাতে সাজা দিতে চাও?'

'চাই।' অস্বাভাবিক কঠিন আতহারের গলা, 'চাই। লিসিলের খুনীকে হাতে পেতে চাই। ফেড়ে...'

'তা হলে আমার নির্দেশ শোনো। আমরা সৌখিন কোন দলের সাথে যুদ্ধে নামিনি। বুঝতে পারছ না মানুষের এক কানাকড়িও দাম দেয় না ওরা! না নিজেদের না আমাদের। তুমি বনবনকে নিরাপদে রাখো। গুরুত্বপূর্ণ কাজ ওটা। আমার হোটেলে দেখা হবে তোমাদের সাথে—যদি ভাগ্যবান হই।' কিন্তু ওদের সাথে দেখা করার কোন ইচ্ছা পোষণ করছিল না মনে মনে রানা। দুর্ধর্ষ গ্যাঙটার হেডকোয়ার্টারে পৌঁছতে চায় ও। সুযোগ পেলে হাতছাড়া করবে না রানা।

অক্টোবারফেস্ট গ্রাউন্ডের ব্যাভেরিয়ান লোকজনদের ম্লান করতে পারেনি বৃষ্টি। ছুটোছুটি আর শোরগোল, ব্যান্ডের চড়া আওয়াজ আর হাতছানি, চোঙায় মুখ লাগিয়ে ঘোষণাচ্ছলে চিৎকার করা আর নিওনের জ্বলা-নেভা সবই সমান তালে চলেছে। এগজিবিশন বুথ থেকে হল্লার তোড় সবচেয়ে বেশি আসছে। কি খুঁজছে তা নিজেই ভাল জানে না রানা। কিন্তু পাওয়া মাত্র চিনতে পারবে বলে বিশ্বাস ওর। প্রায় নগ্ন পোস্টার দেখতে দেখতে ঘুরে বেড়াতে শুরু করল রানা।

চারপাশের লোকজন সবাই কোন না কোন চরম উত্তেজনার শিকার হতে চাইছে বলে মনে হলো রানার। আদিম আদিম গন্ধ গোটা পরিবেশটায়। ধীর পায়ে ঘুরতে লাগল ও।

কেউ অনুসরণ করছে কিনা বুঝতে পারল না রানা। কেউ চোখে গেঁথে রাখলেও ধরা মুশকিল। কিন্তু হাস্যরত, চিৎকাররত নরনারীর মাঝখানে নিজেকে লুকিয়ে রাখারও চেষ্টা করছে না রানা। ধরা পড়তেই চাইছে ও। হুবার্ট ভনফিল যেখানে আছে সেখানে যাওয়াটাই উদ্দেশ্য।

কিন্তু ওকে বয়ে না নিয়ে গিয়ে লিসিলের মত গলা কেটে ফেলেও দিতে পারে লাশটা। ওদের পক্ষে সহজ আর নিরাপদ হবে সেটা। তার মানে ওদেরকে কৌশলে জানাতে হবে যে ওদেরই স্বার্থ অক্ষুণ্ন রাখতে হলে ওকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে।

বোঝানোটা সহজ কাজ নয়।

এমন কি ও সফল হলেও মেরে ধরে হাড়গোড় গুঁড়ো করে ছাড়বে।

যা খুঁজছিল তা পেয়ে গেল হঠাৎ রানা।

বিরাট প্যাভিলিয়ানে মোটা মোটা নিওন সাইনে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে

অ্যারাবিক অক্ষরে : কায়রো ড্যান্সার।

প্রথমবার হেঁটে যাওয়ার পর স্বাভাবিক চোখে একবার মাত্র তাকিয়েই দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল ও। পাশাপাশি ড্যান্সারদের বিরাটাকৃতি বুক। দেহ নাম মাত্র, বুকগুলো ফুটিয়ে তোলা হয়েছে বিরাট আর নিখুঁতভাবে। রঙিন আলোর বন্যায় উজ্জীবিত হয়ে উঠেছে ছবিগুলো। পরবর্তী প্রবেশ পথ দিয়ে ভেসে আসছে করতালি আর বাদ্যযন্ত্রের অবিরাম ধ্বনি। সংলগ্ন হলের ভিতর ঢুকে পড়ল রানা ভীড় ঠেলে। বেলী ড্যান্স হচ্ছে হলের স্টেজে। স্টেজে নজর ফেলার জন্যে আরও এগোতে হলো ওকে ভীড় ঠেলে। হল বিলম্বিত উল্লাস ধ্বনিতে মুখর। শিস দিচ্ছে কেউ কেউ। খানিকক্ষণ খোলা পেটের ঢেউ খেলা দেখে কর্নারের দরজা দিয়ে ড্যান্সার প্যাভেলিয়ানের ব্যাক এন্ট্রান্সের কাছে চলে এল রানা। ভিতরে ঢোকার ইচ্ছা ওর।

'এফেন্ডি? পারফরম্যান্স দেখতে চান, এফেন্ডি? মেইন ডোর আপনার বাঁ দিকের কর্নারে, এফেন্ডি। এ থাউজেন্ট থ্যাঙ্কস···।' ইংরেজী আরবী মিশিয়ে ব্যাক এন্ট্রান্সের ডোরম্যান মাথা নুইয়ে তসলিম করতে করতে একমুখ হাসির সাথে বলল রানাকে।

ফ্রন্ট বিলবোর্ড এ্যাডভারটাইজিংয়ের একটি নর্তকীর নাম স্মরণ করল রানা। ডোরম্যানকে বলল, 'মাদামোয়াজেল জুজুর সাথে আমার একটা ডেট আছে।' পকেটে হাত ভরল ও।

'ওহ্ ইয়েস, এফেন্ডি। মেজাজ ভাল থাকলে খুব. ভাল মেয়ে মাদামোয়াজেল জুজু। কিন্তু···'

'বুঝেছি।' পকেট থেকে নোট বের করে আনল রানা। টাকাগুলো নিয়ে পকেটে ভরেই আবার একগাল হাসল ডোরম্যান, 'মাদামোয়াজেল জুজু নাচছে এখন, এফেন্ডি। ফাইভ, টেন মিনিটস, নো মোর। হলে অপেক্ষা করেন, ইয়েস্, এফেন্ডি?'

দরজা খুলে ভিতরে ঢুকিয়ে দিল ডোরম্যান রানাকে। পিছনে বন্ধ হয়ে গেল দরজা। স্কিন, ড্রাম, করতালি, অ্যারাবিয়ান ফ্লুট ইত্যাদির শব্দ দূর থেকে ভেসে আসছে। চওড়া একটা হলওয়ের দেয়ালে দেখা যাচ্ছে সারি সারি দরজা। ড্রেসিং রুমের দরজাগুলো খোলা। থিয়েট্রিক্যাল ব্যাগেজ, স্টেজ ফ্লাট গাদাগাদি করে রাখা হয়েছে। ড্রেসিংরুমের ভিতর থেকে মেয়েদের তীক্ষ্ণ বাঁশির মত নিচু হাসির আওয়াজ কানে বিঁধছে। একজন স্বর্ণকেশী রানাকে পাশ কেটে ছুটে গেল ভিতর দিকে শুধু কালো ব্রিফ আর ব্রা পরে। ঘুরে দাঁড়িয়ে জোর গলায় ডাকল রানা, 'মাদামোয়াজেল জুজু?'

মেয়েটি থমকে দাঁড়াল। তারপর ঘুরে তাকাল পিছন দিকে। মাথা নেড়ে 'না' বলার আগে তীব্র ভর্ৎসনার চোখে তাকাল সে। তারপর অদৃশ্য হয়ে গেল একটি ড্রেসিংরুমের দরজা টপকে। রানা পা বাড়াল।

করিডরের শেষ প্রান্তে প্রকাণ্ড স্টেজ এরিয়া। লম্বা চওড়া পর্দা ঝুলছে পিছনে। মিউনিকবাসী দর্শকরা অকস্মাৎ হাজারো কণ্ঠে উল্লাস ধ্বনি করে

উঠল। অডিয়্যান্স যেন ফেটে পড়েছে চরম উত্তেজনায়। অ্যারাবিয়ান ফ্লুটের উচ্চকিত ধ্বনি দিশেহারা গতিতে বেজে উঠল নতুন সুরে। পর্দাগুলো দু'ফাঁক হয়ে গেল পাশ থেকে। সাথে সাথে অর্ধনগ্ন যুবতীরা বন্যার তোড়ের মত বেরিয়ে এল রানার সামনে।

মেয়েদেরকে এমন নির্লজ্জ হতে এই প্রথম দেখল রানা। দৌড়ুতে দৌড়ুতেই অনেকে সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে যাচ্ছে পরবর্তী ভূমিকায় নাচার প্রস্তুতি নেবার জন্যে। মেয়েদের দলটির পিছন পিছন এল পুরুষদের দল। রানা বাঁ দিকে ঘুরল সিঁড়ির দিকে যাবার জন্যে। সিল্ক প্যান্ট আর লম্বা ভেল্ট পরনে নর্তকগুলোর। প্রত্যেকের কোমরে ঝুলছে একটা করে বেঁটে তলোয়ার। ইচ্ছা করেই একটা তলোয়ারের ব্লেড স্পর্শ করল রানা। আঙুলটা সামান্য কেটে গিয়ে রক্ত বেরিয়ে পড়ল। ধারাল জিনিস। লিসিলের কাটা গলাটা ভেসে উঠল চোখের সামনে। এদের মধ্যেই কেউ হয়তো কাণ্ডটা করে এসেছে।

ব্লুপিনস্ট্রাইপ স্যুট পরনে লোকটার দুটো হাত অলঙ্কারে ভর্তি। হাত তুলে বাধা দিল সে সিঁড়ির মুখে রানাকে, 'নো,.নো। প্লীজ, পারমিশন নেই, এফেন্ডি। বাইরে ওয়েট করতে হবে, এফেন্ডি।'

'মাদামোয়াজেল জুজু। ওর সাথে অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।'

লোকটা সবজান্তার মত মাথা নাড়ল, 'খোদার কসম? কিন্তু আমাকে বলেনি সে।'

'সব কথা সে বলে তোমাকে?'

ব্লুপিনস্ট্রাইপ কি যেন বলতে গিয়ে দমন করল নিজেকে। তারপর আরবীতে চেঁচিয়ে উঠে ডাকল কাউকে। দূরের একটা জানালা থেকে সাড়া দিল কেউ। আরবীতে কথাবার্তা চলল কিছুক্ষণ ওদের। ব্লুপিনস্ট্রাইপ যে অপেক্ষাকৃত ক্ষমতাবান বুঝতে পারল রানা কথা বলার ধরন দেখে।

আলোচনা শেষ করে রানার দিকে তাকাল ব্লুপিনস্ট্রাইপ, 'আমি খবর না পেলে পারমিশন দিতে পারি না, মি.…'

'মাসুদ রানা।'

'মাসুদ রানা?'

'দ্যাটস্ রাইট।'

কিন্তু কোন পরিবর্তন হলো না মুখের রেখায়। গলায় ঝাঁঝ এনে সে বলল, 'দুঃখিত, এফেন্ডি। ডোরম্যান পয়সা নিয়ে থাকলে ফেরত নিন গিয়ে।'

টাকার ইঙ্গিত করেও লাভ হলো না। উপরে ওঠার জন্যে কড়াকড়ি নিয়ম লক্ষ করল রানা। ব্লুপিনস্ট্রাইপ সবার কার্ড দেখে তারপর যেতে দিচ্ছে। নিরাশ করছে বেশিরভাগ লোককেই। দু'জন মেয়েকে তো চড় মেরেই বসল জেদ করেছিল বলে। অন্য একটি মেয়ে সসম্মানে অনুমতি পেল।

'আমি যদি মাদামোয়াজেল জুজুর সাথে দেখা করতে না পারি,' তৃতীয় কাউকে দেখতে না পেয়ে রানা পকেটে হাত ভরে বলে উঠল, 'তাহলে হের ডক্টর হুবার্ট ডনফিলের সাথে দুটো কথা বলতে চাই।'

ব্লুপিনস্ট্রাইপের কালো চোখ দুটো এবার মুহূর্তের জন্যে বিস্ময়ে ভরে

উঠল। অস্ফুটে অবোধ্য একটা শব্দ করে তাকাল সে রানার দিকে, 'কি বলা হলো, এফেন্ডি?'

পকেট থেকে অর্ধেকটা বের করে রিভলভার দেখিয়ে রানা বলল, 'পাঁয়তারা ছাড়ো। পথ দেখিয়ে নিয়ে চলো সঠিক জায়গায়।'

'আমার মালিক...।' ব্লুপিনস্ট্রাইপ আতঙ্কিত।

'আল-রশিদ আছে এখানে?'

'হিজ হাইনেস অবস্থান করছেন। কিন্তু কেউ—সাধারণ কেউ তাঁকে দেখতে পায় না, এফেন্ডি।'

'আমি অসাধারণ। পা বাড়াও।' রিভলভার বের করে লোকটার পাঁজরে খোঁচা মারল রানা। কাজ হলো।

'আমার জীবনের দাম খুব কম, এফেন্ডি। কিন্তু আপনার নাম যদি মাসুদ রানা হয়...'

'ইট ইজ।'

'তাহলে বোধহয় মালিক আপনার জন্যে...'

লোকটার পিছন পিছন সিঁড়ির মাথায় উঠে এল রানা। ড্যান্সারদের একজন কোমরে তলোয়ার নিয়ে গার্ড দিচ্ছে মুখেই। ব্লুপিনস্ট্রাইপ তাকে বলল, 'ঠিক আছে আবদুল্লা, যেতে দাও আমাদেরকে।'

'হিজ হলিনেস আশা করছেন ওকে?'

'আল্লা আশা করছেন।'

গার্ড পাশে সরে গেল। ড্যান্সিং মাস্টারকে অনুসরণ করে অডিয়ান্সের উপরকার করিডর অতিক্রম করল রানা। আবার শুরু হয়েছে ড্যান্স। উল্লাসধ্বনির সাথে ভেসে আসছে ফ্লুটের, করতালির, শিস দেয়ার মৃদু শব্দ। একটার পর একটা করিডর অতিক্রম করে চলেছে ওরা। একটার চেয়ে অপরটি অপেক্ষাকৃত অন্ধকার ঠেকল রানার। গোলক ধাঁধা বলে মনে হলো ওর বাড়িটাকে অগুনতি করিডর পেরোবার পর। একটা দরজার সামনে দাঁড়াল ব্লুপিনস্ট্রাইপ।

'এখানে, এফেন্ডি।'

'তুমি আগে।'

আতঙ্ক ফুটল মুখে লোকটার। রানা বলে উঠল, 'জীবনে অনেক পাপ করেছ, আর একটায় কিছু যাবে আসবে না।'

লোকটার হাত কাঁপছে দরজা খোলার সময় দেখল রানা। ব্লুপিনস্ট্রাইপের পিঠে বাঁ হাতের থাবা মেরে ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়ে অনুসরণ করল রানা। ডান দিকে এক পা সরে গিয়ে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়াল ও। কিন্তু অন্যান্যরা—কিংবা মাত্র একজনই—অপেক্ষা করছিল ভিতরে।

ব্লুপিনস্ট্রাইপ মেয়েলী ধরনের আর্তনাদ করে উঠে হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল। জানালাহীন, পোর্টেবল স্ক্রিনের পার্টিশন করা ছোট রুমটা আবছা ভাবে ফুটে উঠল চোখের সামনে রানার। বাল্‌ব জ্বলছে একটা। ধাক্কাটা খেল রানা বাঁ দিক থেকে। হুমড়ি খেয়ে পড়ল ও। মাথার পাশে ঘা লাগল ভারী একটা

কিছুর। রিভলভারটা টেনে নিল কেউ জোর করে মুঠো থেকে। মাথাটা বনবন করে ঘুরছে রানার। কিন্তু এই আঘাত বেশিক্ষণ ভোগাবে বলে মনে হলো না ওর।

আস্তে আস্তে সামলে উঠছে রানা। সময় হয়েছে মনে হতেই মাথা ঝাকিয়ে উঠে বসল ও। সরাসরি তাকাল রানা বিছানার উপর শোয়া লোকটার দিকে। অনুমান মিথ্যা নয় ওর। বিছানায় শায়িত লোকটা দেখছে ওকে পিট পিট করে। হুবার্ট ডনফিলকে চিনতে অসুবিধে হলো না রানার।

রানাকে দেখে যেন কৌতুকবোধ করছে ডনফিলের চোখ দুটো, 'তুমি কে, বাপু? আর একজন প্রিজনার?'

ব্যথায় মাথাটা খসে পড়তে চাইছে ঘাড় থেকে রানার। মাথা নেড়ে উত্তর দিল রানা। বলল, 'আপনি ডক্টর ডনফিল?'

'হ্যাঁ। চেনো দেখছি আমাকে। কিন্তু তুমি বাপু রাগিয়ে দিয়েছ ওদেরকে।' পাকা চুলঅলা মাথাটা নাড়ল ঘন ঘন বৃদ্ধ। 'তুমি আমেরিকান এজেন্ট, আমার জন্যে এসেছ? এরকম কিছু একটা ঘটার আশা করছিলাম আমি।'

নিজের নাম ছাড়া বাকি পরিচয় গোপন রাখল রানা। একমাত্র দরজাটি বন্ধ হয়ে গেছে বাইরে থেকে। পার্টিশনের ওদিকে কিছু নেই জানা কথা। পালাবার প্রশ্ন নেই মনে। বেঁচে থাকতে পারলে উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়।

'ওরা তোমাকে খামোকা সুইসাইড করতে পাঠিয়েছে। হোপলেস।' ডনফিল মন্তব্য করল। রানা অনুমান করল নিশ্চয় কোথাও লুকানো আছে লিসনিং ডিভাইস। সব কথা শুনছে শত্রুপক্ষ। জোর গলায় কথা বলে উঠল রানা, 'কিন্তু যতটা হোপলেস ভাবছেন ততটা নয়। আমি পেয়েছি আপনাকে।'

মধ্যবয়স্ক, স্বাস্থ্যবান, ছোটখাট ডনফিল। মাথায় গ্রে রঙের চুলগুলো পেকে সাদা হয়ে গেছে। নীল চোখ জোড়া সবসময় ছলছল করছে। দাড়ি অগোছাল। ডবল-ব্রেস্টেড স্যুটটা ময়লা আর কোঁচকানো। গালে আঁচড়ের দাগ। নখের আঁচড় হওয়াও বিচিত্র নয়। মাথাটা একটু তুলে বৃদ্ধ কথা বলে উঠল, 'মাসুদ রানা, ইউ সে? তোমরা জানলে কিভাবে ড্যান্সারদের সম্পর্কে?'

'খুব সহজে জেনেছি।'

'কিন্তু কতটুকু আর জানো তোমরা এদের ব্যাপারে? এরা রিলিজিয়াস ফ্যানাটিসিজম আর পলিটিক্যাল অ্যামবিশনের মিক্সচার।' উঠে বসল ডনফিল বিছানার ওপর।

রানা বলল, 'সব জানি। সে মত প্ল্যানও করেছি আমরা। সব ধসে পড়বে সময় হলে। চিন্তার কিছু নেই আপনার।'

মাথা নেড়ে ডনফিল বলল, 'তবে তো ভালই।' বৃদ্ধ মুখ বিকৃত করে ব্যথা সহ্য করার প্রয়াস পেল বলে মনে হলো, 'কিন্তু দেরি যা হবার হয়ে গেছে।'

রানা মাথার ব্যথায় কপাল টিপে ধরে বলল, 'বোকামিটা আপনার।

মেয়েকে জার্মানীতে দেখতে এসেই ভুল করেছেন। যাকগে, সব সমাধান করে দেব আমরা।'

মাথা উঁচু করে রানাকে দেখল ডনফিল, 'তুমি—তুমি বনবনকে দেখেছ?'

'খুব ভাল মেয়ে আপনার।'

'আমাকে স্বীকার করেনি পাগলী।' ডনফিল উদাস গলায় বিড়বিড় করে উঠল, 'আমার নিজের মেয়ে, আমার ছোট্ট বনবন—আমাকে খুনী বলে গাল দিল—'

'আপনি অতীতে যা করেছেন...'

'কিছুই করিনি আমি অতীতে! সব মিথ্যে!' জোর দিয়ে বলল বৃদ্ধ, 'ও আমাকে বলবারও সুযোগ দেয়নি।'

'সবাই তাই বলে। মিলিটারি অর্ডার মেনে সব করেছেন—এই তো বলতে চান?'

'না। ও ধরনের কোন কিছুই জীবনে করিনি আমি, ইয়ংম্যান। কিন্তু তোমাকে বুঝিয়ে লাভ কি আমার? বনবন কোন কথাই শুনল না আমার। পুলিস ডেকে ধরিয়ে দিল খামোকা...'

'সত্যি কথাটা বলা উচিত ছিল আপনার।' আন্দাজে তীর ছুঁড়ল রানা।

'তা কেমন করে সম্ভব হয়! তাহলে আরও জঘন্য দাঁড়াত ব্যাপারটা।'

'জঘন্য, সে কেমন?'

ঘন ঘন মাথা নাড়ল ডনফিল, 'সে কথা বলতে চাই না আমি।'

'কিন্তু বলতে হবে। এখান থেকে বেরিয়ে।'

'আমরা কোনদিন বেরোতে পারছি না ড্যান্সারদের মুঠো থেকে।' তিক্ত গলায় বলল বৃদ্ধ।

'কিন্তু আমাদের লোক জানে আমি এখানে এসেছি।' আড়ালে দাঁড়িয়ে শ্রবণরত লোকগুলোর কথা স্মরণ আছে রানার, 'শুনুন, মি. ডনফিল। হাতে বেশি সময় নেই আমাদের। আপনি জানেন কি চাই আমি। লন্ডনে যাবার সময় লেসার বীম ডেভেলপমেন্টস্-এর ডাটা সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন আপনি। আমাদের কোন লোক সেগুলোর সন্ধান পায়নি।

'সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলাম, সত্যি,' বৃদ্ধ হতাশ কণ্ঠে জানাল, 'ওটা আমারই ভুল।'

'কি ছিল কাগজগুলোয়?'

'ফর্মুলা, নোট, নক্‌শা। নক্‌শাগুলো এঁকেছিলাম, লন্ডনের বন্ধুদেরকে বোঝাবার জন্যে।'

'ওগুলোর ব্যাখ্যা করতে আপনি ছাড়া আর কেউ...'

'না। কেউ পারবে না।'

'ড্যান্সাররা চাপ দিয়েছে আপনাকে? ব্যাখ্যা করার জন্যে?'

'এখনও দেয়নি। কিন্তু সে সময় ঘনিয়ে আসছে। আমি জানি।'

'ব্যাখ্যা করতে রাজি হবেন আপনি?'

এই প্রথমবার জ্বলজ্বল করে উঠল বৃদ্ধ বিজ্ঞানীর চোখ জোড়া, 'তাছাড়া উপায় কি! ওরা নিরাপত্তা, বন্ধুত্ব আর আশ্রয় দেবার প্রস্তাব দিয়েছে। এমন জায়গা দেবে যেখানে কেউ বিরক্ত করবে না আমাকে, যেখানে নিরলস সাধনা করে যেতে পারব...'

'কোথায়?'

'জানি না। ড্যান্সারদের সঙ্গেই বোধহয়।' বৃদ্ধ উপরের দিকে তাকাল, 'ভাবছ, নীতি নেই আমার, আদর্শ হারিয়ে ফেলেছি? ভাবতে পারো—কাজ ছাড়া জীবনে আর কোন জিনিস চিনি না আমি। এই শেষ বয়সে যদি কাজ করতে না পারি তাহলে বাঁচব না—'

বুড়োর ভীমরতি ধরছে বলে মনে হলো রানার। ও জানতে চাইল, 'কাগজগুলোয় আর কি আছে?'

'ব্যাখ্যা করে বোঝানো অসম্ভব। ভাঁজ করা নোট বইয়ের ভিতরই যা কিছু আছে। ইন্সপেক্টর জেনারেল বেলচা আমাকে অ্যারেস্ট করার সময় সেটা পকেটেই ছিল।'

'সে নিয়েছে ওটা?'

'না। ড্যান্সারদের হাতে পড়ার পর ওটা হারাই আমি। ওদের কাছেই আছে এখন।'

'শুনুন, আপনি আশায় বুক বাঁধুন। আমাকে অবিশ্বাস করবেন না। আমাদের লোক ড্যান্সারদের সম্পর্কে যথেষ্ট জানে। আমরা সম্পূর্ণ গ্যাঙটাকে ধ্বংস...'

এমন সময় গত কয়েক মিনিট থেকে যে বাধাটা প্রত্যাশা করছিল রানা তা এল। ওর জানা নেই ভাগ্য পরীক্ষায় ও হারবে না জিতবে। ড্যান্সারদেরকে ও বোঝাতে চেয়েছে ওদের সম্পর্কে অনেক কথা জানে ও। কথাগুলো বের করার জন্যে বাঁচিয়ে রাখতে পারে ওরা। কিন্তু ওর কথা যদি বিশ্বাস না করে থাকে তাহলে দোরগোড়ার লোকটার সামান্য অঙ্গুলি হেলনে প্রাণ হারাতে হবে ওকে।

জোর করে মুখে হাসি নিয়ে ঘুরে তাকাল রানা।

রানা সেই মুহূর্তে বুঝতে পারল সেলিম আল-রশিদের মুখোমুখি হয়েছে ও।

লোকটার দু'ধারে আর্মড ড্যান্সার দু'জন কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়েছে। নিচের পাবলিক স্টেজের গার্ডগুলো এদের তুলনায় শিশু। এদের দু'জনার নিঃশব্দ হাবভাবে উগ্র মেজাজের উৎকট প্রকাশ লক্ষ করল রানা। সবচেয়ে আকর্ষণ করে ডিমের মত দু'জোড়া চোখ। চোখ দু'জোড়ার দিকে না তাকিয়ে রেহাই নেই কারও বুঝতে পারল রানা। তাকিয়ে থাকারও সাধ্য নেই। সারা শরীরে আতঙ্কের ঠাণ্ডা স্পর্শ খেলে গেল রানার চোখ দু'জোড়ার দিকে চাইতে। এক জোড়া হাউন্ড গার্ড দু'জন। ছোট সেলের ভিতর ভেসে বেড়াতে শুরু করেছে মৃত্যুর পদধ্বনি।

গার্ড দু'জনার চেয়ে আকারে বড়, রানার চেয়ে লম্বা, মাঝখানের

লোকটা। গার্ড দু'জনার পরনে গাঢ় রঙের ইউরোপীয়ান পোশাক। সেলিম আল-রশিদ পরেছে ঐতিহাসিক খলিফাদের বিলাসবহুল লম্বা পোশাক। পোশাক দেখে লোকটার বুদ্ধিমত্তাও প্রাচীন ধরনের মনে হতে পারে। কিন্তু পার্থক্যটা বলে দিতে হলো না রানাকে। ওর বুঝতে অসুবিধে হলো না যে ওর সামনে চারকোনা মুখাকৃতি লম্বা স্বাস্থ্যবান দৃঢ়কায় লোকটা ইনটেলেক-চ্যুয়ালদের মধ্যমণি হবার যোগ্যতা রাখে।

উঠে দাঁড়াল রানা।

একজন গর্জন করে উঠল, 'হাঁটু মুড়ে বসো, বেয়াদব! আল্লার দ্বিতীয় পয়গম্বরের সামনে…'

রানা কান দিল না কথাটায়।

সেলিম আল-রশিদ একটা লম্বা শক্তিশালী অলঙ্কৃত হাত নাড়ল। বলল, 'দরকার নেই। এখনও জানে না ও। কুকুর কিনা। কথা বলব আগে, দেখি ভাষা বোঝে কি না।'

পিছিয়ে গেল গার্ডটা এক পা।

সেলিমের গলার স্বর মার্জিত, পরিশীলিত। রানার মুখোমুখি দাঁড়াল সে। 'মাসুদ রানা, অফকোর্স। কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের দুঃসাহসী অপারেটর, ইয়েস। বেচারা ডক্টর সাদেক নিখোঁজ হবার পর পাঠানো হয়েছে। বারোটা দেশের তরফ থেকে জেনারেল রাহাত খানের কাছে ইনফরমেশন পৌঁছেছিল তার আগেই। ইউ অ্যাডমিট ইওর আইডেনটিটি?'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে রানা বলল, 'হোয়াই নট?'

'মেজর জেনারেল এবার ভুল করেছে। ভুল লোককে পাঠিয়েছে সে। ভুলের দাম দিতে হবে তাকে। তুমি ফিরে যেতে পারছ না বলে ভয় পাচ্ছ, মাসুদ রানা?'

'পাচ্ছি।' ফস্ করে বলল রানা, 'তোমার জন্যে ভয় পাচ্ছি। তোমাকে মারব না শুধু, হাতের সুখ মিটিয়ে তবে মারব।'

'তুমি সাহসী লোক। কিন্তু তার চেয়ে বেশি বোকা। তুমি জানো অফকোর্স, সব কথা তোমাদের শুনেছি আমি?'

হিসেব করে রিস্ক নিল রানা একটা, 'আমি সন্দেহ করেছিলাম মাইক্রোফোন লুকানো থাকতে পারে এখানে। জেনেশুনেই রিস্কটা নিয়েছিলাম! কিন্তু তাতে কি? আমার বন্ধুরা তোমার কথা জানে। তারা মুভ করবে সময় হলেই।' রানা হাসল, 'দ্বিতীয় পয়গম্বর ব্যাপারটার ব্যাখ্যা? তোমার ফলোয়ারদের কাছে তুমি বুঝি অমর, সেলিম?'

দু'জন গার্ডই শূন্যে লাফ মেরে উঠল। রশিদ হাত নেড়ে দমন করল তাদেরকে। একটা অদ্ভুত জিনিস লক্ষ করল রানা। লোক দু'জন উপর দিকে লাফ দিয়ে একই জায়গায় পা নামিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু মাত্র এক সেকেন্ডের মধ্যে ওদের ক্রোধ এমন চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে যে হাপরের মত হাঁপাচ্ছে দু'জন ফোঁস ফোঁস করে। রানা বুঝতে পারল এদের হাতে পড়লে বিনা দ্বিধায় বিনা অস্ত্রে মাংস খাবলে তুলে মেরে ফেলবে ওকে আধ মিনিটের

মধ্যে।

'আমি কি আছি আর কি হব সেটা নিয়ে গবেষণা করার সময় তোমার নেই। আমাকে বলতেই হচ্ছে, মৃত্যুর অত্যন্ত কাছে এসে পড়েছ তুমি।'

'তুমিও।' রানা দৃঢ় গলায় বলল, 'আমি একা কাজ করছি না এখানে, তুমি জানো।'

'যতটুকু ভাব তার চেয়েও বেশি নিঃসঙ্গ তুমি। আই অ্যাম সাস্‌পিশিয়াস, মাসুদ রানা। ডনফিলের সাথে তোমার কথা শুনেছি আমি। বিশ্বাস করিনি।'

ভাগ্য পরীক্ষায় হেরে গেছে বুঝতে পারল রানা। বুকের ভিতর দ্রুত হাতুড়ির বাড়ি পড়ছে ওর। আল-রশিদকে বোকা বানানো সম্ভব হয়নি। সাধারণ লোক ভেবে বোকামি করে বসেছে ও।

'এবং তোমার যোগ্যতায় কোনও সন্দেহ নেই আমার। তোমার সম্পর্কে রাহাত খানের চেয়ে কোন অংশে কম জানি না আমি। তুমি বোকা, কিন্তু বোকাদের লীডার হবার অযোগ্য নও। কি জানে তোমার বন্ধুরা ড্যান্সারদের সম্পর্কে?'

'আমার মুখ থেকে কোন কথা জানার ভাগ্য করে আসোনি তুমি।'

'আমি ভাগ্য করে এসেছি যা চাই তাই পাবার। সারাক্ষণ মনে রাখার চেষ্টা করো, আমি তোমাকে পাওনা শাস্তি দিতে চাই। কাউপারকে বেদম মেরেছ তুমি ঢাকায়, বনবনের রুমে খুন করেছ বিন আকরামকে। জীবনভর মনে গেঁথে থাকবে আমার অত্যাচারের কথা—তারপর তোমার সুবিচার হবে—যদি আমার দয়া হয়।'

'তার আগে আমাদের শাস্তির শিকার হবে তুমি, সেলিম। লিসিলকে খুন করার কথা ভুলিনি আমরা।'

'লিসিল আর আত্‌হার দুই ইডিয়েট—তোমারই মত।'

হঠাৎ জানতে চাইল রানা, 'কোন্ দেশে ঘাঁটি গেড়েছ আসলে তুমি?'

সেলিম আল-রশিদ হাসল একটু, 'তুমি বোকা তাই আমাকে বোকার মত প্রশ্ন করছ। কিন্তু উত্তর দিতে আপত্তি নেই আমার। জীবন খুব মূল্যবান। সবাই বেঁচে থাকতে চায়। বোকারা চায় মরতে। বোকামির পরিচয় না দিতে উপদেশ দিচ্ছি। বুদ্ধিমান হবার চেষ্টা করো। হ্যাঁ, চেষ্টা করলেই হবে। তোমাকে আমার বুদ্ধি ধার দিতে পারব। দিতে চাই, যদি তুমি চেষ্টা করো। তোমাকে হয়তো কাজে লাগাতে পারব। না, কোন দেশের, কোন মানুষের হয়ে কোন কাজ করি না আমি কখনও। আল্লা আর আল্লার সৃষ্টির স্বার্থে কাজ করি আমি। আমি তাঁর সত্যিকার পয়গম্বর, এ সেকেন্ড সান অভ আল্লা—জগতে আলো আর শান্তি কায়েম করার উদ্দেশ্যে প্রেরিত। আল্লা এবং তাঁর ফেরেস্তাদের মহান উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে।' সেলিম একটু থেমে আবার হাসল, 'দেখতে পাচ্ছি তুমি আমাকে পাগল ভাবতে শুরু করে দিয়েছ। তোমার ধারণার মধ্যে কোন সত্যতা নেই। বোকামি ত্যাগ করো, মাসুদ রানা…'

এবার সময় হয়েছে বোঝাবার, রানা সিদ্ধান্ত নিল। নিজের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলো ও।

ধারাল ক্ষুরের উপর দিয়ে হেঁটে যাবার সময়ের মত কাটাল পরবর্তী মুহূর্তগুলো। আর কোন উপায় ছিল না রানার। প্রাণ ছাড়া হারাবার নেইও কিছু।

দুটো হাউন্ডের কথা ভাবতে হলো রানাকে। ওদের হাত থেকে এক মুহূর্তের সময় নেয়া দরকার। ডনফিলকেই বেছে নিতে হলো ওকে।

ওরা ভুলেও আশঙ্কা করেনি। সেলিম আল-রশিদ তাই মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল। অকস্মাৎ বিদ্যুৎ গতিতে ঘুসি মেরে বসল সেলিমের নাক লক্ষ্য করে রানা। সামনে এগোল না ও। পিছিয়ে এল দুই লাফে ডনফিলের বিছানার কাছে। লাফিয়ে উঠেছে গার্ড দুটো। কোলে তুলে নিল ডনফিলকে রানা দুই হাত দিয়ে। ডনফিলের ক্ষতি করবার ইচ্ছে ওদের নেই একথা জানা আছে ওর। শূন্যে তুলে ছুঁড়ে দিল ডনফিলকে ও গার্ড দু'জনার দিকে। সাঁ করে বাঁ দিকে সরে গেল তারপরই।

ডনফিল গিয়ে ঠেকল গার্ড দু'জনার বুকের কাছে। লুফে নিল ওরা। বাধ্য হলো আসলে বৃদ্ধকে চারটে হাত বাড়িয়ে ধরে ফেলতে। শূন্য থেকে মেঝেতে পড়লে অক্কা পাবে সাথে সাথে তা বোঝার মত মাথা ওদের আছে। আল-রশিদ নাক চেপে ধরে গর্জন করে উঠল, 'মাহমুদ!'

ডনফিলকে ধরে ফেলেই মেঝেতে নামিয়ে রাখল গার্ড দু'জন। রানাকে তখন দেখা যাচ্ছে দোরগোড়ায়। ঘুরে দাঁড়িয়ে পিছু ধাওয়া করল একজন গার্ড। সেলিম আল-রশিদের শুশ্রূষার জন্যে রয়ে গেল একজন সেলের ভিতর। দরজার বাইরে বেরিয়ে গার্ড দেখল করিডরে মোড় নিয়ে চোখের আড়ালে চলে গেল রানা।

কয়েকটা সিঁড়ি বাকি থাকতেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। পিছনে ভারী পদশব্দ ছুটে আসছে দ্রুত। ড্যান্সিং অ্যাক্ট শেষ হয়েছে আবার। এবার চারগুণ যুবতী। হলের ভিতর ইতস্তত চরে বেড়াচ্ছে কেন ওরা বুঝতে পারল না রানা। ছুটন্ত শব্দ এসে পড়েছে। দেরি করা বোকামি। লাফ দিয়ে প্রায় নগ্ন যুবতী ড্যান্সারদের মাঝখানে পড়ল রানা।

তীক্ষ্ণ বাঁশির মত গলায় কয়েকজন চেঁচিয়ে উঠল। বিভিন্ন ভাষা সজীব হয়ে উঠল মুহূর্তে। উর্দু, ইংরেজী, আরবী, জার্মান, চীনা ইত্যাদি ভাষা এক সাথে শোনার ভাগ্য এই প্রথম হলো রানার। দু'হাত দিয়ে মেয়েগুলোকে দু'পাশে সরাতে সরাতে ছুটল রানা। হলের ভিতর শুকুনিদের চিৎকারে লঙ্কাকাণ্ড বেধে গেছে।

স্টেজ এরিয়ার দিকটা ফাঁকা দেখে সেদিকেই দৌড়ুল রানা। ভাঁজ করা পর্দার পাশ দিয়ে ছুটতে ছুটতে করিডরের শেষ প্রান্তে এসে মোড় নিল রানা। কোন্ দিকে চলেছে সে সম্পর্কে কোনও ধারণা নেই ওর। কিন্তু বেশিদূর যেতে চায় না ও।

গার্ডের পায়ের আওয়াজ আবার এগিয়ে আসছে। একটা দরজা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে দূরে দেখতে পেল রানা। একটা বাহুর অলঙ্কার ঝলসে উঠল রুমের

উজ্জ্বল আলোয়। বন্ধ হয়ে গেল দরজাটা। সেদিকেই ছুটল রানা। কাছাকাছি পৌঁছুবার আগেই দরজাটা আবার ফাঁক হলো একটু। ফর্সা এক যুবতীর মুখ বেরিয়ে এল বাইরে। রানাকে প্রাণপণে ছুটে আসতে দেখে বড় বড় চোখ জোড়ায় বিস্ময় ফুটে উঠল। তারপর দরজাটা আরও ফাঁক করে হাত-ইশারায় আহ্বান করল রানাকে। চিনতে পারল রানা। ড্রেসিংরুমের কাছে মেয়েটিকে ডেকেছিল ও।

দৌড় না থামিয়ে সোজা রুমের ভিতর ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল রানা। তারপর অকস্মাৎ সবেগে ঘুরে দাঁড়িয়ে চেপে ধরল যুবতীর মুখ। তার ঘাড়ে রানার হাতের চাপ লাগল। গার্ডের পায়ের শব্দ কাছে সরে এল। তারপর মিলিয়ে গেল দূরে। যুবতীর মুখ থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে রানা বলল, 'থ্যাঙ্কস।'

'রেহাই পাবে না তুমি।' ফিসফিস করে বলল মেয়েটি। রানা ওকে ছেড়ে দিলেও সরে গেল না ও, 'যাই হোক, আমিই মাদামোয়াজেল জুজু, যাকে তুমি খুঁজছিলে। তখন স্বীকার করতে ভয় পেয়েছিলাম আমি, কারণ তোমার সাথে ডেট ছিল না আমার।'

'এখন?'

'এখনকার কথা আলাদা।'

'এখান থেকে বেরুবার রাস্তা আছে?' রুমের চারটে দরজা লক্ষ করে বলল রানা।

'না, নেই। কপালে খারাবি আছে তোমার।' সরে গেল জুজু। রানাকে নিরীখ করতে করতে বলল, 'ওরা তোমার পিছনে লাগল কেন? মাহমুদ আর হারাকিম ভয়ঙ্কর...তোমার কপালে...আমাকেও ছাড়বে না ওরা।'

'আল্লার দ্বিতীয় পয়গম্বর হাত করতে চায় আমাকে। তোমার বিপদ ঘটবে জেনেও ডাকলে কেন?'

ট্রাঙ্ক, কস্ট্যুম, সিঙ্গল চেয়ার, দাগ পড়া আয়না, মেক-আপের নানা কৌটো রুমটার ভিতর। একটি মাত্র জানালা। সেদিকে এগিয়ে যাবার উপক্রম করতে জুজু বলে উঠল, 'জানি না। ওদেরকে আমি সহ্য করতে পারি না আর। রোজ আসে হারাকিম আমার ঘরে—আমাকে ছিঁড়ে খায় সবাই মিলে...ওদের বিরুদ্ধে কিছু করার সুযোগ পেলে ছাড়ি না আমি...'

জানালার কাছে গিয়ে সেটা সামান্য খুলে বাইরে তাকাল রানা। করিডরের শেষ প্রান্ত অবধি দেখা যাচ্ছে। কয়েকজন ড্যান্সার হাত নেড়ে তর্ক করছে উত্তেজিতভাবে। হঠাৎ দু'ভাগে ভাগ হয়ে গিয়ে হাঁটা দিল ওরা। একটা দল এদিক পানে আসছে। খোলা তলোয়ার ওদের হাতে। ওদের গতিবিধি দেখতে লাগল রানা আড়ালে থেকে।

'মাসুদ রানা?'

খানিক পর জুজুর গলা শুনে সবিস্ময়ে ফিরে তাকাল রানা। ওর নাম জানল কিভাবে মেয়েটি? জুজুর ঠোঁটে রহস্যময় হাসি দেখে সতর্ক হয়ে উঠল রানা। কিন্তু দেরি হয়ে গেছে তখন। কিছু একটা বাড়ি খেল ওর মাথার সাথে।

বালবটা সহস্র টুকরো হয়ে জ্বলতে লাগল চোখের সামনে। পায়ের নিচের মাটি কাঁপছে অবিরাম। কিন্তু এটুকুই সব নয়।

ঢলে পড়ে যাবার সময় জুজুর নরম দুটো হাত ওকে আঁকড়ে ধরল স্পষ্ট অনুভব করল রানা। জানালার কাছ থেকে সরিয়ে আনল জুজু ওকে। মৃদু গলায় কাকে যেন কি বলল। সেলিম আল-রশিদের নামটা শুধু ধরতে পারল রানা। তারপর একটা ছুটন্ত পদশব্দ দূরে মিলিয়ে গেল।

রানার মনে পড়ল ট্রয় ধ্বংসের জন্যে দায়ী ছিল এই মেয়ে জাতেরই নামকরা একজন। রানার দেহের সাথে শরীর ঠেকিয়ে রেখেছে জুজু। পায়ের শব্দ আবার দূর থেকে কাছে এসে থামল। রানা অনুভব করল ওর পেশীবহুল বাহুতে সূঁচের মত কিছু ঢুকছে। চোখ মেলার চেষ্টা করল ও। আলোয় ঝলসে উঠল চোখ। তারপরই বন্ধ হয়ে গেল চোখের পাতা।

অন্ধকারে সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলল রানা নিজেকে।

ছয়

সময় আর স্থানের কোনও অস্তিত্ব নেই। ওর দেহের সাথে হাড়ের, মাংসের, মাংসপেশীর, রক্তের, পারিপার্শ্বিকতার কোনও সম্পর্ক খুঁজে পাচ্ছে না ও। অনুভব করছে কি যেন কাঁপছে সর্বক্ষণ। কিন্তু নিজে কাঁপছে কিনা বুঝতে পারছে না। ওজনহীন বলে মনে হয় নিজেকে। কিছুই দেখতে পাওয়া যায় না। মাঝে মাঝে হঠাৎ এক ঝলক আলো যেন খেলে যায়। কত দূর কত কাছে বোঝা যায় না। অর্থহীন মনে হয় সব। ও জানে বেঁচে আছে এখনও, কোথাও নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ওকে—এর বেশি কিছু না।

এর বেশি কিছু চায়ওনি রানা।

এরপর লম্বা একটা সময় সম্পর্কে কোন ধারণা করতে পারল না রানা। চিন্তাশক্তি ফিরে আসার পর অকারণ একটা ভীতিবোধ কাঁপিয়ে তুলল ওর অস্তিত্ব।

ঘাড়ে ব্যথা। মাথার ভিতর বিদ্রোহ করেছে শিরাগুলো। নড়াচড়ার চেষ্টা করে এক-আধ ইঞ্চির বেশি সরাতে পারল না মাথাটাও। গালে হাত দেবার জন্যে হাত দুটো টানার চেষ্টা করল এবার। আসছে হাত দুটো উঠে গালের দিকে। তার মানে বাঁধা নেই।

খোঁচা খোঁচা দাড়িতে ঠেকল হাত দুটো। পিঠ পেতে শুয়ে আছে ও। কত দিন কেটে গেছে কে জানে। এটা পৃথিবী তাতে কোন সন্দেহ নেই রানার। শক্ত মাটির স্পর্শ পিঠে। বেঁচে আছে, কারণ অক্সিজেন পাচ্ছে ও। কিন্তু বড্ড গরম। মাথার ব্যথাটা ভীষণ খারাপ করে দিচ্ছে মেজাজ। গতকাল বরফের মতো ঠাণ্ডার মধ্যে কাটিয়ে এখন গরমের হাতে পড়েছে

দেহটা।

খিদে পেয়েছে রানার। তার চেয়ে বেশি তৃষ্ণায় কষ্ট পাচ্ছে। কেউ খেতে দিতে আসছে না। কিছু যান্ত্রিক আর কিছু পশুর শব্দ ছাড়া আর কিছুই শোনেনি ও।

'হের মাসুদ রানা?'

ঠাণ্ডা ভূতের গলা যেন নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকারে ফিসফিস করে উঠল।

'হের মাসুদ? জেগেছ…তুমি জেগেছ? হের মাসুদ?'

প্রথমবার চোখ মেলে দূরে বাঁ দিকে বিস্ময়বোধক চিহ্নের মত সাদা আলো দেখতে পেল আবছা ভাবে রানা। এছাড়া অন্ধকার অটুট হয়ে রইল সর্বত্র।

'রানা—ওহ্ হের রানা! তুমি বেঁচে আছ…ওহ, তুমি বাঁচবে।'

বিস্ময়বোধক চিহ্নের মত দেখতে আলোটা ক্রমশ পরিষ্কার হয়ে উঠছে। কাছে এগিয়ে আসছে আরও। অন্ধকার দূর হয়ে যাচ্ছে দু'পাশের। এবার দেখতে পেল রানা। ঠোঁট নড়ছে ওর। বিড়বিড় করে ওর নাম ধরে বারবার ডাকছে বনবন।

এই প্রথমবার চেষ্টা করল রানা দ্রুত শক্তি ফিরে পেতে। জোরে ঝাঁকাল মাথাটা। হাত মুঠো করে আস্তে আস্তে ঘুসি মারল মাটিতে। হাত দুটোর উপর ভর দিয়ে উঠে বসতে চেষ্টা করল সে।

রানা বসতে পেরে বুঝতে পারল যতটা দুর্বল ভেবেছিল নিজেকে ততটা দুর্বল সে নয়।

'বনবন।'

'এই যে আমি…'

'কোথায় তুমি?'

'এই তো। তোমার পাশে।'

রানা হাত বাড়াতেই নরম তুলতুলে মাংসের স্পর্শ পেল। ওর হাতটা ধরে রইল বনবন গালের উপর দু'মুহূর্ত। 'কেমন আছ এখন তুমি, রানা?'

'কোথায় আছি আমরা?'

'একটা ঘরে। কোথায় জানি না। আস্তে কথা বলো, প্লীজ। ওরা বাইরে ব্যস্ত রয়েছে। ওহ্ থ্যাঙ্ক গড, ইউ আর অ্যালাইভ! সারাক্ষণ লক্ষ্য করেছি তোমাকে আর ভেবেছি এই বুঝি নিঃশ্বাস বেরুনো বন্ধ হয়ে গেল। আর শিউরে উঠেছি থেকে থেকে তোমার লাশ নিয়ে এই অন্ধকার ঘরে একা ঘণ্টার পর ঘণ্টা দিনের পর দিন কাটাতে হবে ভেবে—' রানার উরু দুটো ধরে ফেলল বনবন হঠাৎ, 'পারবে না তুমি দাঁড়িয়ে থাকতে, রানা—প্লীজ!'

পায়ের জোর পরীক্ষা করার জন্যে উঠে দাঁড়িয়েছিল রানা। কিন্তু দাঁড়াতে না পেরে বসে পড়ল।

মলিন হয়ে গেছে বনবনের মুখের লাবণ্য। গরমের দাপটে খুলে ফেলেছে ও জ্যাকেটটা। জ্যাকেটটা দিয়ে মাংসল উরু দুটো ঢেকে রাখার চেষ্টা করল ও রানার চোখ পড়তে।

'পানি।' ফিস্ ফিস্ করে বলল রানা।

রানার জন্যে কিছু করার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে বনবন। দ্রুত মাথা নেড়ে বলল, 'তোমার জন্যে খানিকটা বাঁচিয়ে রেখেছি। খেতে খারাপ লাগবে তোমার, কিন্তু ফেলে দিয়ো না। খুব কম আছে।' হাত বাড়িয়ে অন্ধকার থেকে একটা এলুমিনিয়ামের বাটি টেনে নিয়ে বনবন ঠোঁটে ঠেকাল। দু'ঢোক পানি খেয়ে সেটা বাড়িয়ে দিল রানার দিকে। আস্তে আস্তে খানিকটা পানি খেল রানা।

'কতক্ষণ ধরে এখানে আছি আমরা?'

'দু'দিন, আমার মনে হয়।'

'দু'দিন? পানি কখন পেয়েছি তাহলে?'

'দিনে একবার। ফরগিভ মি, এই অবস্থায় আমাকে দেখে তুমি কি ভাবছ···।' জ্যাকেটটা গায়ে চড়াতে আরম্ভ করল ও। রানা সেটা ধরে বলল, 'না। গরমে সেদ্ধ হয়ে যাবে।'

'তুমি এত বেশি সময় অজ্ঞান ছিলে যে আমি ভাবছিলাম মরেই যাবে বুঝি···'

'ওষুধটা সাইন্টিফিক নয় সম্ভবত। ঠিক হয়ে যাবে এবার আস্তে আস্তে। চিন্তা কোরো না।' শুয়ে পড়ল রানা ক্লান্তিতে। হাঁপিয়ে উঠেছে ও খানিকক্ষণ বসে থাকায়। জানালাহীন ঘরটার দিকে মনোযোগ দিল ও। চারকোনা ঘরটা। আট ফুটের মত হবে। পুরানো মোটা কাঠের দরজার উপরের সামান্য লম্বা একটা ফাঁক আলো আসার একমাত্র উৎস। ঘরের ভিতরে মলমূত্রের দুর্গন্ধ।

উঠে দাঁড়িয়ে দরজার সামনে গেল রানা বনবনের কাঁধ ধরে। পুরানো কাঠ, স্টীলের মত মজবুত। বাইরে থেকে খিল আঁটা। কীহোল বলে কিছু নেই কপাটের কোথাও। ধাক্কা দিয়ে হেলানো গেল না একচুলও। ধানের সমান লম্বা একটু ফাঁক দেখতে পেয়ে রানাকে দেখাল বনবন। কবাটের গায়ে নাক ঠেকিয়ে বাইরেটা দেখার চেষ্টা করল রানা।

যা দেখল তাতে পরিষ্কার কিছুই বুঝতে পারল না ও। নীল রঙের খানিকটা টুকরো, আর ব্রাউন রঙের খানিকটা টুকরো ছাড়া কিছুই দেখা গেল না। একবার মনে হলো উটের ডাক শুনতে পেয়েছে ও। তারপর পরিষ্কার বুঝতে পারল জীপ স্টার্ট নেবার শব্দ শুনেছে। কণ্ঠস্বরও কানে এল। নিশ্চিত বোধ করল খানিকটা রানা। আরবী ভাষা, কিন্তু বুঝতে পারা গেল না পরিষ্কার শব্দগুলো।

ঘরের দেয়ালগুলো মাটি দিয়ে কোন্ জামানায় খাড়া করা হয়েছিল কে জানে। সূর্যের উত্তাপ আর শিশিরের জল খেয়ে কংক্রিটের চেয়েও কঠিন হয়ে গেছে। কোনও গর্ত নেই কোথাও।

দাঁড়িয়ে পড়ে কোট আর শার্ট খুলে ফেলল রানা। দরদর করে ঘামছে সারা শরীর।

'চিড়িয়াখানার জানোয়ার দুটোকে ক'বার খেতে দেয় ওরা, বনবন?'

'খিদে পেয়েছে তোমার?' উদ্বিগ্ন শোনাল বনবনের গলা, 'কি করি, কিছু

'খিদে পেয়েছে তোমার?' উদ্বিগ্ন শোনাল বনবনের গলা, 'কি করি, কিছু নেই যে!'

প্রচণ্ড খিদের কথা ভুলে গিয়ে রানা হাত রাখল বনবনের মাথায়, 'না থাকলে তুমি আর কি করবে বোকা মেয়ে।'

'একবার সারাদিনে। অখাদ্য। সে যাই হোক, তোমার খিদের কি হবে?'

রানা বলল, 'কে দেয়?'

গলার স্বর অসহিষ্ণু হয়ে উঠল বনবনের, 'হারামিটা আরবী, ডবল শয়তান লোক। আমার হাত পা ধরে মিনতি করে—আদর করার জন্যে...'

বাইরে থেকে ভেসে আসা শব্দ শুনে রানা বুঝতে পারছে মরুভূমির মাঝখানে আছে ওরা। কিন্তু কোন্ মরুভূমি?

বনবনের পাশে শুয়ে পড়ল রানা। গভীর চিন্তায় ডুবে গিয়ে হঠাৎ সংবিৎ ফিরে পেতে ও দেখল বনবন ওর মাথার চুলে আঙুল বুলিয়ে দিচ্ছে।

'তোমাকে এখানে আনল কিভাবে, বনবন?'

'লিসিল জোর করে তোমার রূম থেকে বেরিয়ে যাবার পর...'

'লিসিলের শেষ খবর বলেছে ওরা তোমাকে?'

'না। কি?'

'ওরা খুন করেছে লিসিলকে।'

বনবনের হাত স্থির হয়ে গেল রানার চুলে, 'লিসিল! লিসিল খুন হয়েছে!

রানা কথা বলল না। বনবন বলল, 'কিন্তু দরজায় নক্ হতে আমি ভেবেছিলাম লিসিলই ফিরে এসেছে আবার, কিন্তু সে অন্য একটা মেয়ে—দরজা খুলে দেখতে পাই...' বনবনের কান্নার শব্দ শুনল রানা।

একসময় কান্নার শব্দ থেমে গেল। আর কোন শব্দও নেই কোথায়। না বাইরে না ভিতরে। আরও পাঁচ মিনিট কাটতে রানা বলল, 'তারপর?'

'মেয়েটা আমাকে ধাক্কা মেরে মেঝেতে ফেলে দিলে মাথা ঠুকে যায় আমার দেয়ালে। তারপর মাথায় মারে সে অ্যাশট্রে দিয়ে। আর কিছু মনে নেই। জেগে উঠি আমি তারপর এই ঘরে। প্রথমে ভেবেছিলাম তুমি মরে গেছ। তোমার নিঃশ্বাস বুঝতে পারছিলাম না। বাইরে বেরুবার জন্যে ছুটোছুটি করে বেড়াই অনেকক্ষণ অন্ধকারে। কিন্তু বারবার হোঁচট খেয়েও পথ না পেয়ে চেঁচাতে থাকি, কেঁদে ফেলি হুহু করে—গার্ডটা তারপর ঢোকে এখানে, সে আমাকে... সে আমাকে...' ছেলেমানুষের মত শব্দ খুঁজতে লাগল বনবন। শেষবেলা বলল, 'অন্য একজন এসে পড়ে থামায় ওকে তারপর। তাই পরেরবার ঘরে ঢুকে গার্ড তোমাকে লাথি মারে মনের সাধ মিটিয়ে—আর আমি চেঁচিয়ে মরি।'

কপাল আর চিবুকের ব্যথার ব্যাখ্যা পেল রানা।

'তোমার বাবার সাথে দেখা হয়েছে এখানে একবারও?'

'বাবার সাথে? না।'

সময় কাটছে না। সব কথা ফুরিয়ে গেল। সব শক্তি নিঃশেষ হয়ে এল। এখন অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোনও উপায় নেই।

ধৈর্য কিভাবে ধরতে হয় তা অজানা নয় ওর। কিন্তু একসময় ভেঙে যাবার উপক্রম করল ধৈর্যের বাঁধ। দিনটি যেন মঙ্গলগ্রহের দিনের মত। অনেকক্ষণ শুয়ে থেকে দেখল ও। তারপর অনেকক্ষণ মাটির দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে রইল। তারপর আবার শুয়ে পড়ল। সময় বয়ে চলেছে অর্থহীনভাবে। কিন্তু ঘটছে না কিছুই।

গরমে হাঁপাচ্ছে মুখ হাঁ করে দু'জনে। নিশপিশ করছে বনবন মাটিতে দেহ এলিয়ে দিয়ে। কেউ দেখতে এল না। ওদেরকে কেউ খাওয়াতে এল না।

বনবন একবার তার ছেঁড়া গাউনটা থেকে একফালি কাপড় ছিঁড়ে নিয়ে পানিতে ভিজিয়ে কপালে জলপট্টি দিতে শুরু করল। রানা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল। ওর কপালে জলপট্টি দেবার জন্যে বনবন এগিয়ে আসতে মাটিতে মাথা পেতে শুয়ে পড়ল রানা।

দরজার ফাঁক থেকে আবছা আলোটা ক্রমশ আরও ম্লান হয়ে যাচ্ছে। আবার একবার উঠে ক্ষুদ্র ফাঁকটা দিয়ে বাইরেটা দেখার চেষ্টা করল রানা। নীল টুকরো আর ব্রাউন টুকরো ছাড়া এবারও দেখা গেল না কিছু।

খিদে অসহ্য হয়ে উঠেছে রানার।

অন্ধকার ঘন হয়ে উঠেছে ঘরের ভিতর।

বনবন জিজ্ঞাসা করল অনেকক্ষণ পর, 'পালাবার সুযোগ পাব না আমরা একবারও?'

'কে চায়?'

'কে চায় মানে?'

'তোমার বাবাকে পেতে হলে ওরা যেখানে নিয়ে যেতে চায় সেখানেই যেতে হবে আমাদেরকে। পালাতে চাই না।'

'বাবার দেখা এ জীবনে পাব বলে আশা হয় না। ওঁর সাথে যে ব্যবহার আমি করেছি...'

'তোমার দোষ নেই তাতে।'

'নেই? বলো কি তুমি, যে কষ্ট দিয়েছি ওঁকে তাতে আমার মুখ দেখাবার জো নেই। একমাত্র প্রিয়জন মেয়ের কাছ থেকে অপমানিত হয়ে কোথায় যাবে কে জানে। কোথায় আর যাবার জায়গা আছে ওঁর। বাবা ওদের সাথে যদি যোগ দেন তাতেও আশ্চর্য হব না আমি।' বনবনের গলা ভেজা ভেজা হয়ে উঠল, 'তাছাড়া আর করবার আছেই বা কি ওঁর? আমিই তো ঠেলে দিয়েছি ওঁকে সেদিকে।'

কথা বলার ধৈর্যও নেই আর রানার।

ঠাণ্ডা হয়নি এখনও ঘর। কিন্তু গরম কমেছে। সূর্য ডুবেছে হয়তো এবার।

ঘরটা যে মরুভূমির মাঝখানে তাতে আর সন্দেহ রইল না রানার

কাছাকাছি থেকে মাঝেমধ্যে উটের ডাক শুনে। অনেক দূর থেকে আরবদের গলা শুনে ক'জন লোক বোঝবার চেষ্টা করল ও। কিন্তু কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছুনো গেল না।

অন্ধকার জমাট হয়ে বসেছে। বনবনকে দেখতে পাচ্ছে না রানা।

ধৈর্য ধরা ছাড়া কোন উপায় নেই ওদের।

কিন্তু খুব বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না।

ঠাণ্ডা বরফ হয়ে গেছে ঘরের মেঝে আর দেয়াল। থরথর করে কাঁপছে বনবন। দাঁতের সাথে দাঁতের বাড়ি লেগে ঠকঠক শব্দ হচ্ছে। বিড়ালের মত হাত পা গুটিয়ে মুখ গুঁজে মাটিতে পড়ে আছে সে রানার পাশে। রানা বিস্মিত হয়ে ভাবার চেষ্টা করল বনবনের দায়িত্ব ওর কাঁধে কখন থেকে চেপেছে আর কখন নামবে। তারপর কখন যেন ঘুমিয়ে পড়ল রানা।

ঘুম ভেঙে গেল অদ্ভুত এক শব্দে। জিভ আর টাকরা সহযোগে কে যেন টা টা করে আওয়াজ তুলছে। নড়ল না রানা। চোখের পাতা দুটো একটু ফাঁক করল সন্তর্পণে। মেয়েটি ঘুমুচ্ছে কুণ্ডলী পাকিয়ে।

দরজাটা খোলা। কিন্তু কেউ দোরগোড়ায় দাঁড়িয়েছে এসে। অন্ধকারের সাথে লোকটার গোটা দেহ মিলেমিশে গেছে প্রায়। খেজুরের গন্ধ আসছে ঘরের ভিতর। লোকটার দেহের রেখা দেখে বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না সে স্থূল চেহারার:মোটাসোটা লোক। হাঁটার সময় অদ্ভুত দেখায় লোকটাকে। মাথাটা আগে বাড়িয়ে দিয়ে এগোচ্ছে সে আলগোছে পায়ে পায়ে। হঠাৎ জিভ আর টাকরা দিয়ে শব্দ করে উঠছে আপন মনে। তারপর হেসে উঠছে একটু। লোকটার হাসির মধ্যে গোলমাল লক্ষ করল রানা। ছন্দহীন হাসি। কিম্ভূতকিমাকার আকৃতি নিয়েছে লোকটার গায়ের কম্বল। কোন অস্ত্র দেখা যাচ্ছে না।

উট ডেকে উঠল বাইরে। রানা নড়ল না। আজব প্রাণীটা ঘুমন্ত বনবনের কাছে এসে মাথা বাড়িয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তারপর ঝুঁকে পড়ল সে। একটা হাত বেরিয়ে এল কম্বলের ভিতর থেকে। হাতটা এগিয়ে যাচ্ছে বনবনের তলপেটের দিকে—

আকস্মিক আতঙ্কে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল বনবন।

ক্ষিপ্রবেগে কালো ছায়ামূর্তির দিকে জোড়া পা ছুঁড়ে মেরেই সটান দাঁড়িয়ে পড়ল বনবন। গার্ডটা পায়ের ধাক্কা খেয়ে একটু টলল মাত্র। কিন্তু নড়ল না নিজের জায়গা থেকে। বনবনের একটা হাত ধরে ফেলে মাথাটা নামিয়ে আনল বুকের উপর। বনবনের আর্তস্বর শুনল আবার রানা। লোকটার দ্বিতীয় হাতটা বেরিয়ে এসেছে ইতোমধ্যে কম্বলের ভিতর থেকে। অন্ধকারেও তলোয়ারটা দৃষ্টি এড়াল না রানার। এক ঝটকায় দু'পায়ের উপর ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল ও। চোখের পলকে গার্ড এক হেঁচকা টানে বনবনকে নিয়ে সরে গেল খানিকটা। তলোয়ারটা বনবনের গলায় ঠেকিয়ে ধরেছে সে।

'আল্লার ইচ্ছায় এফেন্ডি তাহলে জেগে উঠেছে?' আবার গোলমেলে

হাসির শব্দ করল লোকটা।
'ছেড়ে দে ওকে।' রানা গর্জে উঠল।
'যদি না ছাড়ি?'
'তোর মালিক কাঁচা খাবে, আমি যদি নাও খাই।'
লোকটা একদলা থুথু ছুঁড়ে ফেলল রানার দিকে, 'তাই নাকি এফেন্ডি? ভয় দেখাচ্ছ আমাকে?'
'হ্যাঁ। তোর পয়গম্বর নিজের কাজে ওকে আটকে রেখেছে। ওর গায়ে আঁচড় লাগলে—'
রানার কথা শেষ হবার আগেই বনবনকে টেনে দরজার কাছে নিয়ে গেল গার্ডটা। তারপর রানার দিকে সজোরে ঠেলে দিয়ে লাফিয়ে পড়ল সে বাইরে। বুক থেকে বনবনকে সরাবার আগেই দরজা বন্ধ হয়ে যেতে দেখল রানা। বাইরে থেকে গালাগালি আসছে ঝড়ের বেগে। সময় এলে রানাকে দেখে নেবে বলে শাসাচ্ছে লোকটা।
শক্ত করে ধরে রাখল বনবনকে বুকের সাথে রানা। ঠাণ্ডা ঘামে ভিজে উঠেছে বনবনের সারা গা। রানাকে বেষ্টন করে এমন ভাবে ধরে রেখেছে যেন জীবন ভর ছাড়ার ইচ্ছা নেই ওকে, 'কি হবে, রানা? ও তো তোমাকে ছাড়বে না। খুন করার ছুতো খুঁজবে এরপর থেকে...'
বনবনকে বসিয়ে দিয়ে পাশেই বসে পড়ল রানা। বনবন রানার একটা হাঁটু দু'হাতে আঁকড়ে ধরে মাথা নামিয়ে কেঁদে ফেলল হঠাৎ। মাথা নিচু করে বনবনের গালে গাল ঠেকিয়ে ফিস্‌ফিস্ করে বলল রানা, 'কেঁদে ভাসালেও কোন লাভ নেই, বনবন। আমার ওপর ভরসা রাখো। এই লোকটাই একমাত্র গার্ড?'
'হ্যাঁ।'
'অন্য লোকগুলো কোথায়—তারা কারা?'
'আমি ইংরেজীতে কথা বলতে শুনেছি পরশুদিন, সম্ভবত। কখন তা মনে নেই। লোকটা কাকে যেন বলছিল ট্র্যান্সপোর্টে কি সব গোলমাল হয়ে গেছে। দেরি হবে। কত দেরি হবে তা বলতে শুনিনি।' বনবন চোখের পানি মুছল রানার শার্টে, 'ও তো তোমাকে খুন করবে যেমন করে পারে, রানা। আমি জানি। ও শুধু আমাকে চায়...'
'সব ঠিক হয়ে যাবে।' মৃদু গলায় বলল রানা।
কিন্তু এখন তা আর মনে করে না রানা।

দুই বাহু দিয়ে রানার কোমর জড়িয়ে ধরে ঊরুর উপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে বনবন।
মিউনিকের শিক্ষিতা গর্বিত যুবতীটির সাথে কোন সম্পর্ক নেই যেন এই বনবনের। এই বিপদে জড়িয়ে পড়ার ব্যাপারে ওর কোন দোষ নেই। দায়ী খানিকটা রানা নিজেই।
সঙ্গে কোন পুরুষ থাকলে দুশ্চিন্তা থাকে না। একসাথে কাজ করা যায়।

সঙ্গী যদি বিপদে পড়ে অ্যাসাইনমেন্টের স্বার্থে তাকে বিপদে ফেলেই এগিয়ে যাওয়া চলে। কিন্তু বনবনকে একথা বলা যায় না ব্যাখ্যা করে।

ঘরটা অসম্ভব ঠাণ্ডা। বনবন দুঃস্বপ্নের ভিতর কখনও আঁতকে উঠছে কখনও শিউরে উঠছে।

ডনফিলকে অন্য কোন রুট দিয়ে মিউনিক থেকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে বলে অনুমান করল রানা। কোথায় যে এখন রেখেছে ওরা তাকে তা আন্দাজ করে লাভ নেই। চারদিকের মরুভূমিটার বিস্তার শত শত মাইল হওয়াও বিচিত্র নয়। রানা যদি পালাবারও চেষ্টা করে তাতেও ফলোদয়ের কোন আশা আছে কিনা বোঝা মুশকিল। উত্তপ্ত ধু ধু মরুভূমির উপর লক্ষ্যহীন হাঁটতে হাঁটতে ক্ষুৎ-পিপাসায় ঢলে পড়ে মারা যাওয়ার কষ্টের চেয়ে এখানে আটকা পড়ে মরে যাওয়ার কষ্ট অপেক্ষাকৃত কম বলে মনে করল রানা।

সকালবেলা আর্ত চিৎকার করে ধড়মড় করে উঠে বসল বনবন রানাকে ছেড়ে দিয়ে। পিছনে সরে গেল খানিকটা সাথে সাথে। তারপর নিজের ভুল বুঝতে পেরে বলে উঠল, 'কিছু মনে কোরো না—আমি যেন…'

'সব ঠিক আছে, বনবন। ভয় পেয়ো না।'

সকালের আবছা আলো দরজার ফাঁক দিয়ে ঢুকছে ঘরে। বনবন মাথার চুল জড়ো করে খোঁপা মত করার ব্যর্থ চেষ্টা করছে। রানার দিকে তাকাল ও, 'তুমি জানো, রানা? ওরা আমাকে কেন এনেছে এখানে বলতে পারো?'

'তোমার বাবাকে সহযোগিতা করতে বাধ্য করতে। তোমার বিপদের ভয় দেখিয়ে।'

চিন্তা করার চেষ্টা করল বনবন, 'তাহলে আমরা এখানে কেন? বাবার সাথে থাকবার কথা সেক্ষেত্রে আমাদের?'

'জানি না। তুমি ওদের একজনকে বলতে শুনেছ ট্র্যান্সপোর্টে গোলমাল হয়েছে কিছু।'

'হ্যাঁ, কিন্তু…'

'তাহলে শুধু ধৈর্য ধরে থাকতে হবে আমাদের।'

করে দেখানোর চেয়ে উপদেশ দেয়া অনেক সহজ বলে মনে হলো রানার। সকাল হবার একঘণ্টা পর দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল গার্ড সতর্ক পায়ে। হাতে দুটো অ্যালুমিনিয়ামের বাটি, খেজুর আর পানি। রানা খোলা দরজা দিয়ে বাইরেটা দেখার চেষ্টা করল। কিন্তু ঘরে অন্ধকারের পর সূর্যের আলো চোখ ঝলসে দিচ্ছে। খেজুর গাছগুলো চোখে পড়ল। ডুমুর গাছও কয়েকটা আশপাশে। মাটির দেয়ালের এদিকে গাছগুলো। ওদিকে ক্রমশ উঁচু হয়ে দিগন্তে মিলিয়ে গেছে বালি। অদূরে মাটির ঘরের দেয়াল পাশাপাশি বেশ ক'টা। ছোট এলাকাটা কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা।

'তোর নাম কি, এই?' রানা জানতে চাইল গার্ডের দিকে ফিরে।

'আল্লার নামে নাম আমার। খেদমতগার আল্লার।'

'শেষ পয়গম্বর কে তোদের?' দ্বিতীয় পয়গম্বর সম্পর্কে পরিষ্কার হতে চায় রানা।

'সবাই জানে।' আরব গার্ড দাঁত বের করল, 'হযরত মহম্মদের পর আর একজন পয়গম্বর দুনিয়ায় তশরিফ এনেছেন।'

'কোথায় তোদের সেই আর একজন পয়গম্বর?'

'খাক হয়ে যাবে, এফেন্ডি তার সামনে দাঁড়ালে। তাঁকে দেখলে চোখ অন্ধ হয়ে যাবে তোমার। কুকুর বিড়ালের মত বেঁচে থাকবে তুমি।' গার্ডটা হঠাৎ বিদ্যুৎবেগে মোচড় খেয়ে তলোয়ারটা কোমরের খাপ্ থেকে টেনে নিয়ে রানার পেটের দিকে এগিয়ে হুমকি দেয় আক্রমণ করার। অভ্যাসবশত পিছিয়ে আসে রানা। দাঁত বের করে আবার গোলমেলে হাসি হাসে লোকটা, 'সবাই পেচ্ছাব করে ফেলে ভয়ে।' বনবনের দিকে ফিরল সে, 'গত রাতে চুটিয়ে মজা লুটেছ তাই না, ছুঁড়ি?' রানার দিকে ফিরল সে আবার, 'সময় হয়ে আসছে তোমার, এফেন্ডি।'

রানা বলে উঠল, 'তার মানে তোর সাথীরা চলে গেছে?'

লোকটা খিক খিক করে হাসল, 'না না, এফেন্ডি। হাজার হাজার সাথী আমার,'—লোকটা হঠাৎ বদ্ধ উন্মাদের মত তলোয়ারটা মাথার উপর উঁচিয়ে অদ্ভুত ভাবে পা ঠুকতে লাগল মেঝেতে। প্রথমে রানা বুঝতেই পারল না লোকটা নাচছে। তারপর আশ্চর্য সব শব্দ বেরুতে লাগল লোকটার গলা থেকে। গান গাইছে বলে ধরে নিল রানা। পা ঠুকতে ঠুকতে হঠাৎ বনবনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল সে। উদ্ভট গান তখনও থামেনি। আরও জোরে, আরও উৎসাহে বিলম্বিত উচ্চারণে গাইতে গাইতে তলোয়ার গলায় ঠেকিয়ে বনবনকে উঠে দাঁড়াতে বাধ্য করল সে।

ব্যাপারটা ঘটল চোখের পলকে। লোকটা বনবনকে দাঁড় করিয়েই কুৎসিত একটা ভঙ্গি করল দেহ ঝাঁকিয়ে। তারপরই বনবনকে ঠেলে দিয়ে এক লাফে দরজার বাইরে গিয়ে পড়ল রানাকে উঠে দাঁড়াতে দেখে।

'লেগেছে কোথাও?' দরজাটা বন্ধ হয়ে যেতে জিজ্ঞেস করল রানা।

'না-না! লোকটা…লোকটা…'

'হ্যাশিস টেনে নেশা করেছে কুকুরটা।'

বনবন মরিয়া হয়ে উঠেছে, 'আমরা কি পালাবার চেষ্টা করতে পারি না? রানা, এভাবে এখানে আমি মরে যাব। এবার ইচ্ছা করলে চেষ্টা করতে…'

'তোমার বাবার কথা ভুলে গেলে বনবন? ওরা আমাদেরকে তার কাছেই নিয়ে যাবে।'

'ওহ্! এত বড় রিস্ক নেয়াটা…'

'আমি সেজন্যেই এসেছি, বনবন। এসো খেয়ে নিই।'

মাথা নাড়ল বনবন, 'আমি খেতে পারব না। আমি মরে যাব। এখানে কি দিনের পর দিন এভাবে থাকা যায়? কোন ডিসেন্সি নেই, কোন প্রাইভেসি নেই—খাঁচায় ভরা দুটো জানোয়ারের মত…'

'জানোয়ারগুলো বাইরে, বনবন। খাও।'

উত্তাপ উত্তরোত্তর বাড়তে লাগল সূর্য মাথার উপর ওঠার সাথে সাথে।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে নিঃশ্বাস ফেলতে অসুবিধে হতে লাগল ওদের। রানা বনবনকে চিৎ করে শুইয়ে দিয়ে বেশি নড়াচড়া করতে নিষেধ করল। বেঁচে থাকতে হবে। এটাই এখন একমাত্র সংগ্রাম বুঝতে পেরেছে রানা।

ওর মনে হলো ড্যান্সারদের অর্গানাইজেশনে কোথাও বিপত্তি ঘটেছে। বলা যায় না কিছুই, ওরা হয়তো ইচ্ছা করেই ভুলে বসেছে মরুভূমির এই বন্দীখানার কথা। আশঙ্কাটা একসময়ে জাগল বনবনের মাথায়। উঠে দাঁড়িয়ে দরজার সামনে ক্ষুদ্র ফুটোটা দিয়ে বাইরে তাকাবার চেষ্টা করল ও। কিছু দেখতে না পেয়ে ফুটোটায় কান লাগিয়ে শব্দ শোনার চেষ্টা করল। অনেকক্ষণ কান পেতে থাকার পর রানার দিকে মুখ করে প্রায় অন্ধকারে বলল, 'কেউ নেই বাইরে। কোনও শব্দ নেই। ফেলে পালিয়েছে ওরা আমাদেরকে, রানা।'

বনবনকে না নিয়ে গার্ডরা যাবে না বলে ধারণা হলো রানার। কিন্তু বনবনের দুশ্চিন্তা বাড়বে বলে কথাটা বলল না ও। দরজার কাছে বনবনের সাথে যোগ দিল ও। না, বাইরে কোন শব্দ হচ্ছে না। রানা বলল, 'লোকটা হয়তো ঘুমুচ্ছে।'

'তাহলে বেরুবার চেষ্টা করতে পারি না আমরা?' আশায় চোখ বড় বড় হয়ে উঠল বনবনের।

'জানি না পারি কিনা। চেষ্টা করাটা বড় রিস্ক হবে, বনবন। যদি ব্যর্থ হই তাহলে আমাকে খুন করার অজুহাত পেয়ে যাবে ও। আর সফল হলে তোমার বাবাকে আর কোন দিন পাব না।'

'কিন্তু এখানে এভাবে আটকা পড়ে থাকলেও বাবার দেখা পাব না আমরা।'

বনবন ঠিক বলছে বলে মেনে নেবার চেষ্টা করল রানা। চিন্তা করল ও। পালাবার উপায় একটা করা দরকার এবার। সিদ্ধান্ত নিল রানা।

দেয়ালগুলো পরীক্ষা করতে লেগে গেল আবার রানা। এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে হাতড়াল ও। কোনও লোহার গজাল গাঁথা থাকলে মাটির দেয়াল ছিদ্র করার একটা চেষ্টা করা যায়। আধ ঘণ্টা অক্লান্ত চেষ্টা করেও সেরকম কিছু হাতে ঠেকল না রানার। আরও আধ ঘণ্টা পরিশ্রম করল বেল্টের বাকল দিয়ে দেয়ালের গায়ে ঘা মেরে মেরে। কিন্তু দেয়ালের এক ইঞ্চি জায়গাও পাতলা বলে মনে হলো না স্থূল শব্দ শুনে।

বাইরে নিঃশ্বাস আটকে গিয়ে মরে পড়ে আছে পৃথিবী।

রাতে খুব দুর্বল মনে হলো নিজেকে রানার। খেজুর যা দিয়েছিল তাতে পাঁচ বছরের একটা বাচ্চারও পেট ভরবার কথা নয়। দু'জনে মিলে খেয়েছে তাই। পানিও ছটাকখানেক আছে আর। আরও দুটো দিন এভাবে কাটলে বেঁচে থাকার মত শক্তি অবশিষ্ট থাকবে কিনা সন্দেহ হলো রানার।

গভীর রাতে অসহ্য ঠাণ্ডায় ঘুম ভেঙে গেল বনবনের, 'রানা?'

'ঘুমোবার চেষ্টা করো, বনবন। না ঘুমুলে আরও দুর্বল হয়ে পড়বে তুমি।' রানা ওর মাথায় হাত রাখল একটা।

'আমরা মরব, রানা। তুমি এমন শান্ত হয়ে থাকছ কিভাবে? তোমার কি এতই সাহস মনে?'

'তোমার মতই ভয় হচ্ছে আমার, বনবন।'

'না, তোমার সাহস খুব বেশি। আচ্ছা, তুমি না থাকলে আমার কি হত বলো দেখি? ওহ্, চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পাগল হয়ে মরে যেতাম তাহলে আমি।' রানার উরুতে তুলে দিল বনবন মাথাটা, 'তোমার মত লোক আগে কখনও দেখিনি আমি, জানো?' ফিস্‌ফিস্ করে কথা বলে চলেছে ও, 'রানা, তোমায় কেন যেন খুব নিষ্ঠুর মনে হয়। কিন্তু তুমি কেমন করে এত শান্ত হতে পারো জানি না। তোমার মনটা বড় ভাল, রানা! তুমি আমার ভুল ভেঙে দিয়েছ—আমি ভেবেই দেখিনি তোমার কথা শোনার আগে যে বাবা দোষী নাও হতে পারে…রানা! আমি বুঝতে পারছি কেন এই বিপদে পড়েছি আমি। আমার অপরাধের শাস্তি পাচ্ছি আমি…'

'তুমি ছেলেমানুষের মত নিজেকে কষ্ট দিচ্ছ, বনবন।'

'তাই ভাব বুঝি তুমি আমাকে? জ্বী না, আমি এখন বড় হয়েছি…'

রানা ওকে খুশি করার জন্যে ঠাট্টা করে বলল, 'সত্যি?'

'প্রমাণ চাও?' কথাটা বলেই রানার উরুতে মুখ চেপে ধরে লজ্জায় খানিকক্ষণ চুপ করে থাকল বনবন। তারপর বলল, 'আমি জানি মৃত্যু আসছে আমাদের। ওরা কোন সমস্যায় পড়ে আমাদের কথা ভুলে গেছে। ওদের তো কোন দুশ্চিন্তা হবার কথা নয় আমাদের কি হবে সে-কথা ভেবে। তৃষ্ণায় আর গরমে এখানে ধুঁকে ধুঁকে মরব আমরা। কি যে হবে…' বনবন হঠাৎ একটু পর বলল, 'খুব বেশি সময় নেই আমাদের, রানা।' মুখ তুলে ধরল বনবন রানার দিকে।

চুমো খেল দু'হাত দিয়ে বনবনের ভরাট মুখটা ধরে রানা।

রানা হঠাৎ খুশি হয়ে উঠল, বাইরে যেন গলার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। একটু পরেই বোঝা গেল, ওটা মনের ভুল।

সকালে কেউ এল না ঘরে। ওদের আর পানিও নেই খাবার। নিস্তব্ধতা চিরকালের জন্যে উড়ে এসে জুড়ে বসেছে যেন।

বনবন যেন ঠিকই বলেছিল। ওদেরকে ফেলে গেছে সবাই।

দুপুরের দিকে টেকা মুশকিল হয়ে উঠল আবার অসম্ভব গরমে। বেঁচে থাকার কোন উপায় দেখতে না পেয়ে ক্রমশ নিরাশা দানা বাঁধছে রানার মনে। বিকেলের দিকে মরিয়া হয়ে উঠে দাঁড়াল ও বেল্টটা হাতে নিয়ে।

ঘণ্টা দেড়েক বেল্টের বাকল দিয়ে অক্লান্ত ভাবে খুঁচিয়ে ইঞ্চি ছয়েক গর্ত করল রানা দেয়ালে। কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকার ক্ষমতা শেষ হয়ে গেছে রানার। বনবন চেষ্টা করল এবার ঘণ্টাখানেকের বেশি পারল না ও। দু'তিন ইঞ্চি

যোগ হলো আরও। কিন্তু পরীক্ষা করে রানা বুঝল অর্ধেকের অর্ধেকও খুঁড়তে পারেনি ওরা।

সময় কাটতে লাগল ওদেরকে স্পর্শ না করে। ঘুম এল না। আচ্ছন্নতার মধ্যে জেগে জেগে উঠল দু'জনেই বারবার।

তিন দিনের দিন সকালবেলাও বাইরে কোন শব্দ নেই। শরীর দুর্বল হয়ে পড়েছে। বমি বমি লাগছে বনবনের। প্রচণ্ড খিদের জন্যে হচ্ছে অমন। গলা শুকিয়ে মরুভূমি হয়ে উঠেছে রানার। লালাও নেই মুখের ভিতর। কেমন যেন অস্বস্তি আর ভয় লাগল রানার বনবনের দিকে তাকাতে। আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল ও দেয়াল ধরে। বেল্টের বাকল দিয়ে কাজ শুরু করে দিল ও। মনটাকে বিশ্রাম না দিলে পাগল হয়ে যাবে ও। কাজ করা দরকার।

বনবন একবার সাহায্য করতে চাইল ওকে। কিন্তু রাজি হলো না রানা। আগামী সকাল পর্যন্ত এমনিতেই ও বাঁচবে কিনা সন্দেহ হলো রানার।

দুপুরের পর ঘামে ভেজা দেহটা মেঝেতে এলিয়ে দিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে হঠাৎ গন্ধ পেল রানা মশলার। মাথা ঘুরিয়ে তাকাল বনবনের দিকে। চোখ বুজে মড়ার মত পড়ে আছে। উঠে বসল রানা। কান পাতল মনোযোগ একত্রিত করে। সাথে সাথে কোন শব্দ কানে ঢুকল না। কাছে কোথাও কেউ রান্না করছে। গন্ধটা চিনতে ভুল হয়নি রানার।

খানিক পরই মানুষের গলা শুনতে পাওয়া গেল। ড্রামের উপর তাল ঠুকছে আর আজব সুরে গান ধরছে কেউ। লোকটা হঠাৎ বিলম্বিত সুরে গান গেয়ে ওঠে, তারপর থামে। অনেকক্ষণ আর কোন শব্দ নেই। অনেকক্ষণ পর আবার সেই সুর শোনা যায়। বাইরে কেউ যেন নাচছে আর গাইছে মনের উল্লাসে। নিঃসন্দেহ হলো রানা খানিক পরই। ফিরে এসেছে তাহলে গার্ডটা।

কিংবা লোকটা হয়তো আদৌ কোথাও যায়নি এখান থেকে।

হয়তো রানাকে নিষ্ঠুরভাবে জব্দ করার মতলবে সাড়াশব্দ না দিয়ে দুটো দিন কাটিয়েছে লোকটা।

'বনবন?' ফিসফিস করে ডাকল রানা।

চোখ মেলল বনবন, 'রানা?'

'শুনতে পাচ্ছ না? গার্ডটা বাইরে রয়েছে এখনও।'

উঠে বসল বনবন। উদ্‌গ্রীব হয়ে কান পাতল ও। তারপর বলল, 'আমি ভাবছিলাম স্বপ্ন দেখছি হয়তো।'

'কোথাও যায়নি ও।' শুকনো জিভ দিয়ে ঠোঁট ভেজাবার ব্যর্থ চেষ্টা করল রানা, 'বুঝতে পারছ, কেন? আমাকে দুর্বল করার জন্যে। মনের আনন্দে নাচছে গাইছে ও। এরপর আসবে ও তোমার জন্যে। আমাদের এখন একটা মাত্র উপায় আছে।'

'আমাদের বাঁচার কোনও উপায় নেই, রানা?' কাঁদ কাঁদ গলায় বলল বনবন।

'আছে। ভেঙে পোড়ো না, বনবন। উপায় আছে। ওকে মেরে ফেললে

উপায় হয়।'

'পারবে তুমি?'

'পারতেই হবে আমাকে।'

'কিন্তু তুমি যদি ব্যর্থ হও···' বনবন চুপ করে গেল রানার দিকে তাকিয়ে। বুঝতে পারল ও রানার চোখের দৃষ্টি। উঠে দাঁড়াল ও রানার পাশে। রানা ধরে ফেলল ওকে। রানার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে বনবন বলল, 'কি করাতে চাও আমাকে দিয়ে তুমি?'

'উৎসাহ দেবে তুমি ওকে, বনবন। তোমাকে নিয়ে যেন সম্পূর্ণ ব্যস্ত হয়ে ওঠে ও।'

'কতক্ষণ···কতদূর?'

'যতক্ষণ···দরকার।'

রানার চোখ থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে মাথা নিচু করে চুপ করে রইল বনবন। অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে রানা। তারপর বলল বনবন, 'অল রাইট, রানা। আমি পারব।'

'ডাকো ওকে।' রানা বলল, 'তা না হলে ক'ঘণ্টা ধরে নাচবে কে জানে। বেশি সময় নেই আমাদের। এখুনি ডাকো ওকে।' অস্ত্রের কথা ভাবতে শুরু করল রানা। হাসি পেল এতকিছুর মধ্যেও। জুতো আর বেল্ট ওর অস্ত্র। বেল্টটাই বেছে নেবে ঠিক করল রানা। বাকলটার ওজন কম নয়।

দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে বনবন। রানার ইঙ্গিত পেয়ে জোরে চেঁচিয়ে উঠল ও। গলার স্বরে আহ্বানের সুর পরিষ্কার হয়ে ফুটেছে। খানিক পর ইঙ্গিত পেয়ে থামল বনবন। কান পাতল রানা। ড্রামের শব্দ ··· বিলম্বিত গানের সুর অবিরাম শোনা যাচ্ছে। লোকটার গানে দ্বিতীয় পয়··· র গুণগান আছে বুঝতে পারল রানা।

বনবন আবার চেঁচিয়ে উঠে ডাকল লোকটাকে। দরজার গায়ে হেলান দিয়ে কোন রকমে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে ও। গান বাজনা থামবার কোনও লক্ষণ নেই।

'আর একবার।' রানা নিচু গলায় বলল।

বনবন আবার ডাকল, 'শুনছ না তুমি? প্লীজ খেতে দাও আমাকে, একটু পানি দাও এখানে এসে, তা না হলে মরে যাচ্ছি আমি···তুমি যা চাও সব পাবে···'

এবার ড্রামের শব্দ শোনা গেল না। খানিক পরই একটা জানোয়ারের ফোঁস ফোঁস নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পাওয়া গেল দরজার ঠিক বাইরেই। গার্ডটা হাঁপাচ্ছে। অকস্মাৎ আর্তনাদ করার মত করে চেঁচিয়ে উঠল লোকটা বিজয় উল্লাসে ফেটে পড়ে।

বেল্টটা হাতে জড়িয়ে নিয়ে দরজার পাশেই শুয়ে পড়ল রানা উপুড় হয়ে, একটা হাত আর দুটো পা যতদূর সম্ভব মেলে দিয়ে। বেল্ট জড়ানো হাতটা ঢেকে রাখল দেহ দিয়ে ও। বনবন সরে গিয়ে বসল এককোণে। ওকে খুব অল্প

বয়স্কা আর অসহায় দেখাচ্ছে। ভারী দরজাটা ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে উঠতে মাথা নেড়ে ইঙ্গিত করল ওকে রানা।

কয়েক মুহূর্ত কেটে গেল। দরজা খুলল না। নিস্তব্ধতা আবার বাসা বাঁধল। তারপর শোনা গেল লোকটার নিঃশ্বাস ফেলার শব্দ।

আরও খানিক পর হঠাৎ সবেগে দু'ফাঁক হয়ে গেল কবাট দুটো। সূর্যের উজ্জ্বল আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে গেল রানার। লোকটা লাফ মেরে ভেতরে ঢুকল বুঝতে পারল ও। তলোয়ারটা ঝকমক করে উঠল রানার চারপাশে। তারপর লাফ মেরে ঘরের মাঝখানে গিয়ে ঘোরাতে লাগল লোকটা তলোয়ার। উল্লাসে দিশেহারা হয়ে পড়ে আবোল তাবোল বকে চলেছে সে।

রানার দিকে তলোয়ারের কোপ মারার ইঙ্গিত করতে করতে প্রলাপ বকছে লোকটা, 'এফেন্ডি, খুব কি খিদে পেয়েছে? রক্তপান করবে, এফেন্ডি? নিজের রক্ত চাটিয়ে দেখাব তোমায়, এফেন্ডি···।'

অকস্মাৎ কিছু করার আর কোনও পথ নেই। বনবনের দায়িত্ব এখন সবচেয়ে বেশি। লোকটা ক্ষমতার দর্পে লাফালাফি শুরু করে দিয়েছে রানার বিপরীত কোণের কাছে, 'আমাকে হারিয়ে ফেলেছিলে, হাবিবি?' বনবনকে নিয়ে পড়েছে লোকটা, 'খিদেয় খুব কষ্ট পেয়েছ? সব মিটিয়ে দেব··· পেটের জ্বালা, যৌবন জ্বালা সব।'

বনবন বুঝতে পারল না কি করা দরকার ওর। দু'বার বলে উঠল ও দুর্বল গলায়, 'প্লীজ, প্লীজ।'

'তোমার ভাষা আমি বুঝি না, হাবিবি। কিন্তু তুমি আমার পাকা আপেল। দ্বিতীয় পয়গম্বরের কসম···'

'সেলিম আল-রশিদের কথা বলছ তুমি?' অস্পষ্ট দুর্বল গলায় জিজ্ঞেস করল রানা।

'তুমি শয়তানের দলে, তাই পয়গম্বরের নাম ধরলে বুদ্ধু। আমি মহান দ্বিতীয় পয়গম্বরের কথা বলছি। দুনিয়ায় আগুন জ্বালিয়ে দেবেন তিনি, যদি দুনিয়ার লোক তাঁকে মেনে না নেয়।' গার্ড বসে পড়ল বনবনের পাশে। খাবলা মেরে ধরল সে ঊর্ধ্বাংশের কাপড়।

বনবন চুপ করে বসে থাকতে পারল না, 'রানা—'

'বাধা দিয়ো না ওকে।'

খোলা রেখেছে দরজাটা গার্ড। বাইরে তাকাল রানা।

ড্যাগারটা বেঁটে তলোয়ারটা দাঁত দিয়ে ধরল। তারপর আকর্ষণ করল বনবনকে। তার গায়ের দুর্গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে ঘরের বাতাসে। গুঙিয়ে উঠল অস্ফুটে যেন বনবন। রানার নির্দেশ মত চোখ বুজে মড়ার মত পড়ে আছে ও। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করা চলবে না বুঝতে পারছে রানা।

'ভয় লাগছে না তোর, কুকুর? একা এ কাজ করার মত দুঃসাহস তোর হচ্ছে?'

'সঙ্গী সাথী সব চলে গেছে, এফেন্ডি। আজ রাতে এই বান্দাও চম্পট

দিচ্ছে। হাবিবি কাঁদছে কেন এমন গরমেও?'

'ভয় লাগছে ওর। খিদে পেয়েছে।'

'তোমার ভয় লাগছে না? খবরদার, এফেন্ডি। নড়বে না একটুও। তোমার দান পরে আসবে।'

চুপ করে গেল রানা। কিন্তু আর অপেক্ষা করার মানে হয় না। তৃষ্ণায় বুকের ছাতি ফেটে যাবার উপক্রম করছে। বনবনের দ্বারা এর বেশি আশা করাটা পাগলামি। হাত নাড়ার ক্ষমতাও নেই ওর আর। কোন রকম চালাকি খাটানোর উপায় নেই এখন। সরাসরি যুদ্ধ ঘোষণা করে মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে বাঁচার জন্য রানাকে।

লুকোবার চেষ্টাও করল না রানা। মন শক্ত করে নিল ও। জীবনে এই বোধ হয় প্রথম নিজের দৈহিক শক্তি সম্পর্কে অস্পষ্ট ধারণা নিয়ে লড়তে যাচ্ছে ও। বেল্টটার দুই প্রান্ত ধরে উঠে দাঁড়াল আস্তে আস্তে রানা।

রানা উঠে দাঁড়াতেই বনবনকে ছেড়ে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল লোকটা। দাঁতে ধরা তলোয়ারটা বাগিয়ে ধরে সবিস্ময়ে তাকিয়ে রইল সে একমুহূর্ত রানার দিকে। ওর উঠে দাঁড়াবার ক্ষমতা এখনও আছে দেখতে পেয়ে বিস্মিত হলো সে। তারপর হঠাৎ লাফিয়ে উঠে এক কোণ থেকে ঘরের অন্য এক কোণে চলে গেল লোকটা।

'সইতে পারলে না বুঝি, এফেন্ডি? হাবিবি তোমার বাবার একার সম্পত্তি নাকি! তাহলে হাবিবি দেখুক তোমাকে কি দাওয়াই দিই আমি।'

'বেশি কথা বলাটা তোর বদভ্যাস। তোর মুরোদ জানা আছে আমার।' উত্তেজিত করতে চাইল লোকটাকে রানা, 'সামনে আয়।'

বনবন অস্ফুট শব্দ করে উঠল। রানা তাকাল না। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে সব মিটে যাবে। ঘরের চারদিকে ঘুরছে লোকটা তলোয়ার ঘোরাতে ঘোরাতে। বেল্টের বাকলটা বাঁ হাতের মুঠোয় রানার। অপর প্রান্তটা ধরে রেখেছে ডান হাতে শক্ত করে।

তলোয়ার চালাতেই গরম বাতাস এসে লাগছে মুখে রানার। ঝাঁপিয়ে পড়ার লক্ষণ নেই লোকটার মধ্যে। ভঙ্গি করছে মাঝেমধ্যে। কিন্তু রানা বুঝতে পারছে খুব বেশি রিস্ক নেবে না সে। কুড়ি পঁচিশবার হঠাৎ সামনে পা বাড়িয়ে তলোয়ার চালাবার চেষ্টা করেছে ইতোমধ্যে লোকটা রানার মুখ লক্ষ্য করে। কিন্তু রানা পিছিয়ে আসতে সামনে বাড়েনি আর। এদিকে এখনও কোনও আক্রমণের চেষ্টা করেনি রানা। লোকটার তাড়া খেয়ে পিছু হটে হটে অসংখ্যবার ঘরময় ঘুরছে শুধু ও। লোকটাকে অস্থির করে তোলা দরকার। তা না হলে রিস্ক নিয়ে ঝাঁপ দেবে না সে। বিরক্ত হয়ে নাগালের মধ্যে আসতেই হবে তাকে। রানা অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিল।

সময় বয়ে যাচ্ছে! হাঁপিয়ে উঠেছে রানা। দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে দৈহিক শক্তি। লোকটা দাঁত কিড়মিড় করে লাফ মারছে একই জায়গায়। তারপর আবার পা বাড়াচ্ছে। রানা মাঝেমধ্যেই উত্তেজিত করার চেষ্টা করছে তাকে,

'কাছে আয় ব্যাটা!'

এল লোকটা কাছে ঝাঁপিয়ে।

পিছিয়ে না গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। সুযোগ চিনতে একটুও দেরি হয়নি ওর। দেহের সবটুকু শক্তি দিয়ে সবেগে মোচড় খেল ওর গোটা দেহ। বাম দিকে সরে গেল ডান হাত আর বাঁ হাত। চোখের পলকে ঘটে গেল ব্যাপারটা। বেল্টের বাকল ছেড়ে দিল রানা বাঁ হাতের মুঠো থেকে। ডান হাতে বেল্টের অপর প্রান্ত মাথার উপর তুলে সজোরে চাবুকের মত মারল রানা।

অব্যর্থ লক্ষ্য। কিন্তু সাথে সাথে বুঝতে পারল না রানা বাকলটা লোকটার চোখে লেগেছে কিনা। পর মুহূর্তে লাল টকটকে হয়ে উঠল লোকটার বাঁ চোখ। মশা মারার মত একটা হাতের থাবা নিজের রক্তাক্ত চোখে মারল সে। গুঙিয়ে উঠল অব্যক্ত যন্ত্রণায়। বেল্টটার বাকল ধরে ফেলে বিদ্যুৎ বেগে সামনে বাড়ল রানা। লোকটার গলায় বেল্ট পেঁচিয়ে দিয়ে ঠেলে দেয়ালের গায়ে নিয়ে গেল। গায়ে গরম রক্ত লাগতে শিউরে উঠল ওর দেহ। গলায় চেপে বসেছে বেল্টটা। চোখ ছেড়ে লোমশ দুটো হাত রানার গলায় এসে ঠেকল। খামচে ধরল।

দেহের সর্বশক্তি দিয়ে বেল্টের দুই প্রান্ত ধরে দুদিকে টানছে রানা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বোধ হয় হার হলো ওর। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। আত্মরক্ষার কোনও চেষ্টা করার উপায় নেই। লোকটার লোমশ দুটো হাত লোহার আঙটার মত এঁটে বসেছে গলা জুড়ে।

'বন...'

বনবনের পুরো নামটাও উচ্চারণ করতে পারল না রানা। কিন্তু বনবন এগিয়ে এসেছে লোকটার পাশে। বেল্টের প্যাঁচ ঢিলে হয়ে যাবে আশঙ্কা করে ছাড়ছে না রানা প্রান্ত দুটো। হঠাৎ ঢিলে হলো একটু লোকটার হাত দুটো। রক্তাক্ত হয়ে গেছে গোটা মুখ তার। রানার বুকও ভেসে যাচ্ছে তাজা রক্তে। পাশ থেকে লোকটার মাথার চুল টেনে ধরেছিল বনবন। কিন্তু মেঝেতে পড়া তলোয়ারটা দেখতে পেয়ে ছেড়ে দিয়েছে সে চুল।

রানা বেল্ট না ছেড়েই দেয়ালের গায়ে ঠেসে ধরে রইল গার্ডটাকে। ওর গলা থেকে খসে পড়েছে হাত দুটো। নিঃসাড় ভাবে ঝুলছে দু'পাশে। লড়ার আর শক্তি নেই সম্ভবত তার। কিন্তু ভরসা করতে পারল না রানা তবু। আরও জোর দিয়ে বেল্ট টেনে ধরল ও। ঘড় ঘড় করে শব্দ করছিল খানিক আগে লোকটা, এখন তাও করছে না। বনবনকে পাশে দেখে ফিরে তাকাল। চালিয়ে দিয়েছে ততক্ষণে বনবন তলোয়ারটা লোকটার পেট বরাবর।

বনবন তলোয়ারটা বের করল একটানে। তারপর আবার সজোরে ঢুকিয়ে দিল বুক বরাবর। বের করল আবার। তারপর ফের ঢোকাল।

'থামো, বনবন...'

বনবন আবার তলোয়ার ঢোকাল।

'মরে গেছে, বনবন…' রানা চেঁচিয়ে উঠল।

কিন্তু উন্মাদিনীর মত একই কাণ্ড বারবার করে চলেছে বনবন। লোকটাকে মেঝের দিকে ঠেলে দিয়ে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে ফেলল রানা। চেঁচিয়ে উঠল বনবন।

'ছেড়ে দাও আমাকে, রানা। ওর শখ চিরদিনের জন্যে মিটিয়ে দিই আমি…'

তলোয়ারটা কেড়ে নিয়ে ফেলে দিল দূরে রানা। বনবনকে নিয়ে ধপ্ করে বসে পড়ল। দাঁড়াবার চেষ্টা করল একবার। পারল না। বনবন দু'হাঁটুতে মুখ গুঁজে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল। খোলা দরজার দিকে তাকিয়ে মুখ হাঁ করে হাঁপাতে লাগল রানা।

ওরা মুক্ত।

সাত

বনবন অসুস্থ বুঝতে পারল রানা। দেয়াল ধরে ধরে, কখনও বসে বসে, একটু একটু করে এগিয়ে গিয়ে পৌঁছেছে নিচু ডুমুর গাছটার নিচে। মাটির দেয়ালের ছায়া পড়েছে সেখানটায়। হাঁটুর উপর ভর দিয়ে দু'হাত তুলে লাফিয়ে লাফিয়ে ডাল ধরার চেষ্টা করছে ও। প্রচণ্ড খিদেয় মানুষ পাগল হয়ে যায় একথা আজ বিশ্বাস হলো রানার।

উঠে দাঁড়িয়ে পাথর ঘেরা কূয়াটার সামনে এসে দাঁড়াল রানা। রশিটা ডুবে গেছে নিচে। টেনে টেনে তুলল বালতিটা। আঁজলা ভরে পানি খেয়ে নিঃশ্বাস ফেলল ও। মরা মানুষের উপর নাকি রাগ করতে নেই। কিন্তু গার্ডটা ওদেরকে ইচ্ছে করেই দুর্গন্ধময় পুকুরের পানি খাইয়েছে জেনে গরম হয়ে উঠল মেজাজটা ওর। কূয়ার পানি ঠাণ্ডা আর মিষ্টি।

বালতিটা বনবনের সামনে নামিয়ে রেখে রানা বলল, 'আগে পানি খাও। কম করে খেয়ো।' দুই হাত একত্রিত করে করুণ চোখে তাকাল বনবন। বালতিটা ধরে তোলার শক্তিও নেই ওর। রানা পানি ঢেলে দিতে সশব্দে গিলে ফেলতে লাগল বনবন হাতের পানি।

বেশি পানি দিল না ওকে রানা। খালি পেটে সইবে না ওর।

জ্যাকেটে মুখ মুছে তাকাল বনবন, 'আমি কি করেছি ওর, রানা?'

'কিছু না। আমরা মুক্ত। ওসব কথা মাথা থেকে বের করে ফেলো।'

'কিন্তু আমি তলোয়ার চালিয়েছে, রানা! বারবার…'

'থামো বনবন! তোমার আগে আমিই গলায় বেল্ট পেঁচিয়ে শেষ করে ফেলেছিলাম ওকে। ওসব কথা বেশি ভাবতে শুরু করলে মাথাটা খারাপ করে ছাড়বে নিজের। সব ভুলে যাও।' বনবনের হাতটা ধরে টানল রানা, 'ওঠো। এবার খাবার খুঁজতে হবে।'

নিচু বাউন্ডারি ওয়ালের ভিতর ছয় সাতটা ঘর। কয়েকটা ছাদ ধসা। ঘরগুলোর পিছনে ডুমুর গাছের বাগান। পরিত্যক্ত বলেই মনে হলো রানার মরুদ্যানটাকে। গার্ডটার ঘর খুঁজে পেতে দেরি হলো না ওদের। ঘরটার চারপাশে ক্যাকটাস আর নাম না জানা কাঁটা গাছ জন্মেছে। ভিতরে বিছানা পাতা মাটির উপর। একটা লোহার ট্রাঙ্ক। তালা ঝুলছে গায়ে। কাঠের একটা থাক দেয়ালে। কয়েকটা টিন সাজানো সারি সারি। সেগুলো খুলে শুকনো খাবার পাওয়া গেল বেশ কিছু। একটা হাতুড়ি দেখতে পেয়ে হাতে তুলে নিল রানা। বনবনকে বসিয়ে রেখে ট্রাঙ্কের তালাটা ভাঙল ও।

এরকম একটা জিনিস পাওয়া যাবে তা আশা করেনি রানা। ট্রাঙ্কের ভিতর একটা রাশান-মেড অটোমেটিক রাইফেল আর এক ডজন ক্লিপ ছাড়া আর কিছুই নেই।

গার্ডের ঘর থেকে বেরিয়ে সামনের দিকটা ঘুরে দেখল রানা। কোন যানবাহন থাকলে সামনের দিকেই থাকবে। কিন্তু আশা করেনি রানা কিছু পাবে বলে। পেলও না। একটা উট পর্যন্ত চোখে পড়ল না। সামনে ধু ধু মরুভূমির কোথাও কোনও জনপ্রাণীর চিহ্নমাত্র নেই। চিকচিক করছে উত্তপ্ত বালি দিগন্তরেখা পর্যন্ত। বাগানের পিছনে একটা ছোট্ট পুকুর দেখা গেল। রানা বলল, 'তুমি আগে যাও।'

'কাপড়?'

'সব পরেই স্নান করো। এগুলোও ধোয়া দরকার।'

বনবন পুকুরে নেমে যেতে ফিরে এল রানা ওদের বন্দীখানা ঘরটায়।

দাঁত বের করে পড়ে আছে ড্যাঙ্গারটা রক্তের উপর। বেশিক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে না থেকে লোকটার গায়ের শার্ট খুলে নিয়ে সরে এল রানা। পকেট হাতড়ে ছোট একটা চেন পাওয়া গেল। চেনটা সোনার। মাঝখানে ভারী একটা মেডেল। সেটাও সোনার। নখ দিয়ে কিনারায় চাপ দিতেই খুলে গেল সেটা।

মেডেলটা খুলে যেতে চোখ পড়ল রানার ভিতরে। ওর স্মৃতি এক লাফে গিয়ে পৌঁছুল দূর মিউনিকে। বাইজেনটাইন মোজাইকের পোস্টকার্ডের যে নকশাটা দেখেছিল ও সেই একই নকশা মেডেলের ভিতরের এক পিঠে খোদাই করা।

'রানা?'

শান্ত গলা বনবনের। কাক-স্নান করে পুকুর থেকে উঠে এসেছে ও।

পকেটে মেডেলটা ভরে বেরিয়ে এল বাইরে রানা, 'আমি স্নান করে নিই।'

'এর নাম অ্যাডভেঞ্চার। এরই নাম জীবন।' ফিস ফিস করে বলল রানা সীমাহীন শূন্যের নক্ষত্রগুলোর দিকে চোখ রেখে। কোথাও ধাক্কা খেল না ওর গলার শব্দ। বনবনের কাঁধে হাত ওর। সামনে দিগন্ত বিস্তৃত পৃথিবী। ওদের পৃথিবীতে তৃতীয় কোন মানব নেই ভাবতে ভাল লাগল রানার। চাঁদটা

মরুভূমির উপর ঠাণ্ডা আর মহাশূন্যে স্থির। দু'জন চলেছে ওরা হাত ধরাধরি করে। কথা নেই অনেকক্ষণ কারও মুখে। একটা পোঁটলায় যা পেরেছে বেঁধে নিয়েছে রানা। বনবন নিজের পিঠে জোর করে ঝুলিয়ে নিয়েছে সেটা। রানার কাঁধে রাইফেলটা। চারদিকে চন্দ্রালোকিত সীমাহীন বালি।

'কতদূর আমাদের যেতে হবে, রানা?'

'বলতে পারছি না এখনও!'

চুপ করে গেল বনবন। তারপর আবার মুখ খুলল, 'আমি জানি তুমি ভেবে ভয় পাচ্ছ হয়তো প্রতিটি পদক্ষেপের সাথে দূরে চলে যাচ্ছি আমরা বাবার কাছ থেকে।'

'করার কিছু নেই, বনবন। এখন শুধু নিজেদের কথা ভাবতে হবে।'

পাথরের স্তূপ দেখা যাচ্ছে সামনে। রানার হাত ছেড়ে দিয়ে বসে পড়ল বনবন, 'আর পারছি না, রানা।'

কথা না বলে একটা পাথরের গায়ে হেলান দিল রানা। যতদূর দৃষ্টি চলে চাঁদের আলোয়, সেই শেষ সীমা পর্যন্ত, কোথাও প্রাণের চিহ্ন নেই। কোথাও মরুদ্যানও পড়ছে না দৃষ্টি সীমায়। বেশ কিছুক্ষণ বসে রইল ওরা চুপচাপ।

'এখানে মরবার ইচ্ছা নেই আমার। ওঠো, বনবন।'

'কি লাভ? ইচ্ছা তো আমারও নেই এখানে মরবার। কিন্তু মরতেই হবে...'

'স্বইচ্ছায় না মরলে মরব না। চলো, ওঠো।'

ওরা হাঁটল। বিশ্রাম নিল। আবার হাঁটল। বনবনের পা আর চলতে চায় না। শেষবেলায় সাহায্য করতে হলো রানাকে। ওর কোমর জড়িয়ে ধরে হাঁটিয়ে নিয়ে চলল রানা। চাঁদ ঝুঁকে পড়েছে নিজস্ব কক্ষপথ ধরে পশ্চিম দিকে। আকাশের উপর মিলকি-ওয়েকে দেখাচ্ছে সিলভারের ফিতের মত।

চাঁদ যখন প্রায় ডুবু ডুবু এমন সময় কিছু যেন চোখে ধরা পড়ল পলকের জন্যে।

জিনিসটা কোন ছায়া নয় বা বালিতে চলমান কিছু নয়। মাত্র এক পলকের জন্যে ঝলক দিয়ে অদৃশ্য হয়েছে দূরের বালির ঢিবির ওদিকে। সত্যি দেখছে, না চোখের ভুল বুঝতে পারল না রানা। বনবনকে তাই কিছু বলল না। লক্ষ্য রেখে অপেক্ষা করতে লাগল ও।

আবার যখন দেখা গেল তখনও পরিষ্কার বুঝতে পারল না রানা ওটা মানুষ না জানোয়ার। তৃতীয় বারে প্রশ্ন দেখা দিল একটা। কোন ধাতু বা কাঁচে প্রতিফলিত হচ্ছে চাঁদের আলো। নাইট গ্লাস দিয়ে কেউ কি নজর রাখছে ওদের দিকে?

ইজিপশিয়ান মিলিটারি আর্মি পেট্রল হতে পারে। অবশ্য দেশটা যদি মিশর হয়। তাই যদি হয় তাহলে সৌভাগ্যই বলতে হবে। কিন্তু ড্যান্সাররা ফিরে আসছে না তো? ওদেরকে দেখতে না পেলেও শুকনো বালিতে ওদের পদচিহ্ন ধরে আগামী দুপুরের মধ্যেই ধরে ফেলবে ড্যান্সাররা।

বনবনকে কিছু শোনাল না রানা। হেঁটেই চলল ওরা। মিনিট কুড়ি পর

থামল আবার বিশ্রামের জন্যে। মরুভূমির কোনও পরিবর্তন নেই। রাত্রির এতগুলো ঘন্টায় ওরা কোনও জনপ্রাণী, ঘর বাড়ি, রাস্তা দেখেনি।

পরবর্তী বালির টিলায় উঠে আবার লক্ষ্য করার চেষ্টা করল রানা। কয়েক মুহূর্ত পর পরবর্তী টিলার উপর অস্পষ্ট একটা ছায়া দেখা গেল। তারপর আবার প্রতিফলিত হলো। তারপর সব মিলিয়ে গেল আগের মতই।

'বনবন, তোমাকে এখানে রেখে যাচ্ছি আমি ক'মিনিটের জন্যে। এখান থেকে নড়বে না এক পা। শুয়ে পড়ে ঘুমিয়ে যাবার ভান করো তুমি।' বলল রানা হঠাৎ।

'রানা? কি হয়েছে, রানা?' হঠাৎ অস্বাভাবিক প্রস্তাব শুনে চমকে উঠল বনবন।

'আস্তে। আস্তে কথা বলো, বনবন। আমাদের ওপর নজর রেখেছে...'

'কারা? ড্যান্সার...?'

'আস্তে বলো। কথা বলার সময় নেই। যা বলছি করো লক্ষ্মী মেয়ের মত।'

কাঁধ থেকে রাইফেল নামিয়ে হাতে নিতে নিতে ছুটল রানা পরবর্তী বালির টিলাটার দিকে।

'রানা!' অসহায় গলায় ডেকে উঠল বনবন।

দাঁড়াল না রানা। ছুটতে ছুটতে পরবর্তী টিলাটার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে লাগল ও। ছেড়ে আসা টিলাটার দিকে তাকিয়ে বনবনকে দেখতে পেয়ে হাত নেড়ে আশ্বাস দিল রানা। কথামত শুয়ে পড়েছে বনবন।

টিলাটাকে ঘিরে হাঁটতে হাঁটতে একটা উঁচু জায়গা বেছে নিল রানা। রাইফেল বুকে নিয়ে ঢালু বালির উপর শুয়ে পড়ল ও।

অনেকক্ষণ পর গোটা ছায়াটা দেখা গেল। টিলার উপর থেকে নেমে আসছে দ্রুত। চোখে নাইট গ্লাস আঁটা লোকটার। তার মানে ওদেরকে দেখেনি এখনও। লোকটাকে একাই দেখল রানা সমতল বালিতে নেমে এসেছে সে। এগিয়ে আসছে রানার টিলা দিকে।

টিলাটার উপর উঠে পড়ল লোকটা। নড়ল না রানা। দাঁড়িয়ে পড়ল লোকটা। পরবর্তী টিলার উপর শায়িত বনবনের দেহ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল খানিকক্ষণ। কোনও নড়াচড়া নেই দেখে নামতে শুরু করল লোকটা।

হাতে একটা রাইফেল ঝুলছে। ভিজে আঙুলের মাথা থেকে পানি পড়ার মত বালি ঝরে পড়ছে নলটা থেকে। মাথায় রুমাল বাঁধা লোকটার। গায়ে ওভারকোট।

টিলা থেকে নামতে শুরু করেছে লোকটা। পাশ থেকে উঠে দাঁড়িয়ে টিলার মাথায় এসে দাঁড়াল রানা। তারপর উপর থেকে লাফ দিয়ে পড়ল লোকটার ঘাড় লক্ষ্য করে।

বালি বিশ্বাসঘাতকতা করল ওর সাথে।

লাফ দেবার সময় শুকনো বালিতে পা পিছলে গেল রানার। লোকটার হাঁটুর উপর গিয়ে ধাক্কা খেল ওর দেহটা। গড়িয়ে পড়ল দু'জনেই। গড়াতে

গড়াতে জাপটে ধরে ফেলল রানা লোকটাকে। নিচে এসে থেমে গেল দু'জনের দেহ। গলা টিপে ধরে লোকটার বুকের উপর চেপে বসল রানা।

যন্ত্রণায় অস্ফুট আওয়াজ করে উঠেই লোকটা বিচিত্র এক ধরনের শব্দ করে কিছু বলতে চাইল।

হাসছে নাকি লোকটা?

একটু ঢিলে করল হাত দুটো রানা।

'রানা? মাসুদ রানা।'

আরও খানিক ঢিলে করল রানা হাত দুটো, 'মাথা ঘোরাও তোমার।'

লোকটা চাঁদের দিকে মুখ করল। যন্ত্রণার মধ্যেও অতি কষ্টে হাসছে সে।

মেজর আত্হার হোসেনকে চিনতে পারল রানা।

আট

নতুন গজানো খোঁচা খোঁচা দাড়ি গালে আর পুরানো হয়ে যাওয়া ময়লা পোশাক পরনে আত্হারের। পরিবর্তন ওর এর বেশি দেখল না রানা। মুখটা হাসছে। কিন্তু অর্থহীন হাসি। কায়িক পরিশ্রমের ক্লান্তির শেষ সীমায় পৌঁছেছে ও।

'তোমাকে আশা করিনি। তুমি একা?'

'একদম একা। কিন্তু ইসরাইলের বন্ধুরা অপেক্ষা করছে।'

'ইসরাইলের? তোমার জন্যে ডেঞ্জারাস। আমার জন্যেও।'

'মাসুদ রানা ডেঞ্জারাসকে ডেঞ্জারাস বলে মনে করে এ কথা আমাকে দু'বার কেউ বললে আমি তার দাঁত ভেঙে দেব।' হাসল আত্হার সকৌতুকে।

'কিভাবে পেলে আমাদের খবর?'

'কায়রো ড্যান্সার প্যাভিলিয়নে তোমাকে কাবু করার পর খবর পাই আমি। কিন্তু লিসিলের মৃত্যুতে উন্মনা হয়ে পড়েছিলাম বলে দেরি করে ফেলি আমি। কিন্তু কৌশলে ইন্সপেক্টর জেনারেল হের বেলচাকে কাজে লাগাই আমি।'

'জেনারেল বেলচা সাহায্য করল তোমাকে?'

'আদায় করার অস্ত্র থাকা চাই—ইনফরমেশন। বিশ্বস্ত লোক নয় সে, কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু ওর বহু তথ্য আমি জানি। বাধ্য করলাম ওকে চাপ দিয়ে। খুব কাজে দিয়েছে লোকটা। একটা মালবাহী জাহাজে তোমাকে খুঁজে পাই আমরা। আলেকজান্দ্রিয়ার দিকে নোঙর করা শিপ। তারপর লরি করে ইসরাইল···বর্ডার অতিক্রম করো তুমি। ক'দিনের জন্যে হারিয়ে ফেলেছিলাম এরপর তোমাকে। সম্ভাব্য ড্রপ-পয়েন্টে খোঁজাখুঁজি করি। শেষ পর্যন্ত এদিকে আসি।'

'ইসরাইল গভর্নমেন্ট জানে এসব?'

'না।'

'কায়রো ড্যান্সারদের সাথে কোনও সম্পর্ক নেই ওদের?'

'না। কায়রো ড্যান্সারদের আস্তানা ইসরাইলে নয়, ইজিপ্টে। প্রেসিডেন্ট নাসের সেলিম আল-রশিদকে ইসলামের এবং মুসলিম জাহানের শত্রু বলে ঘোষণা করেছিলেন একবার। কিন্তু ইন্টেলিজেন্স তার কোন সন্ধান করতে পারেনি।'

ওদেরকে মাইলখানেক হাঁটিয়ে নিয়ে গেল আত্হার। ওর জীপে প্রয়োজনীয় সব জিনিসই মওজুদ দেখা গেল। বনবন কম্বল জড়িয়ে নিল গায়ে জীপে উঠেই। রানা আকাশের দিকে তাকাতে আত্হার বলে উঠল, 'সকাল হতে দেরি নেই। তেল আবিব থেকে পঁচাত্তর মাইল দূরে আমরা। আটটার মধ্যে পৌঁছুতে হবে। রাস্তার মাঝখানে আমার এক চেনা বেদুইনকে উঠিয়ে নেব একবার। কোথাও আর থামব না। অলরাইট?'

ড্রাইভিং সীটে বসল আত্হার।

সকালের আলো ফোটার সাথে সাথে দেখা গেল দূরে উঁচু উঁচু খেজুর গাছ আর মাটির দেয়াল। তারপর একটার পর একটা মরুদ্যান অতিক্রম করে চলল জীপ। ঘন ঘন মরুদ্যানের পর সাত-আট মাইলের মধ্যে পাওয়া গেল প্রথম গ্রামটি। নগ্ন ছেলেমেয়ে তরকারীর খোসা নিয়ে খেলা করছে। সারা গায়ে ময়লা। যুবতী মেয়েরা গোল হয়ে লাল বালিতে সেলাইয়ের কাজে ব্যস্ত। পুরুষরাও অদূরে বসেছে দল বেঁধে। জীপটা গিয়ে থামতেই যুবতীরা কিচির মিচির শব্দ করে মাটির ঘরের ভিতর হুড়মুড় করে গিয়ে ঢুকল। ছেলেগুলো যে যার জায়গায় দাঁড়িয়ে দেখছে জীপটা। পুরুষেরা দাঁড়াল জীপটাকে ঘিরে তিনজন ছাড়া সবাই প্রস্থান করল নিজেদের জায়গায়।

'সালাম।' একজন লোক বলল।

তিনজনকেই ভয়ঙ্কর বলে মনে হলো রানার। অতিরিক্ত লম্বা আর শক্তিশালী লোক এরা। গায়ের রঙ প্রায় লাল। ঢোলা জোব্বা পরনে। একজনের একটা চোখ নেই। সেটার পাতা বন্ধ। একটা চোখ হাসছে তার।

পরিচয় করিয়ে দিল আত্হার একচোখা লোকটার সাথে রানার, 'এই-ই হচ্ছে ইব্রাহিম বেন-হাকিম। ওর ছেলে আইয়ুব জেরুজালেম ইউনিভার্সিটির মেধাবী ছাত্র। বেদুইনরা লেখাপড়ার কোনও ধার ধারেনি এতদিন। ওর ছেলে সে হিসেবে একটা ব্যতিক্রম।'

বেন-হাকিমের একটা চোখ অকস্মাৎ জ্বলে উঠল। 'মেজর আত্হারের কথায় জান দিতে হলেও তৈরি আমরা। মেজর যেখানে পাঠাবে সেখানেই যেতে পারি। দ্বিতীয় পয়গম্বরের গর্দান কেটে আলাদা করে আনতে পারি।'

আত্হার বলল রানাকে, 'মিডল ইস্টের সর্বত্র গতিবিধি বেদুইনদের। সব খবরই কম বেশি রাখে ওরা।'

বেন-হাকিম তার দলবল নিয়ে চড়ে বসল জীপের উপর। ছেড়ে দিল আত্হার জীপ।

রানা বলল, 'তেল আবিবে প্রবেশ করতে…'
'কোনও চিন্তা করবেন না। আমার লোক সব জায়গায় সব সময় আছে। আল্লা সহায়।' বেন-হাকিম আশ্বাস দিল।

মাইল পনেরো এগোবার পর একটা হাসপাতালের গ্যারেজের কাছে থামল জীপ। নেমে পড়ল সবাই। এ্যাম্বুলেন্সে চড়ে বসল সবাই বেন-হাকিমের ইঙ্গিতে। মিনিট দশেক পর এ্যাম্বুলেন্সে এসে উঠল সে নিজে। ছেড়ে দিল এ্যাম্বুলেন্স। আত্হার জানালাগুলোর শাটার নামিয়ে দিয়েছে।
তেল আবিবে পৌঁছে গেল ওরা নটার দিকে। এ্যাম্বুলেন্স থামল আর একটা হাসপাতালের পিছন দিকে। বেন-হাকিম সবাইকে অপেক্ষা করতে বলে নেমে গেল একা। আধ ঘণ্টা পর ফিরে এল সে। কথা বলল না। গাড়ির উপর বসে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে লাগল নির্ভাবনায়। আরও মিনিট কুড়ি পর বাইরে থেকে বেন-হাকিমকে ডাকল কেউ। বেন-হাকিম নেমে গিয়ে খানিকক্ষণ কথা বলল আগন্তুকের সাথে। তারপর ডাকল আত্হারকে, নামার ইঙ্গিত করল বনবন আর রানাকে।
এ্যাম্বুলেন্স থেকে নেমে বড় একটা ক্রাইসলার গাড়িতে উঠে বসল ওরা সবাই। কিন্তু বেন-হাকিমের অপর দুই সঙ্গীকে এবার দেখা গেল না। আত্হার রানাকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'আমাদের প্লেন সন্ধ্যার আগে উড়বে না। আমাদের পাসপোর্টের ব্যবস্থা হয়ে যাবে ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই। বেন-হাকিম লোক পাঠিয়ে দিয়েছে। ট্যুরিস্ট হিসেবে উঠব আমরা হোটেলে। সন্ধ্যার ফ্লাইটে এথেন্স গিয়ে পৌঁছুব। ঘুর-পথে যেতে হবে আমাদের।'
'ফাইন্যালি কোথায় যাচ্ছি আমরা?'
'অনুমান করে নির্দিষ্ট কোন জায়গার নাম বলা অসম্ভব। বেন-হাকিম সঙ্গে থাকছে। তথ্য যোগাড় করে দেবার ভার ওর ওপর। পারবে বলেই সাহায্য নিয়েছি ওর। সেকেন্ড প্রফেটের অনুচররা মিডল ইস্টের সব বর্ডারেই ঘাঁটি পেতে আছে গোপনে।'
শহরটা দেখার ইচ্ছা থাকলেও দেখতে যাওয়াটা রিস্কি। জানালার পর্দা ফেলে দিয়েছে বেন-হাকিম। সামনের কাঁচ দিয়ে যতটা দেখা গেল তাতেই বুঝতে অসবিধে হলো না রানার যে তেল আবিব কসমোপলিটান সিটির আদর্শ বিশেষ।
'হিয়ার উই আর।' আত্হার বলল ক্রাইসলার থেমে যেতেই।
প্রকাণ্ড একটা উঁচু বিল্ডিংয়ের সামনে নামল ওরা। হোটেল এনা। এদিক ওদিক না তাকিয়ে লন পেরিয়ে সোজা এলিভেটরে এসে উঠল সবাই। এলিভেটর ফোরটিস্থ ফ্লোরে উঠে এসে দাঁড়াল। বেন-হাকিমের একজন লোককে দেখা গেল এলিভেটর থেকে নামতেই। লোকটাকে কাজের বলেই মনে হলো। হোটেলের একটা বয়ের সাথে খুব দহরম মহরম চালিয়েছে ইতোমধ্যেই।
প্রত্যেককে নিজের নিজের রুমে পৌঁছে দিল বেন-হাকিমের লোক।

পাশাপাশি রুমগুলো ওদের।

শাওয়ারে কুড়ি মিনিট লাগল রানার। আত্হার সব ব্যবস্থা করেছে নিখুঁতভাবে। বেন-হাকিমের লোককে দিয়ে পোশাক পরিচ্ছদ কেনাতেও ভুল করেনি।

বেন-হাকিম ওদেরকে এলিভেটরে উঠিয়ে দিয়ে বিদায় নিয়েছে। আবার আসার কথা তার আধ ঘণ্টার মধ্যে।

বনবন এসে দেখল রানা চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বুজে সিগারেট টানছে। সংলগ্ন রুম ওদের। দরজা খুলেই ঢুকে পড়েছে বনবন। চোখ বুজেই জিজ্ঞেস করল রানা, 'স্নান করেছ?'

'হুঁ।'

'সেজেছ?'

'হুঁ—' বনবন একটা হাত রাখল রানার কাঁধে, 'এসব আবার কি ধরনের প্রশ্ন?'

'কথা নয়। প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যাও। মৃত্যু ভয় দূর হয়েছে?' চোখ বন্ধ রানার।

'কেন, মরতে যাব কোন্ দুঃখে। আমি মরলে তোমার কাঁধের দায়িত্ব নেমে যায়, না?'

'কাঁধের দায়িত্ব নামাবার জন্যে তোমার মৃত্যু কামনা করব তেমন লোক মনে হয় আমাকে?'

'না—মাফ করো, রানা।' ঝুঁকে পড়ে রানার কপালে চুমো খেল বনবন, 'তুমি আমাকে দ্বিতীয়বার জন্ম দিয়েছ। সেকথা ভুলি কেমন করে।'

রানা চোখ মেলে বলল, 'আর একবার মৃত্যু ভয়ে কাহিল হয়ে পড়ো, প্লীজ। আমার তাহলে…'

'য্ যা, দুষ্টু…' মরুদ্যানের সেই বন্দীখানার অন্ধকার ঘরটার কথা মনে পড়ে গেল বনবনের। মরতে হবেই মনে করে রানাকে সঁপে দিয়েছিল ও সবকিছু।

বনবনের রুম হয়ে রানার রুমে এল আত্হার। বলল, 'ব্রেকফাস্ট আনতে বলে দিয়েছি এখানে।'

ব্রেকফাস্ট সেরে আত্হার উঠে দাঁড়াল। রানা জিজ্ঞেস করল, 'বেন-হাকিম ফিরবে কখন?'

'পোর্টারকে বলে রেখেছি কেউ আমার রুমে আসতে চাইলে উপরে এনে বসাতে। এতক্ষণ বেন-হাকিম এসে গেছে বোধহয়।'

ওরা তিনজন বনবনের রুম অতিক্রম করে আত্হারের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। আত্হার ভেজানো দরজা খোলার জন্যে হাত বাড়াতেই রানা বাধা দিল, 'দাঁড়াও, কেউ থাকতে পারে ভিতরে।' কথাটা বলে বনবনকে পিছনে সরিয়ে দিয়ে এক ঝটকায় খুলে ফেলল দরজার কবাট দুটো। ভিতরে ঢুকেই একপাশে সরে গিয়ে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়াল ও।

প্রায় অন্ধকার রুমের ভিতর একটা ইজি চেয়ারের উপর গা এলিয়ে দিয়ে

উরুর উপর ছড়িটাকে শুইয়ে রেখে সিগারেট টানছে একজন লোক। সুইচ অন্ করতেই চেনা গেল।
ইন্সপেক্টর জেনারেল বেলচা অপেক্ষা করছে ওদের জন্যে।

চমকটা প্রত্যাশা করেনি আত্হার। পকেট থেকে রিভলভার বের করে ফেলেছে ও আগেই। রানা ওর হাতটা সরিয়ে দিল। আত্হার অস্বাভাবিক গম্ভীর হয়ে উঠল, 'আপনি খুব ফাস্ট, হের বেলচা।' মোটা গলায় বলল ও, 'এই হোটেলে, এই রুমে আশা করিনি আপনাকে।'

'মাই ডিয়ার মেজর আত্হার, আমাদের ইনফরমেশন পাবার মাধ্যম একটা দুটো নয়। কেমন আছে ইব্রাহিম বেন-হাকিম? দেখছি না যে ওকে?'

'হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট?' সরাসরি প্রশ্ন করল এবার রানা।

'মানে হয় না। কোনও মানে হয় না এ প্রশ্নের। আমরা কি ঝগড়া করব পরস্পরের সঙ্গে?' ছড়ি দুলিয়ে দুলিয়ে কথা বলছে জেনারেল বেলচা, 'আপনাদের মহান শত্রুনিধন প্রচেষ্টায় আমার ক্ষুদ্র শক্তি যোগ করার সদিচ্ছাকে অবহেলা করবেন এমন আশা আমি করি না, হের রানা। ইললিগালি তেল আবিবে ঢুকেছেন আপনারা। সন্দেহ নেই, ব্যাপারটা ভয়ঙ্কর।'

'সিকিউরিটি পুলিস সেকথা জানবে না।' আত্হার বলল দৃঢ় কণ্ঠে।

'জোর করে বলতে পারেন?'

রেগে উঠে আত্হার জিজ্ঞেস করল, 'আপনি ইতিমধ্যে সতর্ক করে দিয়েছেন বুঝি ওদেরকে?'

'প্লীজ। আগেই বলেছি, আমরা শত্রু নই পরস্পরের। আমরা বন্ধু। মিউনিকে আমি কি সাহায্য করিনি আপনাদেরকে? হুবার্ট ডনফিল জেল থেকে পালিয়েছে, সেটা কি আমার দোষ?'

'দোষ বা ভুল—আপনারই।'

'মাই ডিয়ার হের মাসুদ...।'

রানা বলল, 'জাস্ট এ মোমেন্ট।'

ক্রোধ ও সন্দেহ লাফ মেরে মেরে বাড়তে যাচ্ছে দেখে রানা আত্হারকে খাবার আনবার ব্যবস্থা করতে বলল জেনারেল বেলচার জন্যে। রানা রুমগুলো সার্চ করতে শুরু করে দিল।

বাথরুম সার্চ করল আগে ও। তারপর বেডরুম। একটি মাত্র ব্যালকনি সেটাও বাদ দিল না রানা। পাওয়া গেল না কোন যন্ত্র।

সিটিং রুমের চেয়ার উল্টে উল্টে দেখার সময় জেনারেল বেলচা নিষ্পলক চোখে দেখতে লাগল রানাকে। কষ্টে দেয়ালের তৈলচিত্রগুলো খুলে ফেলে পরীক্ষা করল একটা একটা করে রানা। ব্রাস ল্যাম্পের বাল্বের স্ক্রু খুলে দেখল। চেক করল পার্শিয়ান কার্পেট। Hexogonal Bombay টেবিলটার নিচে ঢুকে গিয়ে তন্ন তন্ন করে খুঁজল। কোথাও কিছু না পেয়ে ইসরাইলী সিকিউরিটি অ্যাপারেটাস সম্পর্কে শ্রদ্ধা বেড়ে গেল রানার। ইসরাইলীরা বোকা নয়। হোটেল তৈরির সময় লিসনিং ডিভাইস ফিট করা হয়েছে বলে

ধারণা করল ও।

আত্হার পাসপোর্ট নিয়ে রুমে এল রানার কাজ শেষ হয়ে যেতে। পরীক্ষা করে রানা বলল, 'কোনও খুঁত নেই।' একটু ভেবে নিয়ে জানতে চাইল ও, 'কখন রওনা হচ্ছি আমরা?'

'ডিনারের আগে নয়।'

গম্ভীর হয়ে উঠল রানা। তারপর হঠাৎ ফিরল জেনারেল বেলচার দিকে ও, 'আই রিপিট, হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট?'

'মাই ডিয়ার হের মাসুদ রানা, আপনার মত লোকের সন্দেহ থাকা ভাল, কিন্তু সে-সন্দেহ আমার ওপর ফেলার কোন অর্থ হয় না। ইসরাইলের সাথে এসব ব্যাপারে আমার কোনও যোগাযোগ নেই। বিশ্বাস করুন। আপনাদেরকে সাহায্য করছি, এটাই কি প্রমাণ নয়?'

রানা পরিষ্কার গলায় বলল, 'আপনাকে বিশ্বাস করি না, জেনারেল। আপনার কোনও সাহায্য আমরা চাই না। আপনাকে যদি এখন এখান থেকে বের হয়ে গিয়ে নিজের কাজে মাথা ঘামাতে বলি?'

'তাহলে একটি মাত্র কাজই করব আমি।'

'কি সেটা?' আত্হার কর্কশ গলায় প্রশ্ন করে তাকাল রানার দিকে। রানা শান্ত হবার ইঙ্গিত করল ওকে।

'ইসরাইলী সিকিউরিটি সারভিসে একটা ফোন করলে আপনারা আজ প্লেনে চড়তে পারবেন না।'

আত্হারের গলা দিয়ে অদ্ভুত শব্দ বেরিয়ে গেল একটা। খেপে গেছে ও। হাত বাড়িয়ে আত্হারের কাঁধটা ধরে ফেলে থামাল রানা। রাগে ফুঁসছে আত্হার। রানা এগিয়ে এল জেনারেল বেলচার কাছে, 'জেনারেল, প্রথম থেকেই ধোঁকা দিয়ে রাখার চেষ্টা করেছেন আপনি আমাদের সবাইকে। হুবার্ট ডনফিল সম্পর্কে ফাইল আছে আপনার অফিসে। ফাইলে সত্য লিপিবদ্ধ আছে। আপনি সব জানেন। বলুন হুবার্ট ডনফিল নাজী অপরাধী কিনা?'

'আমি অত্যন্ত দুঃখিত, উত্তর দেয়া এখন সম্ভব নয়।'

'আত্হার?' রানা ডাকল।

আত্হার মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে ইজিচেয়ারের অপর পাশে এগিয়ে এসে দাঁড়াল। বনবন নিজের রুমে চলে গেছে একসময়। জেনারেল বেলচা ছড়িটা মাটিতে দাঁড় করিয়ে ঝুঁকে পড়ল সামনে, লম্বা করা পা দুটো টেনে নিল কাছে।

'ঘিরে ফেলা হলো মনে হচ্ছে। কোনও হুমকিকে ভয় করি না আমি, জেন্টলমেন। আমার প্রস্তাব ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হব এরপর আমি।'

'হ্যাঁ, তাই নিন জেনারেল। আপনার সাহায্যের নমুনা দেখে ফেলেছি আমি। এখানে আসার পর থেকেই বিশ্বাসঘাতকতা শুরু করেছেন আপনি।' রানা বলল।

'বুঝতে পারলাম না আপনার কথা, হের মাসুদ...'

'আপনার ছড়িটা দিন, জেনারেল।' রানা বলল।

'আমার ছড়ি?'

'ন্যাকামি খাটবে না, জেনারেল। তুমি বোকা নও। গিভ মি দ্য স্টিক।'

জেনারেল বেলচা উঠে দাঁড়াতে গেল দ্রুত। কিন্তু রানা আগেই কনুই চালিয়েছে পাশ থেকে। বিজাতীয় স্বরে অব্যক্ত একটা উঁক শব্দ তুলে এলিয়ে পড়ল সে ইজিচেয়ারে। ছড়িটা টান মেরে কেড়ে নিল আত্‌হার।

এক পা করে দু'জনা পিছিয়ে এল ওরা। আত্‌হার ছড়িটা তুলে দিল রানার হাতে। রানা লক্ষ্য রাখতে বলল ওকে জেনারেলের দিকে।

ছড়িটা সোনার টোপর পরানো। সেটা ধরে জোরে মোচড় দিতেই প্যাঁচ খুলতে শুরু করল। টোপরটা খুলতে ভিতরে গর্ত দেখা গেল। টেবিলের উপর ছড়িটা ঠুকল ঠকঠক করে রানা। হঠাৎ বেরিয়ে এল ক্ষুদ্র একটা ব্রডকাস্টিং যন্ত্র। রানা বুঝতে পারল রুমে ঢোকার পর থেকেই জেনারেল বেলচা ওদের খবর পাচার করতে শুরু করেছিল। কিন্তু কার কাছে? কোথায়?

রিভলভারটা জেনারেল বেলচার বুক লক্ষ্য করে ধরেছে আত্‌হার, 'শেষ করে ফেলি ঝামেলা, রানা।'

'একমিনিট।' রানা তাকাল জেনারেলের দিকে, 'হুবার্ট ডনফিলের কথা বলো, বেলচা।'

জেনারেলের মুখ শুকিয়ে কালো হয়ে গেছে। রানার দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর মুখ খুলল সে, 'আসলে হুবার্ট ডনফিল একজন নয় মাই ডিয়ার—দু'জন। একজন পোল্যান্ডের প্রিজন ক্যাম্পের চার্জে ছিল, সেও বৈজ্ঞানিক। দ্বিতীয়জন অপটিক আর ইলেকট্রনিকে এক্সপার্ট। দু'জনাই ব্রিলিয়ান্ট। আমরা জানি একজন মরে গেছে। আর একজন কাজ করছিল আলাবামায়। কিন্তু দু'জনার মধ্যে কে মারা গেছে এখনও সঠিক জানি না আমি।'

রানা বলল, 'মিথ্যে বলার সময় নয় এটা, বেলচা। ইনোসেন্ট ছিল কে?'

'কসম খেয়ে বলছি, ব্যাপারটা তালগোল পাকানো। আসল সত্য আমি নিজেই জানতে চাই।'

'কার কাছে খবর পাঠাচ্ছিলে তুমি?'

জেনারেল চুপ করে রইল।

'পাঁচ সেকেন্ড সময় দিলাম। এক···দুই··· তিন।' আত্‌হার গুণে চলল।

'ওয়েট, হার স্বীকার করছি আমি। ইসরাইলে নিজস্ব লোক আছে আমার।'

'আমরা যদি ধরা পড়ি তাহলে তুমি শেষ হবে আগে। লোকগুলো ইসরাইলী?'

'না।'

রানা আত্‌হারের দিকে ফিরে বলল, 'বেন-হাকিমকে লবি থেকে উপরে নিয়ে এসো, আত্‌হার। হোটেল বদলাতে হবে এখুনি। বেলচা আমাদের অতিথি আপাতত।'

নয়

রাত্রি ন'টায় ওরা বেন-হাকিম আর তার দুই সঙ্গীর সাথে এরোড্রামে এল। বেন-হাকিম রানাকে আশ্বাস দিয়ে জানিয়েছে শহরে পুলিসের কোনও অস্বাভাবিক তৎপরতা নেই। কিন্তু EL AL জেট স্টার্ট না নেয়া অবধি স্বস্তি পেল না রানা।

প্লেনে চড়ার আগে আত্হার অবাক হয়ে বলল, 'আমরা ভুল করছি, মেজর। বেলচাকে শেষ করেই রওনা হওয়া উচিত ছিল আমাদের। ওকে সাথে নিয়ে···'

'ওকে দিয়ে অনেক কাজ হবে, আত্হার। তাছাড়া তথ্য পেতে চাই ওর কাছ থেকে।'

'কি তথ্য দেবার আছে ওর? Negev থেকে আমরা যদি সন্ধান শুরু করি আল-রশিদের তাহলে হয়তো পেয়ে যাব। বেলচা আবার ষড়যন্ত্র পাকাবার সুযোগ পাবে আমরা ব্যস্ত হয়ে পড়লে।'

'Negev থেকে? তুমি শিওর?'

আত্হার বলল, 'তোমাকে যেখানে বন্দী করে রেখেছিল সেই জায়গা থেকে সম্ভাব্য যে কোন দূরত্বে হতে পারে আল-রশিদের আস্তানা। সিনাই মরুভূমি সম্ভাব্য দূরত্বে পড়ে। ভয়ঙ্কর দুর্গম জায়গা। কিন্তু বেন-হাকিমের বংশধররা চেনে ভাল করে।'

সিনাই। জানে রানা কি রকম দুর্গম অঞ্চল সিনাই। পাহাড় আর বালি। রাস্তা নেই। সেট্‌লমেন্ট নেই। পানি নেই। খাবার নেই।

সামনে সংগ্রাম বুঝতে অসুবিধা হলো না রানার।

এথেন্স এয়ারপোর্টে নেমেই ফোন করল রানা ওখানকার কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের অপারেটর সরফরাজকে।

হোটেলে উঠল ওরা একটা দিন কাটাবার জন্যে। সরফরাজ আধঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে গেল। ড্যান্সারদের সম্পর্কে যা জানানো দরকার সব বলে গেল রানা। সরফরাজ টেপ করে নিল ওর কথা। আজকেই পৌঁছে যাবে টেপ মেজর জেনারেল রাহাত খানের কাছে। রানা ওদের পরবর্তী কর্মসূচী সম্পর্কে খোলাখুলি কিছু না বলে সামান্য আভাস দিল মাত্র।

পরদিন দুপুরে কায়রোতে ল্যান্ড করল BEA জেট।

কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের অপারেটর সিদ্দিকী অপেক্ষা করছিল লবিতে। রানাকে ইঙ্গিতে ফার্স্ট ফ্লোরের বারে যেতে বলল সে।

বারে একটা টেবিলে বসে কনিয়াকের অর্ডার দিল রানা দু'জনের জন্যে। সিদ্দিকী এসে বসল ওর পাশে।

'বলো।' নিচু গলায় অনুমতি দিল রানা।

সিদ্দিকী ফিসফিস করে শুরু করল, 'মেসেজ পেয়েছি, স্যার। মেজর জেনারেল জানাচ্ছেন আপনার অ্যাকটিভিটি ঘাবড়ে দিয়েছে ড্যান্সারদেরকে। ওরা এক্ষেত্রে ওদের প্রথম আঘাত নির্দিষ্ট সময়ের আগেই হানতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন মেজর জেনারেল। যদি তাই করে, মেজর জেনারেল বিশ্বাস করেন, গোটা মিডল ইস্টকে উড়িয়ে দিতে পারে ওরা। ইতিমধ্যে সাবধান করে দেয়া হয়েছে কায়রোকে। আরব জাহানের আর সব দেশের গভর্নমেন্টকেও খবর পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। কিন্তু, মেজর জেনারেলের বিশ্বাস, এসব ব্যাপারে সেলিম আল-রশিদের কিছুই যাবে আসবে না।'

'স্পেসিফিক কোনও অর্ডার আছে আমার জন্যে?'

'আছে, স্যার। ইউ আর টু প্রসিড ইমিডিয়েটলি। যে কোন রিস্ক নেবার কথা বলেছেন মেজর জেনারেল। সেকেন্ড প্রফেটের আস্তানা খুঁজে বের করে ধ্বংস করার বদলে যে কোন ত্যাগ স্বীকারের নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।'

কোনও সন্দেহ রইল না রানার। মেজর জেনারেল রাহাত খান দরকার হলে মৃত্যুবরণ করতে বলেছেন ওকে।

এয়ারপোর্টের বাইরে ট্রাক অপেক্ষা করছিল। বেন-হাকিম তথ্য সংগ্রহের জন্যে অন্যত্র রওনা হয়ে গেল। তার বংশধরদের গ্রামে ওদের সাথে মিলিত হবে সে। গ্রামে বেন-হাকিমের ছেলে আইয়ুব আছে। ট্রাকে চেপে রওনা হয়ে গেল ওরা।

একটানা তেরো ঘণ্টা ছুটল ট্রাক। থামল শুধু সরাইখানায় দু'বার। আর পেট্রল নেবার জন্যে একবার। সারাদিন একঘেয়ে যাত্রা। বনবন ঘুমিয়ে পড়ল সন্ধ্যার পর রানার কাঁধে মাথা হেলান দিয়ে। বেশির ভাগ সময়ই নির্জন মরুভূমির মাঝখান দিয়ে পাকা রাস্তা ধরে চলেছে ট্রাক। চার পাঁচবার মিলিটারি চেক পোস্টে দাঁড় করাতে হলো ট্রাককে। আত্হারের আইডেনটিফিকেশন দেখে জেরা না করে স্যালুট ঠুকে ছেড়ে দিল সবখানেই।

রাত দশটার দিকে থামল ট্রাক। সামনে আর রাস্তা নেই।

আধঘণ্টার মত কাটল ওখানেই। বেন-হাকিমের সঙ্গী দু'জন উট আর ঘোড়া যোগাড় করে আনল গ্রাম থেকে। ট্রাক ফিরে গেল ওদেরকে নামিয়ে দিয়ে। উটের পিঠে চড়ে যাত্রা আবার।

ঘোড়া মাত্র দশটা যোগাড় করা গেছে। বেন-হাকিমের লোক পথ চেনে। তাদেরই একজন ঘোড়ায় চড়ল। ঘণ্টা তিনেকের মধ্যে পৌঁছুতে পারা সম্ভব উট ছুটিয়ে দিলে। সামনের উটটায় বসিয়ে দেয়া হলো জেনারেল বেলচাকে। সারাটা রাস্তা একটা কথা বলেনি সে কারও সাথে। ওরাও কেউ জিজ্ঞেস করেনি তাকে কিছু। বনবনকে নিয়ে পিছনের উটটায় উঠল রানা। ওদের আগে আত্হার আর বেন-হাকিমের অপর সঙ্গী।

জেনারেল বেলচার উটের রশি ধরে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল বেন-হাকিমের সঙ্গী। প্রতিটি উটের সাথে রশির যোগাযোগ আছে। ঘোড়ার সাথে বেশ দ্রুত তালে ছুট লাগাল উটগুলো লাইনবন্দী হয়ে।

ঘণ্টাখানেক আগে চাঁদ উঠেছে আকাশে। বাতাস নেই তেমন। কিন্তু

ভীষণ ঠাণ্ডা লাগছিল বনবনের। কম্বল গায়ে জড়িয়ে স্বস্তি পাচ্ছে না ও। রানাকে পিছন থেকে জড়িয়ে ধরেও সন্তুষ্ট হলো না। রানার পিঠে গাল রেখে ঘুমিয়ে পড়বার ইচ্ছা ওর। রানা ভয় দেখাল ওকে, 'ঘুমিয়ে পড়াটা তোমার মর্জি। কিন্তু পিছলে পড়ে গেলে হয়তো আমি টেরই পাব না। মরুভূমিতে পুড়ে মরবে কাল সকালে। অবশ্য খেঁকশিয়াল আর লুটেরাদের খপ্পর থেকে বেঁচে গিয়ে রাতটা যদি কাটাতে পারো।'

শিউরে উঠে রানাকে আরও জোরে আঁকড়ে ধরে বনবন বলল, 'তুমি আমাকে ফেলে যাবে বিশ্বাস করি না।'

রানা বলল, 'এর নাম সিনাই। কোন রকম দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দিলে খেপে যায় এই মরুভূমি। অসম সাহসী বীর-টির না হলে কেউ বেঁচে ফিরে যেতে পারে না এই সিনাই থেকে।'

'তবে আর চিন্তা কি আমার!' বনবন বলল, 'তুমিও তো অসম সাহসী বীর। আর তোমার সাথে আমার ভাগ্যকে বেঁধে নিয়েছি আমি মনে মনে। তোমার সাথে আমিও বেঁচে ফিরে যাব।'

চাঁদের আলোয় ধু ধু মরুভূমির পঁয়তাল্লিশ মাইল অতিক্রম করতে সাড়ে চার ঘণ্টা লেগে গেল।

মরুদ্যানটিকে গ্রাম বলে মনে হলো না রানার। বেন-হাকিমের পরিবারে সদস্য সংখ্যা ছেলেমেয়ে নারী পুরুষ নিয়ে দুশো আট। একটি মাত্র পরিবার। পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে আর কোন বসতি নেই। মরুদ্যানটিতে ছোট বড় অসংখ্য তাঁবু ফেলা।

বেন-হাকিমের পৌঁছুনোর কথা ওদের আগেই। কিন্তু পৌঁছায়নি দেখে চিন্তিত হলো রানা। ঘুর পথে আসার কথা তার ঘোড়ায় চড়ে। বেদুইনের শত্রুও কম নয়। আত্‌হারও চিন্তিত হয়ে পড়ল।

ওদের জন্যে আলাদা আলাদা তাঁবুর ব্যবস্থা করা হলো। বেদুইনরা চুপচাপ প্রকৃতির। রাত্রির এই শেষ লগ্নেও জেগে আছে সবাই। কিন্তু আশপাশে ঘুর ঘুর করতে দেখা গেল না কাউকে। তাঁবুগুলোর পাশে গিয়ে দাঁড়ালে মৃদু কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে শোনা যায়।

মিনিট পনেরো পর বিছানা ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়াল রানা। আত্‌হারের নাইট গ্লাসটা রয়েছে ওর হাতে। উত্তর দিকের আকাশে জেট প্লেনের শব্দ শুনতে পেয়ে বেরিয়ে এসেছে ও।

দেখতে পেল না প্লেনটাকে রানা। নিস্তব্ধ মরুভূমিতে মাঝেমধ্যে বুনো জন্তুর ডাক দূর থেকে ভেসে আসছে। বাতাস নেই খেজুর গাছগুলোর পাতায়। চাঁদ ডুবে যাচ্ছে এবার। মিনিট পাঁচেক পর আবার শোনা গেল জেটের শব্দ। অনুমান করার চেষ্টা করল রানা। ইজিপশিয়ান পেট্রল? নাকি ইসরাইলী?

সেলিম আল-রশিদের জেট প্লেন আছে কি?

মেজর জেনারেলের নির্দেশের কথা মনে পড়ল রানার। অস্বাভাবিক কোন ক্ষমতার অধিকারী আল-রশিদ। তা না হলে রাহাত খান মাথা ঘামাতেন না

এমন ভাবে।

তাঁবুতে ফিরে বাকি সময়টা ঘুমিয়ে নেবে ঠিক করল রানা।

'রানা?' দ্রুত টোকা পড়ল ক্যানভাসে। কে যেন ডাকছে। গভীর ঘুম চট্ করে ভেঙে গেল রানার। বিপদ ঘটেছে কোন বুঝতে পারল ও। আত্হারের গলায় বিপদ সঙ্কেত।

ক্যানভাস তুলতেই আত্হারের রাইফেলটা চোখে পড়ল রানার। সকাল হয়ে গেছে খানিক আগে।

'বনবন? তোমার কাছে বনবন?'

'অফকোর্স নট। কি বলতে চাও, আত্হার?'

'ওর তাঁবুতে নেই ও।'

'সব জায়গা দেখেছ?'

'নেই, রানা। আশেপাশে কোথাও নেই সে।'

'সার্চ পার্টির ব্যবস্থা করেছ? সকাল বেলা উঠে হাঁটতে বেরোয়নি…?'

'খুঁজতে বেরিয়েছে ওরা।'

থমকে গেছে রানা। হঠাৎ মনে পড়ল আশঙ্কটা, 'বেলচা?'

'ওর তাঁবুর সামনে গার্ড আছে বলে দেখিনি…মাই গড, মাথা খারাপ হয়ে গেছে আমার, রানা!' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল আত্হার, 'ওর খোঁজ নেয়াই আগে উচিত ছিল।'

দৌড়াল রানা কম্বল গায়ে দিয়েই জেনারেল বেলচার তাঁবুর দিকে।

রানার পিছন পিছন জেনারেলের তাঁবুতে ঢুকে মেঝেতে বুকে ছোরা গাঁথা অবস্থায় শুয়ে থাকতে দেখল আত্হার শুধু গার্ডটাকে। জেনারেল বেলচা নেই।

লাশ ছুঁয়ে রানা বলল, 'কয়েকঘণ্টা আগে মরেছে লোকটা।'

'দু'জনেই চলে গেছে তাহলে।'

'কিন্তু কোথায়?' রানা বলল বিমূঢ় গলায়।

'ড্যান্সাররা নিয়ে গেছে ওকে,'—আত্হার দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'বনবনকে ওদের দরকার। ডনফিলকে কাজ করাতে হলে বনবনকে না হলে চলবে না ওদের। প্রথমবার কিডন্যাপ করেছিল ওরা ওকে তাই। দ্বিতীয়বারও…'

'কিন্তু কে জানে আমরা এখানে আছি?'

'সব কথা যেমন করে জানে ওরা আমাদের কথাও তেমনি করে জেনেছে। সব জায়গায় ওদের চর আছে। এই বেদুইনদের মধ্যেও আছে!'

'বেন-হাকিমের খবর কি?'

'ফেরেনি সে?'

বেদুইনদের তাঁবুর কাছে চলে এল রানা। খবর ছড়িয়ে পড়েছে ইতোমধ্যে।

আইয়ুব এগিয়ে এসে পরিচয় দিল নিজের। বেন-হাকিমের ছেলে সে। শিক্ষিত। ইংরেজী, হিব্রু, আরবী ও ফ্রেঞ্চ ভাষা জানে। রানাকে নিজের

তাঁবুতে নিয়ে গিয়ে বসাল। রানা কিছু বলবার আগেই আইয়ুব বলল, 'আপনাদের গার্ল ফ্রেন্ড জার্মানটার সাথে স্বইচ্ছায় গেছে, মি. রানা। আমরা কোনও শব্দ পাইনি।'

রানা বলল, 'বনবন স্বইচ্ছায় গেছে বলে মনে করি না আমি।'

'ভুল মনে করেছেন আপনি।' আইয়ুব বলে উঠল, 'যাকগে। আমরা সত্য আবিষ্কার করতে পারব। দেরি হবে না বেশি। মেজর আমাদের সাথে যাচ্ছেন। ইচ্ছা করলে যেতে পারেন আমাদের সাথে আপনিও। উত্তর দিকটা দেখব আমরা।'

রানা জিজ্ঞেস করল, 'তোমার আব্বার কাছ থেকে শুনেছ আল-রশিদের হেডকোয়ার্টার সম্পর্কে?'

'সিনাই বড় অদ্ভুত জায়গা, মি. রানা। খোদার গজব আছে এই এলাকায়। এই সিনাইয়ের বুকে কত শত রকমের উপজাতি বাস করে তার কোন হদিস আজ পর্যন্ত করা সম্ভব হয়নি। এখনও পৌত্তলিক ধর্ম মেনে চলে অনেক উপজাতি। খোদার ওপর বিশ্বাস নেই ওদের। আশ্চর্য সব ধর্মীয় অনুষ্ঠান তাদের। নরবলি তো আকছার দেয়। সূর্যকে দেবতা মানে। অনেক উপজাতি আছে যারা মনে করে চাঁদ তাদের খবর জানাবার জন্য আকাশে ওঠে। দেবতাদের কাছে গিয়ে রিপোর্ট করে সে। চাঁদের উদ্দেশে নাচে ওরা। সেই নাচ কোন সময় থামে না। ঢলে পড়ে আত্মহত্যা করে ওরা। Djebel Kif-এর নাম শুনেছেন মি. রানা?'

'না।'

'বড় দুর্গম জায়গা ওটা। ওখানে যে গেছে সে আর ফিরে আসেনি কোনদিন। এর বেশি আমি আর কিছু জানি না।'

রানা বাইরে বেরিয়ে এল। আত্হার উট তিনটের পিঠে পানির ব্যাগ সাজানো দেখছিল।

'Djebel Kif-এর নাম জানো?'

আত্হার বলল, 'কেন?' বিস্মিত দেখাল ওকে, 'একটা রাক্ষুসে পর্বত শৃঙ্গের নাম Djebel Kif, তিনশো বছর আগে একটা তথ্য পাওয়া গিয়েছিল ওখানকার অধিবাসী সম্পর্কে। ঈজিপশিয়ান বর্ডার থেকে পঞ্চাশ ষাট মাইল দূরে। আজব এক ধরনের উপজাতি বাস করে ওখানে। যাদের কথা পরিষ্কার ভাবে কেউ জানে না কিছু। ওরা নাকি পৌরাণিকতা কাটিয়ে উঠতে পারেনি এখনও।'

'পর্বত শৃঙ্গটা দেখেছ কখনও?'

মাথা নাড়ল আত্হার, 'প্রায় কোনও লোকই ওদিকে যায় না। বেদুইনরা পর্যন্ত মনে করে আল্লার অভিশপ্ত জায়গা ওদিকটা। চাঁদে গিয়েও আমেরিকানরা যেমন চাঁদ সম্পর্কে কিছুই জানে না, তেমনি আমরা তো দূরের কথা, সিনাইয়ে থেকেও সিনাইয়ের লোকেরা Djebel Kif সম্পর্কে কিছুই জানে না।'

'কেউ জানুক আর না জানুক, আল-রশিদের আসল ঘাঁটি যে Djebel Kif তা বুঝতে পারছি আমি।'

'যদি তাই হয়, তাহলে পূর্ব পশ্চিম দিক থেকে সশস্ত্র আক্রমণ চালাতে হবে। যুদ্ধের প্রস্তুতি দরকার, রানা। বিশ্বাস করো ব্যাপারটা ছেলেখেলা নয়। আশেপাশের সবচেয়ে উঁচু পর্বতশৃঙ্গ ওটা। যার অর্থ : হুবার্ট ডনফিলের লেসারবীম ওখান থেকে নিক্ষেপ করা হলে কয়েক শ'মাইলের সবক'টা রাজধানী স্রেফ ছাই হয়ে বাতাসে উড়ে যাবে।'

'Djebel Kif ই আমাদের গন্তব্যস্থল।'

উটগুলো ভাল দৌড়ুতে পারে না। কিন্তু দ্রুত ছোটাও অসম্ভব। ফ্রন্টিয়ারের দিকে মুখ করে যাচ্ছে ওরা। চিহ্নিত কোন পথ নেই সামনে। লালচে নুড়ি লালচে পাথর বিছানো মাইলের পর মাইল।

আইয়ুবের একজন লোক একবার উট থেকে নেমে একটা পাথর পরীক্ষা করে দেখল। বেন-হাকিমের ছেলেকে নিজেদের ভাষায় কিছু বলল সে। আরও ঘন্টাখানেক পর লাল একটা পাহাড়ের পাদদেশের সামনে স্তূপীকৃত বালিতে ছাপ পাওয়া গেল।

'ওরা এই দিকে এসেছে।' বিড় বিড় করে বলল বেন-হাকিমের ছেলে।

'পায়ে হেঁটে?' রানা জানতে চাইল।

'হ্যাঁ,'—আইয়ুব বলল, 'এই পর্যন্ত অন্তত। জার্মান আর মেয়েটি।'

রানা বলল আত্‌হারকে, 'কিন্তু বেলচা পঞ্চাশ ষাট মাইল হেঁটে যেতে পারবে না Djebel Kif পর্যন্ত। শয়তানটা নিশ্চয়ই ড্যান্সারদের সাথে আগে থেকে যোগাযোগ করে রেখেছিল। আমাদের সাথে আসতে চাওয়ার কারণটা বুঝতে পারছি এখন।'

'তার মানে বেলচা সবসময় ড্যান্সারদের লোক ছিল?'

রানা বলল, 'এগোনো যাক।'

কুড়ি মিনিট পর পূর্ব নির্ধারিত পয়েন্টে পৌছুল কাফেলা। আত্‌হার জানাল চিহ্নহীন সিনাই ফ্রন্টিয়ার অতিক্রম করেছে ওরা।

পরবর্তী একটি পাহাড়ের কাছে অকস্মাৎ উট থেকে নেমে পড়ল আইয়ুব। একমুহূর্ত পরই বিজয়োল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল সে, 'পেয়েছি!'

শুকনো বালির উপর জীপের চাকার আর পায়ের ছাপ পরিষ্কার ফুটেছে। জেনারেল আর বনবনের পায়ের ছাপ ছাড়াও তিনজন অতিরিক্ত লোকের ছাপ দেখল রানা। জীপের চাকা মোড় নিয়ে উত্তর দিকের পর্বত শৃঙ্গের দিকে চলে গেছে। আত্‌হার বলল, 'টায়ারগুলো চেকোশ্লোভাকিয়ার তৈরি। আর্মির কাছে কিছু এই জীপ আছে। ড্যান্সাররা চুরি করেছে তার মানে।'

সূর্যের প্রহার অসহ্য হয়ে উঠল। বেন-হাকিমের ছেলে নিজের আলখাল্লা দিতে চাইল রানাকে। মৃদু হেসে ধন্যবাদ জানাল রানা। নিল না আলখাল্লা।

এগোনো যাচ্ছে খুব কম। বারবার ভুল হয়ে যাচ্ছে পথ। পিছন ফিরে এসে দিক নির্ণয় করে নিয়ে আবার মন্থর গতিতে শুরু হচ্ছে এগোনো। জীবিত কিছুই চোখে পড়ল না রানার। সামান্য কাঁটা গাছও নেই কোথাও। শব্দ বলতে বাতাস বইলে শোনা যাচ্ছে মাঝেমধ্যে। হঠাৎ কখন বালির মেঘ উড়ে এসে ঘিরে ফেলেছে ওদেরকে। কিন্তু বেশির ভাগ সময় শুধুমাত্র পাথরের উপর দিয়ে

এগোচ্ছে উট। লাল আর ধূসর রঙের পাথর। পিছনে, সামনে, ডানে আর বাঁয়ে পাথরেরেই মহাসমুদ্র। কোন্ দিকে চলেছে ওরা কিছুই বুঝে উঠতে পারল না রানা। কিন্তু বেদুইনরা জানে।

খাড়া একটা পর্বত শৃঙ্গের নিচে বসে বিশ্রাম নেবার সময় জেটের শব্দ শুনতে পেল রানা দূরে। এবারের শব্দ উচ্চকিত। হলুদ আকাশ আর পিঠের কাছের বালি কাঁপিয়ে দিল শব্দটা। ঝুর ঝুর করে পড়তে শুরু করল বালি। রানা ছোট ছোট ঢোকে গলায় পানি ঢালতে ঢালতে আকাশ সার্চ করার চেষ্টা করল। কিন্তু আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকা অসম্ভব। সূর্যের একচ্ছত্র প্রচণ্ড দাপট গোটা আকাশ জুড়ে। কিছুই দেখতে পেল না রানা।

দুপুর গড়াবার আগেই আবার যাত্রা।

তিনটে ছোট ছোট পাহাড় অতিক্রম করার পর আবার বালির উপর জীপের চাকার দাগ দেখা গেল। মাত্র তিন মাইল এগোবার পর বেন-হাকিমের ছেলে বহুদূর ব্যাপী সরু শৈলশিরা দেখাল আঙুল বাড়িয়ে, 'ওদিকে যাব আমরা। জীপ দ্রুত গেছে, কিন্তু শর্টকাট রাস্তা ধরব এবার আমরা। উট আট মাইল বাঁচিয়ে দেবে আমাদের।'

'কিন্তু ওদেরকে ধরা সম্ভব হবে না।'

'সেরকম কোনও আশা আগেও ছিল না এখনও নেই।' আইয়ুব ব্যাখ্যা করল, 'কিন্তু আমরা হয়তো জানতে পারব কোথায় গেছে ওরা। আর হয়তো জানতে পারব কি ঘটেছে আমার আব্বার কপালে। আমার আব্বা আমার কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।'

দু'ঘণ্টা অমানুষিক পরিশ্রম করে ক্রমশ উঁচু হয়ে ওঠা পাথরের স্তূপে উঠল ওরা। উটগুলোকে বেশিরভাগ সময় টেনে নিয়ে আসতে হলো রশি ধরে। এবার এই প্রথম মানুষ বাস করে এমন একটা জায়গা দেখল রানা। বেদুইনদের ক্যাম্প। ওদের কাছে জায়গাটা পরিচিত। একমাত্র কূয়াটা বিস্ফোরক দ্রব্য দিয়ে বুজিয়ে ফেলা হয়েছে। প্রচণ্ড রোদে পড়ে রয়েছে তিনটে ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ। দূর থেকেই দেখা গেল পোড়া তাঁবু আর কম্বল।

কাছাকাছি পৌঁছুতেই বিশাল ডানা মেলে আকাশে উড়ল কুৎসিত চেহারার কয়েকটা শকুন। লাশগুলো ছেড়ে নড়বার লক্ষণ নেই ওদের। উপরে চক্কর মেরে উড়তে লাগল।

নিহত লোক তিনজন বেদুইন। আইয়ুব বলল, 'এরা! এরা কিন্তু আমার আব্বার বন্ধু। কায়রোয় থাকে। আব্বার তো এদেরকে নিয়েই আসার কথা! আমার আব্বা?'

আইয়ুবের কথা শেষ হতেই রাইফেল গর্জে উঠল কাছ থেকে।

আইয়ুবের একজন সঙ্গীর হাতে রাইফেল দেখল রানা। আবার লক্ষ্য স্থির করছে সে দূরে। আধমানুষ সমান উঁচু পাথরের মাঝখান দিয়ে টলতে টলতে এগিয়ে আসছে একটি ছায়ামূর্তি। চিৎকার করে উঠল আইয়ুব সঙ্গীর উদ্দেশে, 'থামো!'

চোখ ছোট ছোট করে দূরের ছায়ামূর্তিটার দিকে তাকিয়ে থাকতে

থাকতে আইয়ুব ফিস্ ফিস্ করে উঠল, 'আল্লা বাঁচানে-ওয়ালা।'

'হ্যাঁ। ও বেন-হাকিম, তোমার আব্বা!' রানা বলল আস্তে করে।

বেন-হাকিম ছাড়া সবাইকে মেরে রেখে গেছে।

কোনও রকমে প্রাণ বাঁচিয়ে পালিয়ে যেতে পেরেছিল বেন-হাকিম। গোড়ালির উপর বুলেটের আঘাতে ছড়ে গেছে তার। আত্হার ব্যাগ খুলে জখমের পরিচর্যায় হাত দিল।

'আল্লা সব দেখছেন। নকল পয়গম্বর জ্বলেপুড়ে খাক হয়ে যাবে। দেখবেন আপনারা।'

'ওরা নকল পয়গম্বরের লোক? আপনি ঠিক জানেন?'

'চোরের মত লুকিয়ে ছিল ওরা।' রানার প্রশ্নের উত্তরে হ্যাঁ-সূচক মাথা নেড়ে বলল বেন-হাকিম, 'সাবধানই ছিলাম আমরা। কিন্তু এলাকাটা হচ্ছে ওদের। আমরা দ্রুত এসেছিলাম তাই ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম বেঘোর হয়ে। কিন্তু আল্লা মরা লোকগুলোকে বেহেশতে নাজেল করবেন।'

'Djebel Kif চেনেন আপনি?' রানা কথা পাড়ল।

'কাজের লোক আপনি,'—হাসল বেন-হাকিম, 'আমাকে ছাড়াই শয়তানের বাড়ির নাম জেনে ফেলেছেন।'

'গেছেন কখনও?'

'হ্যাঁ—কাছাকাছি গেছি। কিন্তু কোনও উপায় নেই। কোন মানুষের পক্ষে ওপরে যাওয়া অসাধ্য।'

'অসাধ্য কিছুই নয়।' আত্হার বলে উঠল।

'তাহলে চলুন আমার সাথে। দেখবেন নিজেদের চোখে আমার কথা সত্যি কি না। ওখানকার কেউ না চাইলে ওখানে যাওয়া যে কোন মানুষের পক্ষেই সম্পূর্ণ অসম্ভব। আমরা বেদুইন। অসম্ভব বলে মনে করি না আমরা কোন কিছুকেই। Djebel Kif-এ যাওয়া একদম অসম্ভব।'

রানা বলল, 'হয়তো তাই, কিন্তু উপায় একটা আছে। কারণ আমাকে সেলিম আল-রশিদ চায়। আমি যাচ্ছি ওখানে।'

দশ

শয়তানের বাড়ির মতই ঝুলে থাকতে দেখল রানা হলুদ রঙা আকাশের গায়ে Djebel Kif-কে।

বেন-হাকিমের বন্ধুদেরকে কবরস্থ করে বেরিয়ে পড়েছিল ওরা। চল্লিশ ঘণ্টার পথ পেরিয়ে পৌঁছেছে ওরা। বেন-হাকিম অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠেছে আহার আর চিকিৎসা পেয়ে। আসার পথে কেউ ওদেরকে অনুসরণ করেনি বলে জানিয়েছে আইয়ুব আর তার স্কাউট দল।

ক্রমশ নেমে গেছে ঢালু হয়ে পাথরের সিঁড়ি। সিঁড়ির ছায়ায় দাঁড়িয়ে সামনে

দৃষ্টি মেলে দিল ওরা। Djebel Kif-এর শক্ত পাথরের কালো পিলার দেখা যাচ্ছে। আকাশে লটকে আছে যেন উঁচু পর্বত শৃঙ্গটি। প্রতিটি চূড়ায় প্রাচীনকালের দেবতাদের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মূর্তির মত পাথরের মূর্তির অস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। প্রায় ধসে পড়া একটা গম্বুজ আর কামান দাগার ফোকরওয়ালা লম্বা দেয়াল কয়েকটা খালি চোখে দেখা গেল। নড়াচড়া লক্ষ করা গেল। মরুর উত্তপ্ত বাতাস ওদের কাপড় দুলিয়ে বয়ে যাচ্ছে। বেন-হাকিম বিড়বিড় করে উঠল :

'লাভ নেই। দেখাচ্ছে নির্জন, কিন্তু মানুষ আর মেশিনে ঠাসা ওর ভিতরটা। ক'জন বেদুইন পাখির খোঁজে কাছাকাছি গিয়েছিল স্ত্রীলোকদেরকে নিরাপদে রেখে। মাত্র একমাস আগের কথা বলছি। কেউ আর তারা ফিরে আসেনি।'

'ড্যান্সাররা যাতায়াত করে কোন্ পথে?'

'উত্তর দিকে রাস্তা তৈরি করেছে ওরা। আউট অভ সাইট। একমাত্র পথ ওটা ক্লিফে পৌঁছুবার। গার্ড দেয়।' বেন-হাকিম ঢোক গিলে বলল, 'কাছাকাছি কোথাও ল্যান্ডিং প্লেস আছে। প্লেনে করে জিনিসপত্র আনে ওরা। তারপর হেলিকপ্টারে করে চূড়ায় পৌঁছায়।'

আত্হার বলল, 'শৃঙ্গ থেকে খালি চোখেই দশ মাইল দেখতে পায় ওরা। লুকিয়ে পৌঁছুতে পারব না আমরা। কিন্তু মিশরীয় আর্মির সাহায্য নিয়ে অকস্মাৎ আক্রমণ চালালে…'

'অত সময় নেই। বেলচা আর বনবন রয়েছে ওখানে।' রানা বলে উঠল, 'ভয়ঙ্কর কিছু ঘটতে যাচ্ছে আল-রশিদ তাই তাড়াহুড়ো করছে সব কিছুতে। যেতে হবে আমাকে।'

'কিন্তু তোমাকে আমি একা যেতে দিতে পারি না।'

হেসে ফেলল রানা, 'আর কোনও উপায় নেই।'

'এর নাম আত্মহত্যা।' বেন-হাকিম বলে উঠল।

তৈরি হতে আরম্ভ করল রানা। ওদের কথায় কান দিল না।

একঘণ্টা পর নামতে শুরু করল ও। উৎরাইয়ে পৌনে একঘণ্টা লাগল। সমতল বালির উপর দিয়ে হেঁটে চলেছে রানা। বড় অদ্ভুত লাগছে ওর। মাইল দুয়েক পিছনে আত্হার আর বেদুইনরা লুকিয়ে পড়েছে। মানুষ বলে কোনও প্রাণী আগে-পিছে ডানে-বাঁয়ে দেখতে পাচ্ছে না ও। গায়ে ফোসকা পড়ে যাবার মত গরম রোদ লাগছে। পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়েছে প্রকাণ্ড লাল মার্তণ্ড। উত্তপ্ত মরুবায়ু চোখের পাপড়িতে আর নাকের ভিতর বালি উড়িয়ে আনছে।

শৈলশিরায় কোন পদার্থের নড়াচড়া নেই, খাঁ খাঁ মরুভূমি ডানে বামে। পশু-পাখি, জন্তু জানোয়ার নেই। এক কণা পোড়া ঘাসের চিহ্নও নেই। বুটের নিচে বালি আর কুচি কুচি পাথর গুঁড়ো।

এমন নিঃসঙ্গ জীবনে আর কখনও বোধ করেনি ও।

পর্বত শৃঙ্গের দিকে চোখ তুলে আরও দ্রুত পা চালাল রানা। কি অপেক্ষা

করছে ওখানে ওর জন্যে? সেলিম আল-রশিদের বিশাল দেহটা চোখের সামনে ফুটে উঠল। খলিফাদের আমলের মণিমুক্তা খচিত বেশভূষায় সত্যি মানায় লোকটাকে। সিধে হাঁটতে হাঁটতে কি ভেবে উত্তর দিক ঘেঁষে হাঁটতে শুরু করল রানা। এখনও ঘণ্টাখানেক লাগবে বলে আন্দাজ করল রানা পাদদেশে পৌঁছুতে। উত্তর দিক দিয়ে প্রবেশ করার চেষ্টা করবে ও।

দক্ষিণ দিক থেকে পাহাড়টাকে যেমন দেখা গিয়েছিল উত্তর দিক থেকে ঠিক তার উল্টো মনে হলো। রাস্তাটা নজরে পড়েছে রানার। ছাগল ভেড়া যাতায়াতের পথের সরু দাগ মাত্র লালচে শক্ত বালিতে। পাহাড়ের গায়ের ওপর দিয়ে উপর দিকে উঠে গেছে ক্রমশ উঁচু সিঁড়ির ধাপের কাছে।

দিনের আলো থাকতে থাকতেই পাদদেশে পৌঁছুল রানা।

হঠাৎ একটা বুলেট ছিন্নভিন্ন করে দিতে পারে ওর হাড় মাংস। আল-রশিদ শত্রুকে বাঁচিয়ে রাখাটা বোকামি বলে মনে করলেই সব শেষ হয়ে যাবে। আত্মবিশ্বাস গুঁড়ো হয়ে যেতে লাগল রানার। পাহাড়ের গায়ে জীবনের চিহ্ন নেই। চ্যালেঞ্জ নেই। কোনও আক্রমণের লক্ষণ নেই। বেন-হাকিম ভুল করল নাকি? Djebel Kif ড্যান্সারদের আস্তানা যদি না হয়…

আরও উপরে উঠতে লাগল রানা।

এবার দেখা গেল পরিষ্কার পশ্চিম আকাশের শেষ লগ্নের উজ্জ্বল লাল রৌদ্রকিরণে ধসে যাওয়া গম্বুজটা। সামনের আকাশে সরু রঙ মাখা। বাতাসের তোড় বেশি এখানে। উপরে বাইজেন্টাইন প্রকাণ্ড প্রস্তর মূর্তি ধূসর রঙা আকাশের গায়ে মাথা উঁচু করে রয়েছে। একটা টাওয়ারের খানিকটা অংশ দেখা যাচ্ছে। ভিতর দিয়ে রাস্তা আছে বলে অনুমান করল রানা। খিলানগুলোর প্রবেশ পথ হাঁ করে গিলে খেতে চাইছে যেন ওকে।

শেষ একশো গজ সবচেয়ে জঘন্য। সশস্ত্র ড্যান্সাররা ওকে ঘিরে ফেলেছে বলে আশঙ্কা হলো রানার। মাথা থেকে সব চিন্তা বের করে দেবার চেষ্টা করে উঠতেই থাকল ও ধীরে ধীরে।

সবশেষে খিলান আর ধসে যাওয়া দেয়ালের সামনে দাঁড়াল রানা। প্রবেশ পথের ভিতর অন্ধকার যেন শত শত বছর ধরে জমাট বেঁধে আছে। এগিয়ে গেলেই গ্রাস করবে ওকে।

একটা কণ্ঠস্বর শুনতে পেল রানা।

'ওয়েলকাম, মি. রানা। ওয়েলকাম, ইনডিড।'

মুখের ভাব বদলাল না রানা সেলিম আল-রশিদের দিকে এগোতে এগোতে। ম্যাগনেটিক পাওয়ার আছে আল-রশিদের চেহারায়। প্রাচীন যুগের খলিফাদের পোশাকেই দেখল তাকে রানা। সোনা দিয়ে এমব্রয়ডারী করা। হীরক খণ্ড বসানো পরিচ্ছদের সবখানেই। ময়ূরের মত রূপ সব মিলিয়ে। কিন্তু ডেকোরেশনের কোনও বাহুল্য দরকার করে না আল-রশিদের। চারকোনা দেহের উপর চারকোনা মুখটা এক পলক দেখলে বুঝতে বাকি থাকে না এ পুরুষ মানবিক ও দৈহিক দিক দিয়ে সব পুরুষের ঈর্ষার পাত্র।

'আমরা Djebel Kif-এ আশা করছিলাম তোমাকে, মি. রানা। বুঝতেই

পারছ, আন্ডার এস্টিমেট করিনি তোমাকে।'

দুটো ছায়া অস্থির হয়ে উঠেছে প্রকাণ্ড আল-রশিদের পিছনে। কিলার হাউন্ডস। বডি গার্ড ওরা, মিউনিকে দেখেছিল রানা। হারাকিম আর মাহমুদ। রানাকে ভুলতে পারেনি ওরা।

'অনেক ঝড় ঝাপটা সয়ে তোমার কৌতূহল মেটাতে এসেছ, মি. রানা।' আল-রশিদ বলল।

'কৌতূহল মেটাতে আসিনি শুধু আমি,' —বলল রানা, 'হুবার্ট ডনফিল আর বনবনকে চাই।'

'ইনডিড? দাবি করছ? একা, এই অবস্থায়?'

'বনবন এখানে আছে?'

'আছে। আর আমার সহচর, হের বেলচা। মোটাসোটা কিন্তু ভারি চালাক। আমাদের জাজমেন্ট স্থগিত থাক বর্তমানে। তোমার পাগলামিও চাপা দিয়ে রাখো, কবরের ব্যবস্থা পরে হবে।'

হাউন্ড দুটো রানার দু'ধারে এসে জায়গা নিল। ছোঁয়ার সুযোগ না দিয়ে রানা পা বাড়িয়ে দিল। খিলানের ভিতর দিয়ে একটা পাথর বাঁধানো পথ। দেয়ালের ভিতর এসে দেখা গেল Djebel Kif-এর উপরটা সমতল। বিরাট একটা জায়গা নিয়ে হেলিকপ্টার ল্যান্ডিং গ্রাউন্ড। শেডের নিচে একটা টু-সীটার দাঁড়িয়ে আছে। পথের পাশেই একটা শান বাঁধানো ঘাট। পুকুরের পানি কাঁচের মত স্বচ্ছ। পুকুরের পাশে বাগান।

ড্যান্সার দু'জনার মাঝখানে থেকে স্টোন গ্যালারীর পাশ দিয়ে এগিয়ে চলেছে ও। কাঠের একটা মাচার নিচে এসে পড়ল ওরা। সূর্য অস্ত গেছে। সামনে প্রায় অন্ধকার। কাঠের বড় দরজাটা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে আবছাভাবে। নরম গলায় হেসে উঠল আল-রশিদ।

'এখানে সবাইকে আমি ওঠাই না। বিস্ময়কর মনে হচ্ছে জায়গাটাকে তোমার?'

'তোমার অমর হবার স্বপ্নের চেয়ে বেশি না।'

'কিন্তু অন্য যে কোন জায়গার চেয়ে বিস্ময়কর, স্বীকার করতে হবে তোমাকে। আমরা এখানে স্বয়ংসম্পূর্ণ। আমাদেরকে ধ্বংস করে এমন শক্তি সত্যি নেই। এটা প্রাকৃতিক দুর্গ। আমরা এর উন্নতি সাধন করে সবরকম অনুপ্রবেশের পথ বন্ধ করে দিয়েছি। প্লীজ গো ইন।'

হাউন্ড দু'জনের একজন কাঠের দরজাটা খুলে ধরল। ভিতরে ঢুকল রানা। বিস্ময়কর, তাতে কোনও সন্দেহ রইল না রানার। সিন্দাবাদের জমানার কোনও প্রাসাদের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়েছে রানা। আরব্য উপন্যাসের কিংবদন্তী জান্তব সত্য হয়ে দেখা দিয়েছে চোখের সামনে।

পাহাড়ের এবড়োখেবড়ো শৃঙ্গের নিচে মাকড়সার জালের সুতোর মত অগুনতি প্যাসেজ। নরম আলো আর ঠাণ্ডা আবহাওয়া ভিতরে। আল-রশিদ শান্তভাবে উচ্চারণ করল 'এ্যাটমিক রিয়্যাক্টর' শব্দটি। জার্মান আর ঈজিপশিয়ান টেকনিশিয়ানদের তৈরি। জমাট পাথর ভেঙে মর্জি মত মসৃণ

আকার দেয়া হয়েছে প্রকাণ্ড মাঠের মত হলঘরটাকে। দেয়ালে ব্লু আর পিঙ্ক কালারের নকশা করা শ্বেত পাথর আঁটা। নরম পারশিয়ান কার্পেটে বুট জোড়া ডুবু ডুবু হয়ে যাচ্ছে হাঁটার সময় রানার। হলের এক কোণায় একটি এলিভেটর। রানা এতটুকু নড়াচড়া করল না গার্ড দু'জন ওকে সার্চ করার সময়। জুতো জোড়ার কথা মনে পড়ল না ওদের।

এলিভেটরটাকে একমাত্র মাধ্যম মনে হলো শয়তানের বাসাবাড়ির উপর নিচে যাতায়াতের। এলিভেটর থেকে নামতেই আর এক নতুন দুনিয়ায় এসে পড়ল বলে মনে হলো রানার।

করিডর দিয়ে এগোবার পথে পাশের রুমগুলোয় কয়েকজনকে গবেষণায় মগ্ন দেখল রানা। অ্যাপ্রন পরে কাজ করছে বয়োবৃদ্ধ লোকেরা রহস্যময় ল্যাবরেটরিতে। কস্টিউম পরা ড্যান্সাররা কোমরে তলোয়ার ঝুলিয়ে সব জায়গায় চড়ে বেড়াচ্ছে দেখল রানা। তারপর হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল ও। মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে এসে মাদামোয়াজেল জুজু। রানা কথা বলে উঠল, 'এই যে?'

চেহারার পরিবর্তন হয়েছে অনেক। কিন্তু জুজুকে চিনতে অসুবিধে হলো না রানার। অক্টোবারফেস্টে নিডল ঢুকিয়েছিল এই মেয়েই। নীল ঘাগরা পরেছে জুজু। অবাক হলো রানা ওর গালে ক্ষতের দাগ দেখে। নীল চোখ জোড়া জ্বলে উঠেই মিইয়ে যেতে দেখল রানা। বলল, 'লজ্জা পাচ্ছ নাকি আমাকে চিনতে?'

বিস্মিত হয়ে তাকাল যেন জুজু। ঠোঁট ভিজিয়ে নিল। মাথা নামিয়ে অভিবাদন করল বলে মনে হলো রানার। তারপর দ্রুত পাশ কাটিয়ে চলে গেল পিছন দিকে। আল-রশিদ বলে উঠল সামনে থেকে, 'আলিডা, যাকে তুমি জুজু বলে জানো, আইন ভেঙেছে বলে সামান্য সাজা ভোগ করছে এখন। কারও সাথে কথা বলা বারণ ওর।'

মৃদু ধাক্কা খেয়ে পা বাড়িয়ে একটা মৃদু আলোকিত চেম্বারে ঢুকল রানা। সবচেয়ে আগে চোখে পড়ল সোনার সিংহাসনটা। ঝলমল করছে সিংহাসনের হাতল আর পিঠের কিনারার হীরকখণ্ডগুলো। নকশাগুলো চিনতে একটু দেরি হলো রানার। পবিত্র কোরান শরীফের বাণী খোদাই করা সিংহাসনের গায়ে।

চাকরবাকরেরা শশব্যস্ত হয়ে এগিয়ে এল আল-রশিদের আগমন ঘোষিত হবার সাথে সাথে। রানাকে সে বলল, 'বিশ্রাম?'

'সম্ভাব্য সব দেখার জন্যে এসেছি আমি।' মৃদু হেসে বলল রানা।

'কিন্তু অনেক পথ অনেক কষ্ট করে পেরিয়ে এসেছ তুমি, মি. রানা। তোমার বন্ধুরাও—নিশ্চয়ই, ওদের কথাও ভুলিনি আমরা। তবে ওরা আমাদের জন্য হার্মলেস। বাড়াবাড়ি না করলে ওদেরকে নিয়ে ঝামেলা করব না। প্রিজনার হিসেবে তুমি কিন্তু বড় ভুগেছ। চাইনি আমরা। কিন্তু ড্যান্সাররা বেহেশতের উত্তরাধিকারী হলেও ভুল করে বসে মাঝেমধ্যে। পরবর্তী জীবনে ওরা নির্ভুলভাবে কাজ করতে শিখবে। সেজন্যে ভলেব শাস্তি মত্যদণ্ড দেয়া

হয়েছে ওদের কাউকে কাউকে। মৃত্যুটাকে আমরা কোনও মূল্য দিই না মৃত্যুর পরই সুন্দর, আরামদায়ক নির্ভুল জীবন লাভ করবে সবাই। হাসতে হাসতে বরণ করেছে সবাই দণ্ড...'

'স্বইচ্ছায় মৃত্যুবরণ করেছে ওরা?'

'অফকোর্স।' অস্পষ্ট, নিষ্ঠুর হাসি দেখা দিল আল-রশিদের ঠোঁটে, 'যেমন স্বইচ্ছায় বিজ্ঞানীরা কাজ করছে। আমি যে পৃথিবী শাসন করব সেই পৃথিবীকে বশ্যতা স্বীকার করাবার জন্যে যা কিছু দরকার সব পাব আমি ওদের কাজ থেকে।'

'নির্ভয়ে কাজ করছে বিজ্ঞানীরা? নাকি তোমার ওষুধের কেরামতি...'

'কেউ কেউ ভয়ে কেউ ওষুধের প্রভাবে—স্বীকার করছি আর সামান্য সার্জারিতেও কাজ পাচ্ছি। এসো, নিজের চোখে দেখো।'

পরবর্তী একটি ঘণ্টা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখানো হলো ওকে কিছু ছোট বড় চেম্বার আর ল্যাবরেটরি। সবখানেই প্রচণ্ড ব্যস্ততা লক্ষ করল রানা। একটা রূমে পলোনারডনোচিকে চিনতে পারল রানা। আর এক জায়গায় দেখা পেল ও প্রফেসর এ্যান্টন নোভোনিক আর আলভারেজ সিনরোর। বিভিন্ন ল্যাবরেটরিতে সবাই নিজের নিজের কাজে নিবিষ্ট চিত্তে মগ্ন। ডক্টর সাদেকের নাম ধরে ডাকল রানা। ফিরেও তাকাল না সে ওর দিকে।

'তুমি এগোচ্ছ কোন একটা উদ্দেশ্যে।' রানা বলল আল-রশিদকে।

মাথা উঁচু লোকটা উত্তরে বলল, 'আমরা তৈরি।'

'ফর দ্যা এন্ড?'

'পশ্চিমীরা যাকে বলে দি এন্ড অভ দ্যা ওয়ার্ল্ড। এসো, আমাদের আলটিমেট উইপন দেখাই এবার, ইন মিনিয়েচার। ডক্টর হুবার্ট ডনফিল প্রমাণ করেছে তার যোগ্যতা।'

'তোমাকে সাহায্য করছে সে?'

'মেয়েটাকে আমাদের হাতে দেখে ওর আর কোনও উপায় নেই। সেন্টিমেন্টাল লোক, কিন্তু ব্রিলিয়ান্ট লেসার টেকনিকসে। লেসারকে তুলনাহীন অস্ত্রে রূপান্তর করে প্রতিভার পরিচয় দিয়েছে। ফ্রেঞ্চ অপটিক্যাল ম্যান ডক্টর ওকিরা মায়াশী আর লী বি রয়েছে আমাদের সাথে। কিন্তু যে লোবোটমি আমরা তৈরি করেছি তাতে সার্জারিতে পারফেক্ট রেজাল্ট পাওয়া যাচ্ছে না। লী বি কে মরতে হবে। বেলচা সাজেশন দিয়েছিল সার্জারির।'

'বেলচা,' রানা বলল, 'প্রথম থেকেই সে তোমার পার্টনার?'

'নানা কাজের পার্টনার।'

সময় খরচ হয়ে যাচ্ছে নিজস্ব খাতে। কিছু একটা দ্রুত ঘটনার প্রস্তুতি চলেছে। সুযোগ আছে? বিবেচনা করছে রানা। হাউন্ড দু'জন প্রতিটি সেকেন্ড লক্ষ্য করছে ওকে। অস্বাভাবিক কোনও সুযোগ পাবার কোনও আশা করতে পারে না ও। বনঘনের সাথে দেখা করার অনুমতি দেবে না ওকে। একার চেষ্টায় যা করার করতে হবে। একটা পোকার মত উড়ে এসে জড়িয়ে পড়েছে যেন ও মাকড়সার জালে।

প্যাসেজে ওদেরকে অনেকগুলো মেয়ে পাশ কাটিয়ে গেল। কেউ কেউ চাকরানী। ম্লান মুখ প্রত্যেকের। সেলাই করা ঠোঁট। নিষ্প্রাণ চোখের দৃষ্টি। সবই ওষুধের প্রভাবে বলে মনে করল রানা। একমাত্র জুজুরই মগজে বুদ্ধি শুদ্ধি আছে বলে মনে হলো রানার।

ভাল ঘুমুতে পারল না রানা। ব্রোকেড বিছানো নরম ডিভানে গড়াগড়ি দিয়ে কাটিয়ে দিল রাতটা। আল-রশিদের গর্বিত বক্তৃতার কথা মনে পড়ল বারবার। অপারেশন রুমে ক্ষুদ্র একটা লেসার যন্ত্র ব্যবহার হতে দেখেছে রানা। একজন বন্দীর মাথায় খুলি লাগাল কয়েকজন মাস্ক পরা সার্জেন। ব্রেন অপারেশন হয়ে গিয়েছিল রানাকে ওখানে নিয়ে যাবার আগেই। তারপর Djebel Kif-এর উন্মুক্ত সম্মুখভাগে আরও একটা লেসারগান ফিট করা দেখল রানা। গানটাকে ঘিরে কাজ করছে অনেক টেকনিশিয়ান।

'কাজ করে এটা?' জিজ্ঞেস করে রানা।

'আল্লার তরবারির মত অদৃশ্যভাবে কাজ করে। দেখা যায় না এর শিখা। কিন্তু সব অদৃশ্য করে দেবে এক পলকে। এই ধরো, দশ মিলিয়ন লোক এত দ্রুত ছাই হয়ে যাবে যে নিজেরা বুঝতে পারারও সময় পাবে না। সংখ্যা শুনে বিস্মিত হচ্ছ? কিন্তু মানুষের দাম সত্যি খুব কম। ছোট একটা পৃথিবী আমাদের, লোকসংখ্যা বড্ড বেশি। এই যুগের সবচেয়ে বিকট সমস্যা এটা। সেজন্যেই মানুষের মূল্য কমে গেছে। সরবরাহ বেশি হলে চাহিদা কমে যায়—অর্থনীতিতে আছে না? এখানেও তাই হয়েছে। আমি কম করে ফেলব মানুষের সংখ্যা।'

'ছোট একটা এ্যাটমিক বম্ব Djebel Kif-এ পড়লে কি দশা হবে?' রানা বলল, 'একটা SAS বম্বার বা রকেটই যথেষ্ট।'

'সত্যিই তাই ভাব নাকি তুমি? কিন্তু রাষ্ট্রীয় ফরমালিটি, জাতিসংঘের অধিবেশন, এমব্যাসীর মেসেজ যাওয়া এবং ফেরত আসা, এসব হতে হতে সত্যিকার সিদ্ধান্ত নিয়ে কাজে হাত দিতে কত সময় লাগতে পারে বলে অনুমান করো তুমি?'

চুপ করে গেল রানা। লোকটার কথার পিছনে অকাট্য যুক্তি আছে। এ ধরনের ব্যাপারে চরম কোন সিদ্ধান্ত নেবার আগে সরেজমিনে তদন্ত অনুষ্ঠিত হতে হবে জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে। তারপর ওয়ার্ল্ড ওপিনিয়ন, আরগুমেন্ট, চার্জ, কাউন্টার চার্জ—অনেক নাটক হবে একের পর এক।

কিন্তু রানা তা ঘটতে দিতে পারে না।

উঠে বসার খানিক পর মৃদু টোকা পড়ল দরজায়। ভিতরে আসতে বলল রানা। আলিডা—বা জুজু ব্রেকফাস্ট ট্রে নিয়ে ভিতরে পা রাখল।

রুপোর নকশা কাটা ট্রে। চিনামাটির কফি পট। পোচ আর সেদ্ধ করা ডিম, টাটকা মাখন, জেলী, পাউরুটি, আপেল আর আঙুর সাজানো ট্রেতে। জুতো জোড়ার জন্যে নিচে তাকাতে নরম মরক্কান স্লিপার দেখতে পেল রানা। জুতো জোড়া সরিয়ে ফেলা হয়েছে দেখে দমে গেল মনটা। কিন্তু বাইরে কিছু প্রকাশ করল না রানা।

'গুড মর্নিং, জুজু। নাকি এখানে তোমাকে আলিডা বলে ডাকতে হবে?'

'আলিডা আমার আসল নাম।' যন্ত্রের মত উত্তর দিল সে, 'আলিডা জোনান সেন। কিন্তু তোমার সাথে কথা বলার অনুমতি নেই আমার।'

'তুমিই দেখছি একমাত্র মেয়ে যার গতিবিধি সর্বত্র। কারণ কি?'

'প্রফেট আনন্দ পান এতে। এবার আমি যাই।'

'প্রফেট সত্যি সত্যি অমর, একথা তুমি বিশ্বাস করো?'

'উনি একটা মানুষ,' হঠাৎ বলে ফেলল আলিডা, 'আমার উপর দৈহিক অত্যাচার করে প্রমাণ করেছেন।'

রানা অন্য কথা পাড়ল, 'এদের জালে জড়িয়ে পড়লে কিভাবে তুমি?'

'আর সব মেয়েদের মতই। বিজ্ঞাপন দেখে নাচের চাকরি নিতে গিয়েছিলাম। নাচার প্রস্তাব ছিল পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে। চাকরি পেয়ে নাচলামও। তারপর দিনে দিনে ড্যান্সারদের একজন হয়ে উঠলাম।'

'এদের হাত থেকে পালাবার চেষ্টা করোনি কখনও?'

'একবার···। তোমাকে অজ্ঞান করার পর হঠাৎ চেঞ্জ হয়ে যায় আমার মন। কাগজে জেনারেল বেলচার নাম দেখতাম প্রায়ই। পালিয়ে তার অফিসে যাই ড্যান্সারদের সব কথা বলার জন্যে। কিন্তু আমার কপাল খারাপ, বেলচা এদেরই নিজের লোক। সে ফেরত আনে আবার। তারপর···আমার শত্রুকে যেন অমন অত্যাচার কখনও সইতে না হয়···পালাবার কথা এ জীবনে আমি আর ভাবতে চাই না। এবার আমি যাই।'

'আর এক মিনিট···'

'না। ওরা সব কথা শুনতে পায়।' আলিডা নিচু গলায় বলল, 'টেপরেকর্ড টেলিভিশন—সব আছে।'

'আমার জন্যে কি ব্যবস্থা নেয়া হবে তা তুমি জানো না বোধহয়?'

'তোমাকে অমানুষ বানানো হবে—ব্রেন ওয়াশ করিয়ে—সব লোকের মত। তুমি—বদলে যাবে। ওদের কাজ করবে—মেনে চলবে। প্রফেট তোমার কাছ থেকে আরও তথ্য চায়।'

'আজ?'

'কিংবা আগামীকাল। আজ ওরা খুব ব্যস্ত।'

হারাকিম আর মাহমুদ এল কুড়ি মিনিট পর।

এলিভেটরের গোল্ডেন বার্ডকেজে চড়ে Djebel Kif-এর টপ লেবেলে এসে নামল রানা। করিডরের পর একটি স্টীলের গেট। ভিতরে ডনফিলের ওয়ার্কশপ।

সাদাসিধে দেখতে জায়গাটা। কালো সাধারণ বাক্সে লম্বা ডার্ক টিউব লাগানো। পাহাড়ের গায়ের উপর ফোকর করা : খোলা ফোকরের দিকে মুখ করা সবগুলো টিউব। কামানের মত দেখতে ওগুলো। কিন্তু অস্বাভাবিক মোটা মোটা কেবল্ ফিট করা মেকানিজমে। নিচের এ্যাটমিক প্ল্যান্ট থেকে পাওয়ার আসছে বলে ধারণা করল রানা।

ডনফিল নিবিষ্ট মনে কাজ করছে। খেয়াল নেই তার কোন দিকে। পাগল

বলে মনে হলো রানার লোকটাকে। মাথার চুল, দাড়ি এলোমেলো।

'মি. ডনফিল?'

ডনফিল চমকে উঠে মুখ তুলল। ম্যাগনিফাইং গ্লাসের ভিতর দিয়ে ভুরু কুঁচকে একমুহূর্ত দেখল সে রানাকে।

তারপর চোখ থেকে সেটা খুলতে খুলতে অস্থিরভাবে একবার মাথা ঝাঁকিয়ে বলে উঠল, 'তুমি? এখানে···'

'একগুঁয়ে লোক আমি। আপনাকে অনুসরণ করে পৌঁছে গেছি।'

'তবে আর কি, বড় বীরত্বের পরিচয় দিয়েছ।' মুখ ভেংচে উঠল বৃদ্ধ বিজ্ঞানী, 'চলে যাও! দেখতে পাচ্ছ না আমি এখন ব্যস্ত?'

'কিন্তু ওরা চায় আপনার সাথে খানিক আলাপ করি আমি···' রানা থামতে বাধ্য হলো। ডনফিলের দু'জন সহকারী ব্যস্তসমস্ত ভাবে ছুটে এল হঠাৎ। হড়বড় করে জার্মান ভাষায় কি যেন বলল ওরা। একজনকে ইটালিয়ান মনে হলো রানার। অন্যজন ঈজিপশিয়ান। ডনফিল নিজের কাজে মন দিয়ে হঠাৎ মনে পড়ে যেতে ফিরে তাকাল রানার দিকে, 'এখনও দাঁড়িয়ে আছ তুমি! কিন্তু রাত নামার আগে প্রিজম ব্যালেন্স কমপ্লিট করার হুকুম দিয়েছে আমাকে! করতেই হবে।'

নিরীহভাবে জানতে চাইল রানা, 'গোলমাল হয়েছে বুঝি কোথাও?'

'সর্বনেশে ইডিয়ট ছিল আগে এখানে। কিচ্ছু জানে না। কিচ্ছু না। আর এদিকে মাত্র সামান্য সময়···'

'ট্রিগার কখন টেপা হবে?' রানা কথার পিঠে কথা পেড়ে জিজ্ঞেস করল।

'রাত নামার সাথে সাথে, বললাম না একবার! আর কি জানতে চাও তুমি?'

'প্রথমে টার্গেট কি···'

'ওখানে দেখো।' আঙুল বাড়িয়ে পাহাড়ের গায়ের পোর্টহোলটা দেখিয়ে দিয়ে নিজের কাজে মন দিল ডনফিল। লম্বা লেসার টিউবের দিকে এগিয়ে গেল রানা বাইরের জগৎ দেখবার সুযোগ পেয়ে। অন্যমনস্কভাবে টিউবটার গায়ে চাপড় মারল রানা। কত ভোল্ট বহন করতে পারে এই টিউব? এক মিলিয়ন? দশ মিলিয়ন? এ্যাটমিক জেনারেটরের সাইজটা জানা থাকলে আন্দাজ করতে পারত রানা। 'এই ডেথ রে'-এর উন্নতি সাধনে প্রধান প্রতিবন্ধক হচ্ছে পাওয়ার।

পোর্টহোল দিয়ে রানা দেখল কয়েক শ'ফুট নিচে মরুভূমি। শুরু হয়েছে অনেক দূর থেকে। তার মানে হোলের ওপাশেই পাহাড়ের শেষ না। চোখে সহ্য হয় না সূর্যের প্রখর কিরণ। ধু ধু মরুভূমিতে কেউ নেই কোথাও। নর্থ-ইস্ট এ্যাঙ্গলে ফিট করা লেসারগান। তার মানে ইসরাইলের দিকে টার্গেট করা হয়েছে। কোন্ শহরকে? তেল আবিব? জেরুজালেম? পোর্টসিটি হাইফা নয়তো? কিংবা কায়রোও হতে পারে ওদের টার্গেট।

ডনফিলের দিকে ফিরল ও। বলল, 'এদের হাতে পুতুল তাহলে আপনি,

মি. ডনফিল?'

ডনফিল আবার মুখ তুলল। আবার মাথা নাড়ল অস্থির ভাবে। বলল, 'নো ক্রিটিসিজম, হের রানা। আমার বোকামিতে শুরু হয়েছিল এটা, শেষও হবে সেভাবে। করার আর কি ছিল? ওদের কথা মত কাজ না করলে ভূত হয়ে যেতাম এতদিন। মেয়েটাও, আমিও।'

'আপনাদের দু'জনের জীবন কি লক্ষ লক্ষ জীবনের চেয়ে বেশি মূল্যবান?'

খেপে উঠল ডনফিল, 'ওসব কথা ভাবতে চাই না আমি। বেঁচে থাকতে চাওয়াটা কি স্বার্থপরতা?' ভিজে গেছে ডনফিলের মুখ ঘামে, 'চলে যাও। আই মাস্ট ফিনিশ মাই ওয়ার্ক।' হঠাৎ মিনতি ঝরে পড়ল ডনফিলের গলা দিয়ে, 'আমাকে বাঁচতে দাও! আমার মেয়েকে বাঁচতে দাও—কাজ শেষ করতে দাও আমাকে।'

'মেয়েকে বাঁচাতে পারবেন না,' তিক্ত গলায় বলল রানা, 'আমরা সবাই মরব।'

কিন্তু ওর কথা ডনফিলের কানে পৌঁছুল বলে মনে হলো না। মেশিনের উপর নুয়ে পড়েছে সে।

লেসারের টেকনিক্যাল সিস্টেম সম্পর্কে কোন জ্ঞান নেই রানার। মনে হলো ও যদি ভেঙেচুরে দিতে পারে ইন্সট্রুমেন্টগুলো, দুনিয়া তাহলে আবার স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচবে। কিন্তু সে-চেষ্টা করতে যাওয়া মানে নিশ্চিত মৃত্যু। লেসার টিউবের দিকে পা বাড়ালেই হারাকিম আর মাহমুদ পিছন থেকে ধারাল তলোয়ার পিঠে গেঁথে দেবে। প্রতিটি সেকেন্ড লক্ষ্য রাখছে ওর উপর দেয়ালের গায়ে পিঠ দিয়ে...

দেয়াল!

দেয়ালের ওপাশে পাহাড়। দেয়াল ছাড়িয়ে পনেরো বিশ ফিট উঁচু মাত্র। দেয়াল টপকাতে পারলে পালানো সম্ভব?

দেয়ালের গায়ে ভারী একটা দরজা। হাতে পেটা লোহার পাত দরজাটার। কাঠের কপাট দুটোয় স্ক্রু দিয়ে আঁটা। তালা ঝুলছে প্রকাণ্ড একটা। যুগ যুগ ধরে খোলা হয়নি তালাটা অনুমান করল রানা।

হাতের কাজ শেষ করতে হবে বৃদ্ধকে রাতের আগে। তার মানে আর আট ঘণ্টা মাত্র সময়। এখানে আবার আসার সুযোগ পাবে না রানা। কিছু একটা ঘটাতে হবে।

যা করার করতে হবে এখনই। যে কোন উপায়ে। যে কোন মূল্যে।

বেল বাজার গুঞ্জনধ্বনি শোনা গেল। তৈরি হয়ে গিয়েছিল রানা। কিন্তু সামলে নিল নিজেকে ও।

হারাকিম আর মাহমুদ ফিসফিস করে বুক টান করে দাঁড়াল। জার্মান আর ইটালিয়ান টেকনিশিয়ান দু'জন তাকাল পরস্পরের দিকে। পাণ্ডুর হয়ে গেছে দু'জনার মুখ। পরমুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়ল নিজের কাজে।

আল-রশিদ দরজা দিয়ে ঢুকল। পিছনে বিরাট বপু নিয়ে বেলচা।

হাতের নতুন ছড়িটা রানার দিকে তুলে খিক খিক করে হাসল বেলচা। কেঁপে কেঁপে উঠল তার বিকট ভুঁড়ি। হলুদ চোখ জোড়ায় কৌতুক। বলল, 'হের রানা, কৌতূহল মিটেছে তো? শিখেছ অনেক কিছু?'

রানা বলল, 'আমাকে শিক্ষা দান করার জন্যে এত স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে নাকি?'

'হ্যাঁ,' আল-রশিদ হালকাভাবে বলল, 'কিন্তু স্বাধীনতা তোমাকে অনেক দেরিতে দেয়া হয়েছে। হের বেলচা সব তথ্য দিয়েছেন, যা কিনা তোমার কাছ থেকে আমি আশা করছিলাম।'

'তাহলে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

কিন্তু উত্তরটা জেনে ফেলেছে রানা। ওদের চোখ মুখেই লেখা দেখতে পেল উত্তর রানা। আল-রশিদ ইশারা করল হারাকিম আর মাহমুদকে। তারপর শান্তভাবে নির্দেশ দিল, 'ফেড়ে ফেলো ওকে।'

এগারো

কিছুই হয়তো না। হয়তো ওর প্রতিক্রিয়া লক্ষ করে মজা করার ইচ্ছে হয়েছে আল-রশিদের।

কিন্তু অপেক্ষা করে শেষ মুহূর্তটি দেখার সুযোগ নিতে পারে না রানা। একটা মাত্র উপায় দেখল ও। নিতম্ব দিয়ে লাইট গানের 'মাজলে' সজোরে ধাক্কা মারতে আধা চক্কর খেয়ে ধাক্কা মারল সেটা হারাকিমকে। পড়ে গেল সে। মাহমুদ ছিল ডান দিকে। রানা আন্দাজে ঘুরে দাঁড়িয়ে পা চালাল সবেগে।

জুতো নেই রানার পায়ে। কিন্তু মাহমুদের তলপেটে লাথিটা গিয়ে লাগল। কুঁজো হয়ে পেট চেপে ধরে দু'পা এগিয়ে এল সে যন্ত্রণায় গড়াতে গড়াতে। লাফ মেরে সরে গেল রানা। হারাকিম উঠে দাঁড়াল মাথার উপর তলোয়ার উঁচিয়ে রানার দিকে মুখ করে। হাত লম্বা করে সামনের দিকে তলোয়ার চালাল সে।

সে-সময় মাথা উঁচু করে সিধে হয়ে রানার আর হারাকিমের মাঝখানে দাঁড়াল মাহমুদ। থাপ্ করে বিচ্ছিরি একটা শব্দ শুনল রানা গলার চামড়া, মাংস, হাড় ভেদ করে ক্ষুরের মত ধারাল তলোয়ার বেরিয়ে আসার সাথে সাথে। রক্ত ঝর্ণার পানির মত হুহু করে উঠে এল উপর পানে, কাটা গলা থেকে মাথাটা মেঝেতে ঠকাস করে পড়তেই। ধপাস করে পড়ল তারপর ধড়টা। মুণ্ডুটা পড়েই গড়িয়ে গেল খানিকটা। ঠিকরে বেরিয়ে আসছে চোখ দুটো। আল-রশিদের দিকে মুখ করে থামল সেটা।

মেঘের ডাক শোনা গেল হারাকিমের গলা থেকে। নিজের হাতে মাহমুদের এই দশা করেছে তা যেন অস্বীকার করে চেঁচিয়ে উঠল সে।

উন্মাদের মত দ্বিখণ্ডিত মুণ্ডুটার দিকে পা বাড়াল হারাকিম। দেয়ালের কাছে মুণ্ডুটা।

চিন্তা করার সময় নেই রানার। শুনতে পাচ্ছে ও আল-রশিদের চিৎকার। এক লাফে হারাকিমের পিছনে চলে এল ও। হারাকিমের দুই পা ডান হাতের বেড় দিয়ে নিয়ে উঁচু করে ধরল। বাঁ হাতটা লোকটার বুকের কাছে রাখল রানা। শূন্যে সমান্তরাল ভাবে তুলে পোর্টহোলে গলিয়ে দিল মাথাটা। তারপর জোরে একটা ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল বাইরের দিকে।

পতনশীল হারাকিমের আর্তচিৎকার দ্রুত মিলিয়ে গেল।

এতগুলো কাণ্ড ঘটতে সময় লাগে দশ সেকেন্ডের কম।

কিন্তু আল-রশিদ বিদ্যুৎবেগে পৌঁছে গেছে দেয়ালের সুইচ বোর্ডের কাছে। আঁতকে উঠে চেঁচিয়ে উঠল রানা, 'ডোন্ট!'

আল-রশিদ চমকে উঠল রানার বাজখাঁই কণ্ঠস্বর শুনে এক মুহূর্তের জন্যে।

আল-রশিদ বুঝতে না পারলেও রানার ভুল বোঝার সুযোগটা বেলচা নিল সাথে সাথে। দেয়ালের একটা সুইচে হাত দিয়ে সে বলে উঠল, 'লেসারগানের সুইচ, টিপছি আমি।'

অবাক হলো রানা। লোকটার কি মাথা খারাপ?

লেসারগানটার মুখ ঘুরিয়ে দিয়েছে রানা বেলচার দিকে। বীম লাগলে বেলচার গায়েই আগে লাগবে। কিন্তু সেদিকে খেয়াল নেই বেলচার। রানাকে হুমকি দিচ্ছে সে সুইচ টেপার।

দ্রুত চিন্তা স্রোত বইছে রানার মাথায়। কোথাও কোন ভুল বোঝাবুঝি চলছে।

হঠাৎ রহস্যটা পরিষ্কার হয়ে গেল। টিউবটার দিকে চোখ পড়তেই ট্রিগারটার দিকে চোখ গেল ওর।

আস্তে করে ডাকল রানা, 'মি. ডনফিল?'

'ই-ইয়েস…?'

'কাজ করে এটা?'

'ই-ইয়েস্, হের রানা, বাট…'

রানা পেয়ে গেছে আসল চাবি। টিউবটার মুখ প্রাচীন দরজাটার দিকে করল ও। তারপর চাপ দিল…

কিছুই ঘটল না।

কোন শব্দ নেই, কোনও চোখ ঝলসানো আলো নেই, কোন বিস্ফোরণ নেই…

অকস্মাৎ লোহার পাতসহ ভারী দরজাটা শুধু চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখল রানা।

উত্তাপের অদৃশ্য স্পর্শ অনুভব করা গেল শুধু। মৃদু গুঞ্জনধ্বনি কানে ঢুকল। তারপর অবিরাম শব্দ পাথর খসে পড়ার। ধুলোয় ভরে গেল জায়গাটা। আল-রশিদের বাদশাহী পোশাকে আগুন ধরে গেছে দেখল রানা। বেলচা আর

সে আগুন নেভাতে ব্যস্ত। যেখানে দরজাটা ছিল সেখানে এখন গোল সুড়ঙ্গ একটা। পাথরের টুকরো পড়ছে এখনও সুড়ঙ্গের ভিতর। অন্ধকার ওত্ পেতে আছে ভিতরে। তা সত্ত্বেও বহুদূরে, সুড়ঙ্গের শেষ মাথায় আলোর আভাস। লেসারবীম পাথর ভেদ করে বেরিয়ে গেছে Djebel Kif-এর বাইরে।

'মি. ডনফিল?' রানা ডাকল।

'পাগল…! কি করেছ তুমি…?'

আগুন নেভাতে হিমশিম খাচ্ছে ওরা। ওয়ার্নিং বেল বাজছে অদূরেই। ছুটে আসছে ড্যান্সাররা। হত্যা করার কোনও শখ জাগল না রানার মনে। লেসারগান ব্যবহার করতে যাওয়াটা ওর পক্ষে বোকামি। ট্রিগার ছেড়ে দিয়ে ডনফিলের একটা বাহু ধরে সুড়ঙ্গের দিকে দৌড়ুল রানা।

অন্ধকার সুড়ঙ্গ। উপর পানে বহু দূরে দেখা যাচ্ছে গোল আলোর আভাস। ক্রমশ উঁচু হয়ে গেছে সুড়ঙ্গটা। রানার মনে পড়ল টিউবের লক্ষ্য স্থির করেছিল সামান্য একটু মুখ উঁচু করে।

অপর প্রান্তে পৌঁছুতে এখনও অর্ধেক পথ বাকি। বেলচার কণ্ঠস্বর পিছন থেকে ভেসে আসছে। কোথায় যাওয়া যায়? উপর দিকে গিয়ে লাভ হবে না কোন। পাহাড়ের গায়ে সুড়ঙ্গ মুখ। নিচে নামার কোনও পথ পাবার সম্ভাবনা খুব কম। সুড়ঙ্গ থেকে বের হবার জন্যে চঞ্চল হয়ে উঠল রানা।

ড্যান্সাররা দেখে ফেলেছে ওদেরকে। ওদের উল্লসিত চিৎকার কানে আসছে রানার। হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি চলছে এখনও।

আরও খানিকটা এগোবার পর ডান দিকে সিঁড়ি পাওয়া গেল। বাঁয়ের সিঁড়িগুলো নেমে গেছে নিচের দিকে। ওয়ার্নিং বেলের শব্দ উঠে আসছে নিচ থেকে। লেসারবীম সিঁড়ির মাঝখান দিয়ে চলে গেছে। উপর দিকে ওঠার জন্যে ডান দিকের সিঁড়ি বেছে নিল রানা। সিঁড়ির ধাপে পা রাখতেই পিছন থেকে টর্চের আলো এসে লাগল গায়ে। স্টেনগানের আওয়াজ শুনে বিড়বিড় করে কি যেন বলল ডনফিল।

উপরে উঠে টানেলের মত একটা করিডরের উপর দিয়ে ছুটল রানা। বাঁ দিকে চলে গেছে করিডরটা। তারপর ডানে মোড় নিল ওরা। দু'পাশে বন্ধ সেল। সামনে মৃদু আলো দেখা যাচ্ছে। সেদিকে পা বাড়াতে গিয়েও থমকে গেল রানা। ড্যান্সাররা বোধহয় দু'দিক দিয়েই ছুটে আসছে।

তার মানে ফাঁদে পড়ে গেছে ওরা। ধরা পড়তে হলে একটা কাজ ওকে করতেই হবে। ডনফিলের দিকে তাকাল ও। মরতে হবে বুড়োকে।

ধরা পড়ার আগেই কাজটা করতে হবে রানার। চোখ ফিরিয়ে নিল রানা। কিন্তু ডনফিল হয়তো বুঝে ফেলেছে রানার মনের কথা। অস্ফুটে কথা বলে উঠল ডনফিল, 'আমি সাহায্য করতে পারি। এই কর্নারে কোনও বেরুবার রাস্তা নেই। সামনে খানিকটা গেলে একটা দরজা আছে। রুমগুলোর ওপাশে একটা ঝর্ণা পাওয়া যাবে। পরশুদিন দেখলাম আমি।'

রুমের দরজা বন্ধ দেখল রানা। খানিকটা পিছিয়ে গিয়ে কাঁধ দিয়ে ধাক্কা মারল ছুটে গিয়ে। তারপর চার-পাঁচবার চেষ্টা করার পর ভেঙে পড়ল কবাট

দুটো।

রুম একটা নয়। একটার পর একটা পাথরের রুম পেরিয়ে পৌঁছুল ওরা একটা করিডরে।

করিডরের শেষ প্রান্তে অমসৃণ পাথর। রানা দেখল একটা দশ হাতি লম্বা ঝর্ণা থেকে হুহু করে পানি গড়িয়ে পাথরের উপর দিয়ে নিচে নেমে যাচ্ছে। খানিকটা দূরেই অনেক পানি।

'সাঁতার জানেন?'

'চে-চেষ্টা করব।'

ডনফিলকে তুলে নিয়ে আস্তে আস্তে পানিতে নামিয়ে দিল রানা। তারপর নিজে নামল।

সামনের দিকটা ক্রমশ অন্ধকার হয়ে আসছে। পাহাড়ের প্রকাণ্ড একটা গহ্বরের ভিতর এই ঝর্ণা। কোথায় যাচ্ছে কোনও ধারণা নেই রানার। হঠাৎ পানির সাথে ভাসতে ভাসতে পাঁচশো বা হাজার ফুট নিচের খাদে পড়বে না তো দু'জন?

ছ্যাৎ করে উঠল বুকের ভিতর।

প্রচণ্ড হাঁ করে গিলতে আসছে যেন পাহাড়ের সুড়ঙ্গটা। তিনমানুষ উঁচু দু'মানুষ লম্বা হবে মুখটা। ঝর্ণার পানি কুল কুল শব্দে সেটার ভিতর ঢুকছে। ভিতরে গাঢ় অন্ধকার। ডনফিলকে ধরে ফেলে একটা পাথরের দিকে সাঁতরে গেল রানা।

'এই গর্তের ভিতর দিয়ে পানি কোন্‌দিকে গেছে জানেন?'

'না। এদিকে কখনও...' গুলির শব্দ শুনে চুপ মেরে গেল ডনফিল।

'বাঁচতে হলে রিস্ক নিতে হবে। আমার পিছন পিছন আসবেন আপনি। সতর্ক থাকবেন।'

এই ধরনের গহ্বর সম্পর্কে ধারণা আছে রানার। হয়তো কয়েক মাইল পর্যন্ত মোড় নিয়ে চলে গেছে কোন সাগর বা সমুদ্রের দিকে। কিংবা হঠাৎ শেষ হয়ে গেছে পাহাড়ের গায়ে কোথাও। কয়েকশো ফুট নিয়ে পানি পড়ছে পাহাড়ের খাড়া গা বেয়ে।

অন্ধকারে দৃষ্টি চলে না। ডনফিলের শব্দ পাচ্ছে রানা পিছনে। খানিক দূর গিয়ে হাত ঠেকাল পাহাড়ের গায়ে। সামনে পথ নেই। পানির স্রোত অনুভব করল রানা। মোড় নিল বাঁ দিকে। ডনফিলকে বলল, 'বাঁয়ে আছি আমি।'

বিপদের গুরুত্ব বুঝতে পারল রানা। নিজেই হাঁপিয়ে যাচ্ছে এবার সে। পনেরো মিনিটের মত কেটে গেছে। ডনফিল আর পারছে না। কোন রকমে মাথাটা উঁচিয়ে রেখেছে শুধু।

আবার মোড় সামনে। ডনফিলকে ছেড়ে সাঁতরে এগিয়ে গেল রানা। প্রখর সূর্যের আলোয় প্রথমে কিছুই দেখতে পেল না রানা।

শেষ পর্যন্ত চিনতে পারল। Djebel Kif -এর পুকুর আগেও দেখেছে ও।

ডনফিলকে নিয়ে সাঁতার কেটে তীরে এসে উঠতেই বাগান থেকে একটি মূর্তিকে ছুটে আসতে দেখল রানা। লাল ঘাগরা দেখে মেয়ে বলে ধরে নিল

রানা। উপুড় হয়ে হাঁ করে হাঁপাচ্ছে ডনফিল। মেয়েটির দিকে আবার তাকাল রানা। চেনা যাচ্ছে এবার। হাত নাড়ছে মাদামোয়াজেল জুজু রানার উদ্দেশে।

ফর্সা মুখে বিস্ময় আর ভীতি ফুটে উঠল জুজু ওরফে আলিডার।

রানা বলল, মি. ডনফিলকে ধরো।'

'কিন্তু··· কিন্তু কোথায়?' পিছিয়ে গেল আলিডা এক পা, এদিক ওদিকে তাকাল ঠোঁট ফাঁক করে, ওঁকে নিয়ে এসেছ কেন, রানা? ওঁকে···খুন করবে তুমি?'

রানা যা ভেবেছিল তার চেয়ে বুদ্ধিমতী আলিডা। রানা বলল, 'আস্তে কথা বলো।'

'সত্যি তাহলে?'

'ধরা পড়বার মুখে তাই করব আমি। আর ধরা না পড়াটা তোমার উপর নির্ভর করে।'

'আমি সাহায্য করতে পারি না। ওরা তোমাকে হন্যে হয়ে খুঁজছে উপরে।'···ভয়ে বিকৃত দেখাচ্ছে আলিডার সুন্দর মুখ, 'জলদি, এদিকে এসো।' ও ডনফিলকে ধরার জন্যে এগিয়ে এল।

দু'জন মিলে দাঁড় করাল ডনফিলকে। ডনফিল বিড় বিড় করে বলল, 'ছেড়ে দাও। আমি হাঁটতে পারব।'

দ্রুত নিঃশব্দ পায়ে হেলিকপ্টার ল্যান্ডিংয়ের কাছে এসে দাঁড়াল রানা। বন্য জন্তুর মত চারদিকে তাকাচ্ছে আলিডা।

'রানা, পালাতে তোমরা পারবে না, বিশ্বাস করো···'

'তোমার ইচ্ছা হচ্ছে না পালাতে?'

'একটা মাত্র পথ আছে বেরুবার। মেশিনগান নিয়ে পাহারা দিচ্ছে গার্ডরা চব্বিশ ঘণ্টা।'

'আর কোনও পথ নেই?'

'না।' সবেগে মাথা নাড়ল আলিডা, 'কিভাবে তোমরা ঝর্ণার পানি থেকে পুকুরে এলে জানি না। ঝর্ণার কাছে রাতদিন গার্ড থাকে। হয় ওরা উপরে চলে গেছে তোমাকে খোঁজার জন্যে, নয়তো···' হঠাৎ কি মনে পড়ে যেতে চুপ করে গেল আলিডা। তারপর বলল, 'রানা। একটা উপায় আছে—কিন্তু! না, অসম্ভব। খাড়া পাহাড়ের গা বেয়ে নামা কোনও মানুষের পক্ষে সম্ভব না।'

'আমি যাব না।' ডনফিল কথা বলে উঠল, 'আমার বনবন মরলে আমিও মরতে ভয় পাই না···'

রানা কিছু বলার আগেই আলিডা বলে উঠল, 'তাছাড়া Djebel Kif থেকে আজ পর্যন্ত কেউ পালাতে পারেনি, রানা! আশা ছেড়ে দাও তুমি···'

রানা ওকে কথা শেষ করতে না দিয়ে বলে উঠল, 'বনবনকে কোথায় রেখেছে জানো তুমি?'

'হ্যাঁ···হ্যাঁ, জানি।'

'আনতে পারবে ওকে?'

ইতস্তত করল আলিডা, 'ঠিক জানি না। চেষ্টা করতে পারি।'

'তবে যাও, আলিডা। আমরা করিডরের আড়ালে অপেক্ষা করব তোমার জন্যে। দড়ি এনো, পারলে।'

'না না। কোনও কথা দিতে পারছি না আমি। যদি না ফিরতে পারি? তোমরা বরং করিডরের শেষ মাথায় গিয়ে পাঁচিল টপকে নিচে নেমে যাও এখুনি। নিচে নেমেই পাহাড়ের খাদ দেখতে পাবে। ওখান থেকে নামা অসম্ভব। যদি পারো তাহলে পাহাড়ের নিচে পৌঁছে যাবে,'—চলে গেল আলিডা ত্রস্ত পদক্ষেপে।

করিডর দিয়ে দ্রুত পায়ে পাঁচিলের সামনে এল ডনফিলকে নিয়ে রানা। দেড় মানুষ সমান উঁচু পাঁচিল। লাফ মেরে দেয়ালের মাথা ধরে ফেলল রানা। তারপর উঠে পড়ল উপরে। ডনফিল কাঁপা কাঁপা দুটো হাত উঠিয়ে দিল উপর দিকে।

পদশব্দ শোনা যাচ্ছে অদূরেই। হেঁচকা টানে তুলে ফেলল ডনফিলকে রানা পাঁচিলের উপর। নামিয়ে দেবার সময়ও তাই করল। নিচের পাথর থেকে খানিকটা দূরে থাকতেই ছেড়ে দিল ডনফিলের হাত। ব্যথায় কাত্‌রে উঠল সে। পাশে নামল রানা। ডনফিলের দিকে খেয়াল নেই ওর। পদশব্দ থেমে গেছে অদূরে।

গার্ড হঠাৎ এদিকে এল কেন? আলিডা কি ধরা পড়েছে? কিংবা ঠকিয়েছে রানাকে?

আবার পদশব্দ পাওয়া গেল। ফিরে যাচ্ছে বলে মনে হলো ওর। দ্রুত চিন্তা করছিল রানা। পাঁচিল টপকাতে হবে ওকে আবার। বনবনকে যদি আলিডা নিয়ে আসতে পারে তাহলে পাঁচিলে ওঠাবে কে? টু-সীটার 'কপ্টারটা দেখে আসা দরকার।

ডনফিল পালাতে পারবে না এখান থেকে। নির্ঘাত মরবে সে চেষ্টা করলে। দশ হাত দূরেই খাড়া নেমে গেছে পাহাড়ের গা। দু'পাশে পাহাড়ের উঁচু নিচু ফাঁদ।

'আপনি চুপ করে শুয়ে থাকুন এখানে। নড়াচড়া করবেন না। আমি বনবনকে নিয়ে ফিরব।'

কথাটা বলে উত্তরের অপেক্ষা না করেই পাঁচিলে উঠে বসল রানা। করিডরে কাউকে দেখা যাচ্ছে না। নিঃশব্দে নামল রানা। খালি পায়ে দৌড়াচ্ছে বলে কোন শব্দও উঠল না। হেলিকপ্টার ল্যান্ডিংয়ের কাছে এসে একটা পিলারের গায়ে গা ঢাকা দিয়ে একমিনিট দাঁড়িয়ে রইল রানা। কেউ নেই চারপাশে। বহুদূরের হৈ-হল্লার শব্দ অস্পষ্টভাবে কানে বাজছে। টু-সীটারটা নেট দিয়ে ঘেরা দেখল রানা। এগিয়ে গেল ও।

করিডর থেকে 'কপ্টারটা শ'খানেক গজ দূরে। আধাআধি পৌঁছুবার পর দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। করিডরের মোড় ঘুরে একজন গার্ড আসছে এদিকে লেফ্‌ট রাইট করে পা ফেলে। লোকটার হাতে খোলা তলোয়ার রয়েছে বলে

অনুমান করল রানা। নিঃশব্দ পায়ে ফাঁকা জায়গাটা থেকে ফেরত এল ও করিডরের পিলারের আড়ালে। ওকে দেখতে পায়নি। রুমগুলোর বন্ধ দরজার দিকে মুখ করে পিছু হেঁটে ক্রমশ এগিয়ে আসছে সে রানার দিকে।

হেসে ফেলল রানা নিঃশব্দে। লোকটা অতিরিক্ত সতর্ক।

হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে পড়ল লোকটা। চট্ করে পিলারের আড়ালে মাথাটা সরিয়ে নিল রানা। দেখে ফেলছে কিনা বুঝতে পারল না ও। জুতোর শব্দ শোনা যাচ্ছে, কিন্তু খুব আস্তে। বোধহয় লক্ষ করেনি ওকে। একপা একপা করেই আসছে।

পিলারের গা ঘেঁষে করিডরের শেষ প্রান্তের দিকে চলে গেল লোকটা।

এখন যদি আলিডা আর বনবন এদিকে এসে পড়ে?

কথাটা মনে হতে করিডরের মোড়ের দিকে মাথা বের করে তাকাতেই রশি হাতে আলিডাকে দেখতে পেল রানা। বনবনকে তাহলে আনতে পারেনি? কিন্তু তারপরই আলিডার পিছনে বনবনকে দেখল রানা। চতুর মেয়ে আলিডা। গার্ডটাকে দেখতে পেয়েই একটা পিলারের আড়ালে লুকিয়ে পড়েছে ও। কিন্তু বনবন লুকোবার আগেই ধরা পড়ে গেল গার্ডের চোখে।

বিস্ময়ে প্রথমে দাঁড়িয়েই রইল গার্ডটা। বনবনকে সে একা মনে করেছে। চেঁচিয়ে উঠতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল সে। সাহায্যের দরকার নেই তার। বনবনকে ধরার কৃতিত্ব একা পেতে চায় সে।

রানা ওত্ পেতেই ছিল। গার্ডটা ওকে ছাড়িয়ে দু'পা এগোতেই পিলারের আড়াল থেকে বেরিয়ে লাফ মারল ও। কারাতের কোপটা ঘাড়েই পড়ল গার্ডের। টু-শব্দ করার অবকাশও পেল না। হাঁটু ভেঙে করিডরের উপর এলিয়ে পড়ল। অচেতন দেহটাকে পিলারের আড়ালে রাখল রানা। তারপর ডাকল আস্তে করে, 'আলিডা।'

পাঁচিলের উপর আগে রানা উঠল।

আলিডার হাত থেকে রশি নিয়ে নিচের দিকে ঝুলিয়ে দিল ও।

'এক মিনিট,'—আলিডা বলল, 'রানা, শেষবার ভাল করে ভেবে দেখো। আমরা নিচে নামতে পারব কিনা জানি না। কেউ কোনদিন নামতে পারেনি। যদি পারি তাতেও বিশেষ লাভ নেই। মাইলের পর মাইল মরুভূমিতে কোথায় যাব আমরা?'

'আগের সমস্যা আগে সমাধান করি,'—রানা বলল, 'তারপর পরেরগুলো ভাবব।'

ওরা ডনফিলকে আগে পাঠাল। রানা তার হাতে রশি ধরিয়ে দিয়ে বলল, 'বাঁচার প্রতিজ্ঞা করুন, ডক্টর, নিচের দিকে ভুলেও তাকাবেন না। মনে করবেন দশ-পনেরো ফিট মাত্র নামতে হবে আপনাকে।'

রশি ধরে ঝুলে পড়তে না পড়তে পনেরো বিশ ফিট নেমে গেল ডনফিল পিছলে। তারপর মুঠোর ভিতর শক্ত করে ধরল সে রশি। প্রায় খাড়া নেমে গেছে পাহাড়ের গা। পাথরের উপর গা ঠেকিয়ে শক্ত করে রশি চেপে ধরে উপর পানে মুখ তুলে তাকাল ডনফিল। অসহায় আর্তি ফুটে বেরুচ্ছে চোখ

থেকে।

নিঃশ্বাস বন্ধ করে অপেক্ষা করে রইল রানা। কোথাও কোন শব্দ হচ্ছে না। বনবন ওর বাবার কাছে পৌঁছুবার আগেই আলিডাকে ইঙ্গিত করল রানা নামতে।

আলিডা সাবলীল ভাবে নেমে যেতে শুরু করল। রশির ফাঁসটা ভারী পাথরের গায়ে পরিয়ে দিল রানা। আকাশের দিকে তাকাল ও। হলুদ হয়ে উঠেছে আকাশ। একটা শকুন নিঃসঙ্গভাবে ঘুরছে উপরে। ঝুলে পড়ল রানা রশি ধরে।

ফুলে ওঠা পাহাড়ের গা বেয়ে পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন ফুট নামার পর শুরু হলো আসল দুঃস্বপ্ন।

বনবন প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার কাজে মিডল ইস্টের পাহাড়ে পাহাড়ে অনেকদিন কাটিয়েছে। আলিডার জন্মই পাহাড়ের দেশে। ডনফিল একেবারেই অনভ্যস্ত এ ধরনের সংগ্রামে। প্রতিটি ইঞ্চি গড়ানে পাহাড়ের গা অতিক্রম করেছে সে পূর্ব প্রস্তুতি নিয়ে। হাত থেকে রশি পিছলে যাবার আশঙ্কায় জর্জরিত হচ্ছে সে প্রতিটি সেকেন্ড। ফুলে ওঠা গা বেয়ে খানিকটা নেমেই ডনফিল দেখল খাড়া নেমে গেছে পাহাড় চল্লিশ ফুটের মত। উপর পানে ছলছল চোখে তাকাল সে, 'আর পারা গেল না।' গাল বেয়ে পানি গড়িয়ে পড়ছে তার, 'আমার বনবনকে নিয়ে যাও, হের রানা। আমি ভয় পাচ্ছি না...'

'পারতে হবে আপনাকে।' রানা জোরে বলল, 'অপেক্ষা করুন। আমি আসছি।'

আলিডার পায়ের পাশ দিয়ে নামার চেষ্টা করল রানা। রশিটা ঢুকে গেছে আলিডার শরীরের আর পাহাড়ের গায়ের মাঝখানে। হাতড়ে হাতড়ে সেটা বের করল রানা। এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে নেমে এল ও আলিডার নিচে। তারপর একই ভাবে বনবনকে পাশ কাটাল ও। ডনফিলের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রানা বলল, 'আপনি চোখ বন্ধ করে আস্তে আস্তে হাত ঢিলে করুন। আপনার অ্যাপ্রন ধরে আছি আমি একহাতে।'

কিন্তু রানার কথা শেষ হবার সাথে সাথে অনেক বেশি মুঠো ঢিলে করায় সবেগে নেমে যেতে শুরু করল ডনফিল। আঁতকে উঠে চেঁচিয়ে উঠল বনবন। রানাও প্রাণপণ প্রয়াসে ব্যালেন্স রক্ষা করার সাথে সাথে নেমে যাচ্ছে ডনফিলের সাথে।

চল্লিশ ফুট নামতে কয়েক সেকেন্ড মাত্র লাগল। সামনে ঢালু গা পাহাড়ের। ডনফিলকে ছেড়ে দিয়ে উপর পানে তাকাল রানা। টপ করে এক ফোঁটা পানি পড়ল রানার নাকে। বনবন আস্তিনে চোখ মুছে নেমে আসতে শুরু করল।

পাহাড়ের গা ঢালু হয়ে চলে গেছে অনেক দূর। কিনারায় পৌঁছে আবার উপর পানে তাকাল ডনফিল। রানা এবার ডনফিলকে ছাড়িয়ে খানিকটা নেমে গেল। রশি বেয়ে উপরে উঠল ও আবার একটু।

ডনফিল পায়ে খোঁচা খেয়ে নিচের দিকে তাকাল। রানা নিচু গলায় বলল, 'কোন শব্দ যেন না হয়। আট দশ হাত নিচে পাহাড়ের গা ঘেঁষে একটা রাস্তা আছে। ওখানে নামতে পারলে একটা উপায় হবে বলে মনে করি। আস্তে আস্তে নেমে আসুন।'

রানা সকলের আগে নামল নিচে। পাহাড়ের গা ভেঙে পথটা তৈরি করা হচ্ছিল। কিন্তু এখানেই থেমে গিয়েছিল পাথর ভাঙার কাজ। পথটা বাঁ দিক দিয়ে এসেছে। কিন্তু আর এগোয়নি। পাহাড় মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে বিপরীত দিকে। বেশ চওড়া পথ। ঢাকার নওয়াবপুর রোডের চেয়ে কম নয় চওড়ায়। ওপাশে মরুভূমি।

Djebel Kif-এর আধাআধি উঁচুতে এখনও ওরা। ছাগল-ভেড়া চলাচলের সরু পথটা চিনতে পারল রানা। খাঁ খাঁ করছে সুদূর বিস্তৃত মরুভূমি। হলুদ হয়ে উঠেছে আকাশ। মেঘের চিহ্ন নেই। সেই শকুনটাকে আবারও দেখতে পেল রানা।

পা পুড়ে যাচ্ছে গরম পাথরে। উঠে দাঁড়াল বনবন, আলিডা। পথের উপর বসে পড়েছিল ওরা পাহাড়ের গায়ে হেলান দিয়ে। রানা কি যেন বলতে গিয়ে চুপ করে গেল গুলির শব্দ শুনে।

হাঁটতে পারবে না ডনফিল। বনবন আর রানা ধরল দু'পাশ থেকে তাকে। রানা আলিডাকে জিজ্ঞেস করল সোজা পথটার দিকে চোখ রেখে, 'কোথায় গেছে এই রাস্তা?'

উত্তর দিল না আলিডা। কান পেতে কিছুক্ষণ শুনল ও।

বিপদ বুঝতে পারল রানা। ড্যান্সাররা চেঁচাচ্ছে। ডনফিল গায়ের ভার সবটুকু চাপিয়ে দিয়েছে রানার কাঁধে। হৈ-হল্লার শব্দ আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে। দূরে মেশিনগান ঠা ঠা করে উঠল। প্রতিধ্বনি উঠল পাহাড়ের গহ্বরে গহ্বরে। তারপরই আড়াল থেকে দেখতে পেল রানা লাফিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে আসছে পঁচিশ তিরিশ জন মূর্তিমান শয়তান খোলা তলোয়ার হাতে।

পাশে পাহাড়ের বাধা। আর একপাশে শত শত ফিট খাদ। পিছনে পাহাড়ের গা। সামনে মৃত্যু।

পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইল রানা একমুহূর্ত।

বনবনের দিকে না তাকিয়ে ঠেলে দিল ডনফিলকে রানা। উন্মাদের মত হয়ে উঠেছে চোখ দুটো ওর। রোদ-মাখা একটা পাথর তুলে নিয়ে পথের মাঝখানে চলে এল ও। বুক টান করে দাঁড়াল মাঝখানে।

বনবন, ডনফিল আর আলিডা পাহাড়ের গায়ে সেঁটে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটু পিছনে। তাকাল না রানা। আল-রশিদ সবচেয়ে আগে। বিশ পঁচিশ গজ পিছনে ড্যান্সাররা। দেখতে পায়নি ওদের। ডানা উড়িয়ে যেন ছুটে আসছে প্রকাণ্ড দেহটা সেলিম আল-রশিদের। হাতে তলোয়ার। রানার প্রতিটি নার্ভ আর পেশী চরম একটা বিপর্যয়ের জন্যে সতর্ক হয়ে উঠেছে। আল-রশিদের এগিয়ে আসা লক্ষ করা ছাড়া সব ভুলে গেছে রানা। লোকটার মুখ এখন পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। গালের একটা দিক পুড়ে গেছে ভয়াবহভাবে। কুৎসিত

দেখাচ্ছে।

এক পা সামনে বাড়ল রানা। হাতের থাবার গরম পাথরটা ধরে রাখতে কষ্ট হচ্ছে ওর।

এগিয়ে আসছে আল-রশিদ। দুই সেকেন্ডের ব্যাপার আর।

পাথর ধরা হাতটা উপরে তুলল রানা। বিদ্যুৎবেগে পাথরটা ছুঁড়ে দিল ও।

সংঘর্ষটা হলো চরম একটা পরিণতির পূর্বাভাস দিয়ে। দু'জনেই মৃত্যুর দোরগোড়ায় পৌছে গেছে। সর্বশক্তি দিয়ে পাথরটা মাত্র দু'হাত দূর থেকে আল-রশিদের কপালে ছুঁড়ে মেরেছে রানা। ব্যর্থ হবার কোন প্রশ্ন ওঠে না। এক পলকের জন্যে দেখেছে ও পাথরটা গিয়ে কপালে লাগল। তারপরই ধাক্কাটা খেল রানা।

কোথায় লাগল, কি লাগল বোঝার আগেই উপর পানে মুখ তুলে পিছন দিকে বাঁকা হয়ে গেল ওর মাথা। মনে হলো কাছাকাছি থেকে একটা চিৎকার করল কেউ। পরমুহূর্তে অনুভব করল একই সঙ্গে জিতেছে আর হেরে গেছে ও।

শেষ মুহূর্তটি মনে থাকল রানার। পড়ে যাচ্ছে বুঝতে পারল ও। পাথরের উপর নিজের পতনের শব্দ শোনার আগে একটি মাত্র কথা ভাবতে পারল ও।

নকল পয়গম্বর মরেছে।

অন্ধকার হয়ে গেল সব।

বারো

এমন জরাগ্রস্ত আর কুৎসিত মুখ কোন মানুষের হতে পারে তা যেন বিশ্বাস করতে পারল না ও। মুখটা ওর উপর ঝুঁকে পড়েছে। নরম গলায় বিড় বিড় করে ঠোঁট নাড়ছে। মুখটার চিবুকে দাড়ি, দাঁত নেই একটাও। ওর পেটের ভিতর কি সব যেন দৌড়াদৌড়ি করছে, ওর গলায় ঠেকে রয়েছে কত যুগ ধরে যেন। মুখ সরিয়ে নিতেই অন্ধকার সব আবার।

আবার যখন জাগল ও তখন জরাগ্রস্ত কুৎসিত মুখটা ওর উপর ঝুঁকে নেই। হলুদ হলুদ বাতি দেখল ও। কিন্তু আলোর নাম নিশানা নেই কোথাও। অন্য কেউ ঝুঁকে পড়ল ওর উপর।

'রানা? রানা?'

মেয়েমানুষ। সেন্টের গন্ধ পেল ও।

'রানা?'

স্বর্গ হতে পারে না এটা। নরক যে নয় তাও বুঝতে পারল ও। কপালে যে হাতটা রয়েছে সেটা নরম, ঠাণ্ডা, শান্ত। গলাটা মৃদু আর দরদমাখা, 'তুমি ঠিক হয়ে যাবে, রানা। জানো, আমরা ফিরে চলেছি।'

'কোথায়?'

'বর্ডারের কাছে আমরা, রানা। আমি বনবন। চিনতে পারছ না আমাকে, রানা? রানা?'

মেয়েটির মুখ নেমে এল। ওর গালে গাল ঘষছে সে। নরম ভরাট গাল।

'ড্যান্সাররা?' ও অস্ফুটে জিজ্ঞেস করল।

'আত্হার সব বলবে তোমাকে। সব মিটে গেছে।'

'আত্হার এখানে? ওর সাথে কথা বলব আমি।'

'পরে, রানা। তোমার জখম মারাত্মক।'

'ডাকো।' রানা বলল।

ক'মিনিট পর আত্হার এল। রানার পাশে বসে কপালে ভারী হাত রাখল সে। বলল, 'স্বাগতম, রানা।' কেঁপে উঠল আবেগে ওর গালের মাংস, 'তুমি ফিরে এসেছ আবার দুনিয়ায়। ওয়েলকাম ব্যাক, রানা।'

আত্হারের মুখে উত্তর খুঁজল রানা, 'এখানে এলাম কি করে আমি? কি ঘটেছে বলো আমাকে।'

আত্হার বলল, 'কিছু খেয়েছ তুমি?'

'পরে। স্টার্ট টকিং।' রানা ভুরু কোঁচকাল, 'Djebel Kif আর আল-রশিদ...'

'Djebel Kif মানচিত্র থেকে মুছে গেছে।'

'মুছে গেছে...'

'আমরা ধসিয়ে দিয়েছি চূড়াটাকে। ড্যান্সাররা সেলিম আল-রশিদকে মৃত দেখে দ্বন্দ্বে মুষড়ে পড়েছিল। সবাই মৃতদেহ ঘিরে অপেক্ষা করতে থাকে। ওরা আশা করছিল পুনর্জীবিত হবে ওদের সেকেন্ড প্রফেট। তুমি পাথর ছুঁড়ে মেরেছ আল-রশিদকে। আল-রশিদের তলোয়ার তোমাকে ছুঁয়েছিল একই সময়ে। এক ইঞ্চি আগে বেড়ে যদি সে কোপটা মারত তাহলে মগজে গিয়ে ঢুকত তলোয়ার। বেঁচে গেছ ভাগ্যগুণে, রানা।'

'Djebel Kif?'

'ড্যান্সাররা আল-রশিদের মৃতদেহ ঘিরে অনুরোধ করছিল পুনরুত্থানের জন্যে। ইতিমধ্যে আমরা তোমাদেরকে নিচের একটা গুহায় নিয়ে যাই। ফেরার পথে এ্যাটমিক রিয়্যাকটর চেম্বারটা দেখতে পাই। স্পীড বাড়িয়ে দিয়ে বেরিয়ে আসি আমরা সব ক'জন বৈজ্ঞানিককে নিয়ে। খানিক পরেই বিস্ফোরিত হয় Djebel Kif. সবটা ধসেনি কিন্তু চেহারা আর তার নেই। কায়রোয় খবর পাঠিয়েছিলাম আমাদের অপারেটরের কাছে। সে আমেরিকান এমব্যাসীতে খবর পাঠায়। অ্যামব্যাসাডর হুবার্ট ডনফিল আর বনবনকে নিয়ে গেছে। আলিডাও চলে গেছে একই প্লেনে। অন্যান্য সমস্ত বৈজ্ঞানিক চলে গেছে কায়রো পিক-আপে করে। আমি কেবল আছি তোমার সঙ্গে। কায়রোয় তোমার জন্যে সব ব্যবস্থা করা আছে। সিদ্দিকী 'কপ্টার নিয়ে আসছে। তাড়াতাড়ি হাসপাতালে নেয়ার দরকার তোমাকে।'

'বেলচা?'

ম্লান দেখাল আত্‌হারের মুখ, 'ওই লোকটাকেই কিছু করতে পারিনি, রানা। কপ্টার করে ভেগেছে সে।'

'ডক্টর সাদেক?'

'সম্পূর্ণ সুস্থ। ধন্যবাদ জানিয়েছে তোমাকে।'

ফিরোজার হাসি মাখা মুখটা ফুটে উঠল রানার মানসপটে।

ঘুমিয়ে পড়ল রানা।

শয়তানের দূত

প্রথম প্রকাশ: নভেম্বর, ১৯৭১

SUVOM

এক

'বিশ্রী ব্যাপার, খান,' এয়ারমার্শাল একটু অধৈর্য হয়েই বলে উঠলেন, 'রাডার রিপোর্ট ছাড়া আর কিছুই জানতে পারিনি আমরা। রাশান বা আমেরিকানদের শব্দের চেয়ে দ্বিগুণ গতিসম্পন্ন এয়ারক্র্যাফট আছে। কিন্তু শব্দের চেয়ে প্রায় এগারোগুণ স্পীড এটার। ঘণ্টায় সাত হাজার মাইল।'

আস্তে আস্তে পাইপে টোবাকো ভরছেন মেজর জেনারেল রাহাত খান। কাঁচা পাকা ভুরু জোড়া একটু কুঁচকে রয়েছে। তিনজন পালাক্রমে দু'একটা কথা বলছে, সেদিকে খেয়াল নেই যেন।

'সেকেন্ড দুয়েকের জন্যে রাডার স্ক্রীনে ধরা পড়ে,' এয়ার কমোডোর বললেন। 'তারপরই নেই হয়ে যায়।'

এয়ারমার্শালের অপর সহচর মন্তব্য করল, 'জিনিসটার আকৃতিটাও পরিষ্কার না। কিম্ভূতকিমাকারই বলা চলে। প্রশ্ন হলো : শুধু আমাদের দেশের ওপর দেখা যাচ্ছে কেন ওটাকে?'

দেশলাইয়ের উপর থেকে একটা পিঁপড়ে নেমে গেল। দেশলাইটা তুলে নিয়ে পাইপে অগ্নিসংযোগ করলেন রাহাত খান। পুরানো বন্ধুর দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন। এয়ারমার্শাল বললেন, 'সব তো শুনলে, খান…'

'ভুল,' বন্ধুকে ইশারায় থামিয়ে দিয়ে বলে উঠলেন রাহাত খান।

এয়ারমার্শাল ভাল করে বুঝতে চেষ্টা করলেন বন্ধুকে, 'কি ভুল, রাহাত?'

'শুধু আমাদের দেশে না, ইটালিতেও ধরা পড়েছে জিনিসটা। আফ্রিকা, ইউরোপ, আমেরিকা—সব মহাদেশেই ধরা পড়েছে।' রাহাত খান পাইপটা দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে বললেন, 'সবচেয়ে বেশি বার দেখা গেছে ইটালিতে আর আমাদের দেশে।'

বিস্ময়ের ধাক্কাটা হজম করে হাসলেন এয়ারমার্শাল, 'জানো তাহলে তুমি সব?' রাহাত খানের রিটায়ারের আগের কথা স্মরণ করলেন এয়ারমার্শাল। দু'জন দুই ফোর্সের হলেও বন্ধুত্ব ছিল দু'জনার, সে প্রায় আজ পনেরো বছর আগের কথা। তখন থেকেই দেখে আসছেন তিনি রাহাত খানের সর্বজ্ঞ হবার ইচ্ছা ও ক্ষমতা।

প্রশ্নটা এড়িয়ে গেলেন মেজর জেনারেল রাহাত খান। 'সি. আই. এ; কে জি. বি; ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস; ইন্টারপোল রিপোর্ট পাঠিয়েছে। রুটিন রিপোর্ট।'

'আমি তোমার সাহায্য চাই। আমার চেয়েও বেশি জানো তুমি।' সিগার

ধরালেন এয়ারমার্শাল। 'ওভার-অল সিচুয়েশন সম্পর্কে তোমার কি বক্তব্য?'

'আমার এজেন্ট বাশার কাজ করছিল ওখানে।' রাহাত খানের কণ্ঠস্বর গম্ভীর শোনাল, 'মেসেজ পাঠাচ্ছিল, সাডেনলি ডেড হয়ে গেছে রেডিও। আবার পাঠাচ্ছি একজনকে। ওর কাছ থেকে শোনো।' ইন্টারকমের বোতাম টিপলেন তিনি, 'নার্গিস? জিরো জিরো ডবল থ্রীকে পাঠিয়ে দাও। আর কফি দিয়ো। আমাদের জন্যে।'

কুড়ি সেকেন্ড পর নিঃশব্দে ঘুরে গেল দরজার নবটা। দরজা খুলে একপা একপা করে টেবিলের কাছে এসে দাঁড়াল হলুদ রঙের আঁটসাঁট শিফন শাড়িতে মোড়া একটুকরো অগ্নিশিখা।

'এসো পরিচয় করিয়ে দেই,' ভরাট গুরুগম্ভীর গলা রাহাত খানের। 'এয়ারমার্শাল, ইনি ওঁর সেক্রেটারি, ইনি এয়ার কমোডোর সাজ্জাদ,' মেয়েটিকে দেখিয়ে এয়ারমার্শালের দিকে তাকালেন রাহাত খান, 'জিরো জিরো ডবল থ্রী, মিস সোহানা।'

করমর্দনের জন্যে হাত বাড়াল না সোহানা। টকটকে লাল ঠোঁট দুটো নড়ে উঠল, 'আপনার সাথে পরিচিত হয়ে আনন্দিত হলাম।'

গমগম করে উঠল রুমটা, 'বসো, সোহানা।'

আস্তে আস্তে হাতলবিহীন চেয়ারটায় বসে পড়ল সোহানা। আড়চোখে হাত ঘড়িটার দিকে তাকাল। মাত্র ত্রিশ সেকেন্ড হয়েছে। অগ্নিপরীক্ষা সবেমাত্র শুরু। কর্ণেন্দ্রিয় সদা সতর্ক হয়ে রইল পরবর্তী আদেশের জন্যে।

'ফাইল দেখে কি মনে হলো তোমার?' ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করলেন রাহাত খান।

'সাবধানে এগোতে হবে আমাকে, স্যার,' মুখস্থ করা মতামতটা ধীরে ধীরে আওড়ে গেল সোহানা। এরকম একটা প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে তা বুঝে নিয়েছিল আগেই, 'অত্যন্ত শক্তিশালী সংস্থা না হলে এরকম এয়ারক্র্যাফট তৈরি করা সম্ভব নয়। যুগান্তকারী কয়েকটি আবিষ্কার দরকার হয়েছে এটা তৈরি করতে গিয়ে। যে-সব দেশ রিপোর্ট করেছে তারাও জড়িত থাকতে পারে এ ব্যাপারে।'

'জিনিসটা সম্পর্কে আপনার কি ধারণা?' সোহানার দিকে ভাল করে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন এয়ারমার্শাল। কফির ট্রে নিয়ে রুমে ঢুকল নার্গিস।

'অসাধারণ স্পীডের জন্যেই রাডার ওটাকে অনুসরণ করতে পারে না,' শান্ত গলায় বলল সোহানা, 'ওটার বৈশিষ্ট্য এখানেই। রাডারকে ফাঁকি দেবার ক্ষমতা আছে বলে যে কোন টার্গেটে বিনা বাধায় বোমা ফেলতে পারবে। মিসাইল হার মানবে এর কাছে।'

সোহানা থামতেই এয়ার কমোডোর প্রশ্ন করলেন, 'অন্য কোন গ্রহ থেকে জিনিসটা পৃথিবীতে আসেনি তো? জিনিসটার আকৃতি অনেকটা গোল—সসারের মত। মঙ্গল গ্রহের প্রাণীদের তৈরি···'

এয়ারমার্শাল প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকালেন সোহানার দিকে। উত্তর দিতে দ্বিধা করল না ও, 'কোন খেয়ালী প্রতিভাবান বিজ্ঞানীর আবিষ্কার হতে পারে

জিনিসটা। ওঁদেরকেও মঙ্গলগ্রহের প্রাণী বলা যায়।'

'তোমার কাজ কি হবে ইটালিতে?' বিরক্তি প্রকাশ পেল রাহাত খানের গম্ভীর কণ্ঠে।

কফির কাপ সাজিয়ে রুম ছেড়ে বেরিয়ে গেল নার্গিস।

একপর্দা নিচে নেমে গেল সোহানার গলা, 'ইটালির গারগানো ম্যাসিভে গিয়ে খোঁজ খবর নেয়া, স্যার। ওখানেই বেশি দেখা গেছে।'

'প্রথমে বাশারের সন্ধান নেবে। রিপোর্ট করবে ইমিডিয়েটলি। পাসপোর্ট পেয়ে যাবে ঘণ্টা দু'য়েকের মধ্যে। টিকিট কাটা হয়ে গেছে। সন্ধ্যার ফ্লাইটে যাচ্ছ তুমি। যাও।' সব কথা শেষ করে দূর হয়ে যাবার নির্দেশ দিলেন রাহাত খান।

আল্লা আল্লা করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সোহানা।

এয়ারমার্শাল বললেন, 'রোমে আমার লোক আছে। উইং কমান্ডার আফতাব। দরকার মনে করলে যোগাযোগ করতে পারেন আপনি। সাহায্য পাবেন।'

'ধন্যবাদ।' ঘুরে দাঁড়াল সোহানা।

'শোনো,' পিছন থেকে টান মারল ভারী গলা, 'আমারও একজন লোক আছে ওখানে। ছুটিতে আছে। ভেনিসে। শেষবার ওকে দেখা গেছে হোটেল আম্পালার ড্যান্স ফ্লোরে ছয়জন হিপি মেয়ের সাথে নাচতে। দরকার না পড়লে ওর সাহায্য চেয়ো না। এটা তোমার একার অ্যাসাইনমেন্ট। ওর নাম মাসুদ রানা।' এয়ারমার্শালের দিকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে কফির কাপে চুমুক দিলেন রাহাত খান।

দরজা অতিক্রম করে বাইরে বেরিয়ে আসার সময় সোহানা শুনতে পেল রাহাত খানের মৃদু কণ্ঠস্বর, 'শি মে প্রুভ টু বি ওয়ান অভ মাই বেস্ট অপারেটরস্।' এয়ারমার্শালের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন তিনি, 'মেয়ে বলে কম মনে কোরো না তুমি ওকে…'

দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সব কথা শুনতে পেল না ও।

দুই

ভেনিসের গা ছুঁয়ে বয়ে চলেছে অ্যাড্রিয়াটিক সাগরের পানি।

সেজেগুজে ঝলমলে সন্ধ্যা নেমেছে খানিক আগে। হোটেল আম্পালা। সিগারেটের ধোঁয়া, গ্লাসের টুং-টাং আওয়াজ, বিনয়ী বেয়ারাদের মৃদু পদশব্দ, ড্যান্সরুম থেকে ভেসে আসছে বাজনা আর যুবতী স্বর্ণকেশীদের ছোট ছোট হাসি, ফিসফিস করে সোহাগের কথা বলা—সব মিলিয়ে ভালই লাগছিল ওর।

ড্যান্সরুমে নাচের জাঁকজমক আসর বসেছে। হলরুমে সঙ্গিনীদের নগ্ন বাহুর নাচন, বুকের উচ্ছ্বাস আর নিতম্বের হিল্লোল দেখতে দেখতে যুবকেরা

পেরেশান।

আলো একটু বেশি উজ্জ্বল এখানে। কিন্তু তাতে কি। কেউ কারও দিকে ভুলেও তাকাবে না। সবাই যে যার মত ব্যস্ত।

হলরুমের সর্ব বায়ে এখনও বসে রয়েছে চুপচাপ ইটালিয়ান লোকটি। একটার পর একটা সিগারেট ধরাচ্ছে। ধরাবার ফাঁকে ফাঁকে প্রতিবার দেখে নিচ্ছে রানাকে।

সন্ধেটা মাঠে মারা যাবে আজ। গিয়াকোমা আসবে আটটায়। বাকি সময়টা অপূর্ব সুন্দরী দুই যুবতীর মনোবাঞ্ছা পূরণ করার অভিনয় করে কাটাতে হবে তাকে। বিরক্ত হয়ে উঠছে রানা।

ইটালিয়ান আবার সিগারেট ধরাবার ফাঁকে রানার দিকে তাকাল। সঙ্গত কোন কারণ খুঁজে পেল না রানা। লোকটা ওর ওপর ইচ্ছাকৃতভাবে নজর রাখছে কিনা বলা মুশকিল। কোন কাজ নিয়ে আসেনি রানা। নির্মল ছুটি উপভোগ করতে বেরিয়ে পড়েছে ও। আগামীকালই রোমের উদ্দেশে উড়বে পাখি। লোকটা জেলাস। দুই সুন্দরী যুবতী সাথে রয়েছে দেখে হিংসা হচ্ছে ব্যাটার।

গিয়াকোমার উপর রাগটা গিয়ে পড়ল রানার। ইটালিতে একমাত্র বন্ধু ওর গিয়াকোমা। প্লে-বয়। দেদার মদ গেলে, দু'হাতে টাকা ওড়ায়, নিত্য নতুন মেয়েকে নিয়ে রাত কাটায়, আর হঠাৎ ডুব মারে দীর্ঘদিনের জন্যে—ল্যাবরেটরিতে সারা রাত জেগে দিনের পর দিন গবেষণা করে ক্যান্সারের জীবাণু আবিষ্কারের নেশায়। প্রতিভাবান বিজ্ঞানী হলে হবে কি, শিক্ষা নিয়েছে মিলিটারি একাডেমিতে। সেই সূত্রেই আলাপ হয়েছিল রানার সাথে। ও ইটালিতে পৌঁছে দেখা করতেই মুসলমানী কায়দায় কোলাকুলি করে খোশ আমদেদ জানিয়েছে গিয়াকোমা। পুরানো বন্ধুকে পেয়ে হিপ্ হিপ্ হুররে, হিপ্ হিপ্ হুররে করতে করতে রানাকে একান্তে টেনে নিয়েছে গিয়াকোমা। কিন্তু ক'দিন থেকে সন্ধ্যার পর বড় ব্যস্ত থাকে ও। ক্যান্সার সম্বন্ধে সেমিনার শুরু হয়েছে রোমে। রোজ চার্টার্ড প্লেনে যায় আর ফিরে আসে। মাঝখানের সময়টা রানা নিঃসঙ্গ থাকবে বলে ইটালির দুই সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে গিয়াকোমা। ল্যাঠা এখন এখানেই। দুই কুমারীই প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে ওর সাথে পরিচিত হয়ে। খানিক আগে পালাক্রমে নাচতে গিয়ে দু'জনাই নিজের নিজের বাড়িতে আজ রাতে ডিনার খাবার আমন্ত্রণ জানিয়েছে রানাকে।

বিয়ারের গ্লাসে চুমুক দিয়ে ঘড়ির দিকে তাকাল রানা। ছ'টা পঁয়তাল্লিশ।

খট্-খট্-খট্-খট্…

হঠাৎ হাইহিলের শব্দ থেমে গেল। জোয়ানের হাত মুঠোর ভেতর ধরে সুয়ামার মুখের দিকে তাকিয়ে হস্তরেখার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করছিল রানা। চোখ উঠে গেল হলের দরজার দিকে। কটমট করে রানার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে লাল টকটকে শাড়িতে মোড়া এক অপূর্ব অগ্নিশিখা।

সোহানা। অবাক চোখে তাকিয়ে রইল রানা।

খট্-খট্, খট্-খট্—আবার শোনা গেল হাইহিলের শব্দ। ঝট করে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে সোজা লিফটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে সোহানা। মুখে কথা সরল না রানার। লিফটের ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেল সোহানা।

'কে ওই মেয়েটি? তোমার চেনা?' হালকা গলায় প্রশ্ন করল সুয়ামা।

উত্তর দিল না রানা। দৃঢ় পদক্ষেপে হলরুমের দরজা অতিক্রম করে একটা লোক এগিয়ে আসছে। দীর্ঘকায়, প্রকাণ্ড কাঠামো শরীরের। দেহের তুলনায় মস্ত বড় একটা মাথা বসানো ঘাড়ে। ব্যাক ব্রাশ করা কোঁকড়া চুল। চোখ দুটো ঢাকা সান-গ্লাসে।

চেনে রানা। কিন্তু স্মরণ করতে পারছে না। দ্রুত অতীতের স্মৃতি ঘাঁটল ও। উঁহুঁ, মনে পড়ছে না কোনমতে। একে একে বন্ধুদেরকে স্মরণ করল। না, বন্ধুদের কেউ নয় এ লোক। শত্রু না মনে পড়ছে না। লোকটা লম্বা লম্বা পা ফেলে হলরুম পেরিয়ে লিফটে গিয়ে চড়ল।

হঠাৎ মনে মনে উপলব্ধি করল রানা, এ লোক যে-ই হোক, আইনের ওপারের লোক, এপারের নয়।

'কি হলো তোমার?' এবার জোয়ানের প্রশ্ন।

'এক্সকিউজ মি,' উঠে দাঁড়াল রানা জোয়ানের হাত ছেড়ে দিয়ে, 'এখুনি আসছি আমি।' ম্যানেজারের চেম্বারের দিকে দ্রুত এগিয়ে গেল ও।

ম্যানেজারের চেম্বার থেকে বেরিয়ে সোজা পে-বুদে ঢুকে পড়ল রানা। ঢোকার আগে হলরুমের বাঁ কোণে টেবিলের দিকে তাকাল একবার। ইটালিয়ানটা চোখ তুলে তাকিয়ে আছে ওর দিকে।

রিসিভার তুলে ফোর্থ ফ্লোরে রুম নাম্বার ফোর হান্ড্রেড ফিফটির নির্দিষ্ট সংখ্যায় ডায়াল করল রানা। অপরপ্রান্ত থেকে তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর কানের পর্দায় এসে আঘাত হানল—'হ্যালো?'

'কেমন আছ, সোহানা?' জিজ্ঞেস করল রানা, 'ইটালিতে…'

'কে আপনি? কাকে চান? রঙ নাম্বারে ডায়াল করেছেন…' সোহানার কণ্ঠে তিরস্কার।

'ঠাট্টা নয়, সোহানা। আমাকে তুমি দেখেছ হলরুমে।' রানা হাসল। 'কেমন আছি জিজ্ঞেস করলে না তো?'

'অপরিচিত কোন লোককে কুশল জিজ্ঞেস করা ভদ্রতা নয়,' সোহানার গলায় ঝাঁঝ, 'আমি রিসিভার রাখছি…

কিন্তু রিসিভার নামিয়ে রাখার আগেই তীক্ষ্ণ আর্তনাদ করে উঠল সোহানা। পরিষ্কার শুনতে পেল রানা। কান থেকে রিসিভার নামিয়ে এক ঝটকায় পে-বুদের দরজা খুলেই সিঁড়ির দিকে ছুটল ও।

তিনটে করে সিঁড়ির ধাপ একসাথে টপকে তিনতলায় উঠে নিজের ভুল বুঝতে পারল রানা। লিফটে চড়লে তাড়াতাড়ি হত। ত্রিশ সেকেন্ডের মধ্যে পাঁচতলায় উঠে করিডর ধরে ছুটল ও। রুম নম্বার ফোর হান্ড্রেড ফিফটির দরজা বন্ধ। সজোরে ধাক্কা মারল ও। খুলে গেল দরজা। তালা খোলা ছিল দরজার। সিটিংরুম তিনলাফে পেরিয়ে বেডরু ম ঢুকে সোহানাকে দেখল

রানা। ক্রেডল্ থেকে মেঝের কাছে ঝুলে পড়েছে রিসিভারটা। চেয়ারের পেছনে মাথা এলিয়ে দিয়ে নিঃসাড় বসে আছে সোহানা। হাত দুটো ঝুলছে দু'পাশে।

পাল্স দেখে রানা বুঝল জ্ঞান হারিয়েছে সোহানা। আক্রমণের চিহ্নটা চোখ এড়াল না ওর। গলার চারপাশে আঙুলের দাগ ফুটে উঠেছে।

মিনিট তিনেক পর জ্ঞান ফিরে পেয়েই চোখ মেলে তাকাল সোহানা। সব কথা মনে পড়ে যেতে হতভম্ব হয়ে বিছানায় পড়ে রইল ও। জ্ঞান হারিয়েছিল সে চেয়ারের উপর, আর চোখে মুখে পানির ছিটেই বা দিল কে? উঠে বসতেই চোখাচোখি হয়ে গেল রানার সাথে। চেয়ারে বসে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ছে ও। রানাকে চেয়ার ছেড়ে এগিয়ে আসতে দেখে মুখ ফিরিয়ে নিল সোহানা।

'পিছন থেকে আক্রান্ত হয়েছিলে তুমি?' বলল রানা। 'চিনতে পেরেছ লোকটাকে?'

'না,' সংক্ষিপ্ত উত্তর সোহানার। কাঁধের শাড়িটা খসে পড়েছিল, সেটা কাঁধে তুলে নিল ও। 'তোমার তাতে দরকার কি?' একটু কঠোর শোনাল সোহানার গলা, কিন্তু অভিমানের রেশটুকু কান এড়াল না রানার।

'কেন এসেছ ইটালিতে?' হাসল রানা। সোহানাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে ও।

'তোমার সাথে দেখা করার জন্যে নিশ্চয় নয়।' ভ্যানিটি ব্যাগটা টেনে নিয়ে খুলে ফেলল সোহানা, 'কোন্ সাহসে হাতড়েছ আমার ব্যাগ?' ব্যাপারটা টের পেয়ে খেপে উঠল ও।

'সরি।' ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গি করল রানা। 'ছুটিতে থাকলেও বহুদিনের অভ্যাসটা ছাড়তে পারিনি।' এবার সিরিয়াস হবার ভান করল ও, 'ব্যাপার কি খুলে বলো, সোহানা। কেন এসেছ, কে তোমাকে আক্রমণ করল?'

'দেরি হয়ে যাচ্ছে না তোমার?' শান্তভাবে খোঁচা মারল সোহানা। 'দুইজনকে বসিয়ে রেখে এসেছ সে-কথা আমাকে দেখে ভুলে গেলে?'

'ওহ্-হো?' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রানা। সত্যি ভুল হয়ে গেছে বড়। 'ওরা কি যে ভাবছে...' মারাত্মক অন্যায় করে ফেলেছে এমন ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে নাড়তে দরজার দিকে পা বাড়াল ও।

সোহানা মনে মনে দ্রুত চিন্তা করছে। সত্যি সত্যি চলে যাচ্ছে নাকি রানা? সে কি সীমা ছাড়িয়ে খারাপ ব্যবহার করে ফেলেছে ওর সাথে? আরে, সত্যি সত্যি চলে যায় যে...।

'এই,' সোহানা বাধ্য করল নিজেকে কথা বলতে, 'শোনো।'

দরজার নব ধরে ঘুরে তাকাল রানা, 'আবার কি বলছ?'

'সত্যি চললে নাকি?' স্বাভাবিক গলা বজায় রাখছে সোহানা। মরে গেলেও রানাব কাছে মনের ভয়টা প্রকাশ করবে না সে। দাম বেড়ে গেছে ভেবে তাহলে মনে মনে লাফাবে ও।

'তোমার মন বড় সন্দেহপ্রবণ,' কঠোর সুর রানার।

'আর একটু থেকে গেলে পারতে না?' ওকে দরজার নব ঘোরাতে দেখে তাড়াতাড়ি বলল সোহানা।

'পারতাম। কিন্তু তার দরকার কি?'

'দরকার···দরকার,' কি বলবে বুঝতে পারল না সোহানা, তারপর বলে ফেলল, 'খানিকটা গল্প করে যেতে।'

'মিস সোহানা গল্প করার প্রস্তাব দিচ্ছে মাসুদ রানাকে। আমি বিশ্বাস করতে পারছি না।' গম্ভীর হয়ে উঠল রানা। দরজা খুলে ফেলেছে ও।

'প্লীজ, রানা···,' সোহানার স্বর ভীতিবোধকে ঢাকতে পারল না। 'আমার ভয় করবে একা থাকতে।'

হা হা করে হেসে ফেলে দরজা বন্ধ করল রানা। খাটের উপর ফিরে এসে বলল, 'মেজর জেনারেল রাহাত খান ভাল এজেন্ট পাঠিয়েছেন। ভয়েই অর্ধেক কাবু হয়ে গেছে বেচারী।' সোহানার একটা হাত ধরে ফেলল ও। ঝট্ করে সেটা ছাড়িয়ে নিল সোহানা।

দেখতে দেখতে সোহানার ফর্সা মুখটা লাল হয়ে গেল। 'কে বলল বস্ পাঠিয়েছেন আমাকে?'

'অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে আসোনি তুমি? অস্বীকার করতে পারবে?' অনুমানেই চ্যালেঞ্জ করল রানা।

'না, অস্বীকার করছি না। কিন্তু আমার অ্যাসাইনমেন্ট সম্পর্কে তোমার কৌতূহলী হবার দরকার নেই। এটা আমার একার,' সোহানা যেন ঘোষণা করল, 'কাউকে নাক গলাতে দিচ্ছি না আমি।' বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ও, 'জানালার গ্রিল উঠিয়ে বাথরুম দিয়ে এসেছিল সম্ভবত লোকটা।' বাথরুমের দিকে পা বাড়াল ও।

'বেরিয়েও গেছে সেই পথে। আমি পরীক্ষা করে দেখেছি,' মিটিমিটি হেসে বলে উঠল রানা। 'তোমার কাজটা আমিই সেরে রেখেছি। যাক, আজকে রাতে কোন প্রোগ্রাম আছে?'

'না,' চিন্তিত ভাবে বলল সোহানা।

'জ্যোৎস্না হবে একটু পর। নৌকা চড়তে বেরুবে?'

বাঁকা চোখে তাকাল সোহানা, 'তোমার সাথে? একা?'

'কেন আমি বাঘ, না ভাল্লুক?' মৃদু হাসি রানার ঠোঁটে।

'তুমি?' সোহানা মেপে মেপে খানিকটা হাসল, তারপর বলল, 'তুমি একটা এক নম্বরের ছোটলোক।'

রানা হেসে ফেলে বলল, 'ঠিক চিনেছ। হার্ট-কে হার্ট চেনে, বার্ড চেনে পাখি।'

কটমট করে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল সোহানা। তারপর পিছন ফিরে মন্থর পায়ে এগিয়ে গেল বাথরুমের দিকে।

তিন

হোটেল থেকে গ্র্যান্ড ক্যানেল মাত্র একশো গজ দূরে। সরু একটা শাখা বয়ে যাচ্ছে হোটেলের লেজ ছুঁয়ে।

গন্‌ডোলিয়ারের পরনে প্যান্ট শার্ট। গন্‌ডোলা কিন্তু দেখতে বাংলাদেশের ছইঅলা নৌকার মতই।

মোহনায় গন্‌ডোলা পড়তেই অকস্মাৎ এদের দৃষ্টি কেড়ে নিল দক্ষিণ কূলের প্রাচীন বাড়িগুলোর লাল-নীল সবুজ নিওন সাইনের আলো গায়েমাখা ছোট ছোট ঢেউগুলো। রানার হাত চেপে ধরল সোহানা, গন্‌ডোলা হঠাৎ দুলছে। রানা ইতালিয়ান ভাষায় বলল, 'আরও সামনে যেতে চাই আমরা। সান জিয়োরগিয়ো অবধি গিয়ে ফিরে আসব।' মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল গন্‌ডোলিয়ার।

উঁচু বেতের মোড়ার উপর বসে সোহানার দিকে তাকাল রানা। সোহানার এটা প্রথম সফর ভেনিসে। দর্শনীয় বস্তুগুলো আঙুল বাড়িয়ে দেখাচ্ছে রানা। ঢেউ যেমন হঠাৎ উঠেছিল, তেমনি হঠাৎ শুয়ে পড়েছে সটান। দূরে লঞ্চের শব্দ শোনা যাচ্ছে। হয়তো তার ঢেউ এগিয়ে এসেছিল এদিকে। চাঁদটা ঢাকা পড়ে গেল ছোট একটা মেঘের আড়ালে। সাবলীল গতিতে এগোচ্ছে গন্‌ডোলা।

'কিছু বলছ না যে, সোহানা?' রানা সিগারেট বের করল পকেট থেকে।

সান্তা মারিয়ার সিঁড়ির ধাপগুলোকে অপর পারে রেখে সামনে এগোচ্ছে গন্‌ডোলা। চার্চটা অত্যন্ত বিখ্যাত। রানা হাত বাড়িয়ে দেখাল, 'ওই যে দেখা যাচ্ছে, ওটা ডগস্ প্যালেস, পিছনেই সেন্ট মার্কস ক্যাথিড্রাল।'

গ্র্যান্ড ক্যানেল অতিক্রম করে গভীর পানির দিকে এগোল ওরা। এদিককার পানি যেমন গভীর, তেমনি প্রশস্ত জায়গা নিয়ে বয়ে চলেছে। এই অংশটা দুই নদীর মোহনা, কিন্তু দেখে সহজে অনুমান করার উপায় নেই। কিছুটা যাবার পরই নদীর মুখ বেঁকে গেছে এদিক সেদিক।

গভীর জলের মাঝামাঝি জায়গায় গন্‌ডোলা পৌঁছুতে রানা সোহানার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমি তো ভাল সাঁতার জানো না। গন্‌ডোলা যদি হঠাৎ ডুব মারে?' কথাটা শেষ করেই রানা দেখতে পেল গ্রে কেবিন ক্রুজারটা। গ্র্যান্ড ক্যানেলের উত্তরদিকের অন্ধকারে ছিল ওটা। দশ-বারো গজ দূর থেকে ওদের গন্‌ডোলা পাশ কাটিয়ে এসেছে ওটাকে। কিন্তু লক্ষ করেনি রানা। অন্ধকার বলেই তাকায়নি ওদিকে।

ইঞ্জিন চালু হয়েছে ক্রুজারের। রানা আবার তাকাল সোহানার দিকে। আকাশের দিকে তাকিয়ে মেঘেদের ওড়া দেখছে ও।

'আমার কথার জবাব দিলে না যে? যদি ডুব দেয় গন্‌ডোলা?'

সোহানা অকারণ পুলকে হেসে উঠল, 'যদির কথা নদীতে ফেলো।'

'ঠাট্টা না, সত্যি যদি তেমন কিছু ঘটে?'

'স্রোতের টানে পারে গিয়ে উঠব, আবার কি?' বলল সোহানা। 'তবে তুমি মরবে। স্বীকার করছি মায়া হবে তোমার জন্যে। হাজার হোক, এতদিনের পরিচয়, ভালমন্দ কত কি বলেছি—গনডোলা ডুবে সলিল সমাধি লাভ করো তো কেমন করে চাই বলো। রিপোর্ট করব ঢাকায় ফিরে। বসের সাথে ঝগড়া-ঝাঁটি করে রাজি করাব, রাজি না হলে ধর্মঘটের ভয় দেখিয়ে রাজি হতে বাধ্য করব তোমার একটা ছবি অফিসের দেয়ালে টাঙাতে। তারপর বছর শেষে চুনকাম করতে এসে মিস্ত্রীরা ছবিটাকে নামিয়ে ফেলবে ঝুল-কালি লেপটানো ফ্রেম দেখে। ঝেড়ে মুছে ফ্রেমটাকে আবার টাঙানোর কথা অফিসের কারও মনেই থাকবে না…'

রানা সোহানার একটি কথাও তখন স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে না। হঠাৎ ওর অন্যমনস্কতা অনুভব করেই পিছন ফিরে তাকাল সোহানা। এবং আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল।

এক্সট্রা অর্ডিনারী ইঞ্জিন ক্রুজারটার। আগে থেকেই এগিয়ে আসছিল। টের পেয়ে গিয়েছিল রানা। মনে মনে প্রস্তুত হচ্ছিল ও। হঠাৎ মৃদু গর্জন তুলে, কোন সিগন্যাল না দিয়েই, সবেগে ছুটে আসছে গভীর জলের দিকে। উঠে দাঁড়িয়ে সোহানার একটা হাত ধরল রানা শক্ত করে। উঁচু ফেনিল ঢেউ তুলে ছুটে আসছে জলদৈত্য। গন্‌ডোলাকে রক্ষার সময় পেরিয়ে গেছে বুঝতে পারল রানা।

আঘাত লাগবেই। গন্‌ডোলিয়ারের মুখ দিয়ে স্প্যানডাউ মেশিনগানের মত সশব্দ গালি বেরুচ্ছে।

ঝট্ করে তাকাল সোহানা। চোখ দুটোয় পরিষ্কার আতঙ্ক। চাঁদের নিচে থেকে মেঘ সরে গেছে।

'এখুনি এসে পড়বে! কিন্তু আমি যে সাঁতার জানি না, রানা।'

'আমার সাথে লাফ দাও, সোহানা,' শান্ত গলায় কথাটা বলল রানা। পাঁচ সেকেন্ড অপেক্ষা করল ও। সোহানার হাতটায় চাপ দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল পানিতে। সোহানা পানিতে লাফ দিয়ে অনুভব করল, ওর হাত ছেড়ে দেয়নি রানা।

ক্রুজারের উত্তাল তীব্র ঢেউ খড়কুটোর মত ভাসিয়ে নিয়ে গেল ওদেরকে। প্রথম ধাক্কাতেই পনেরো গজের মত। জীবন বাঁচল ওদের। রবারের বলের মত ভেসে চলেছে ওরা। রানার বাঁ কাঁধ ধরে ভেসে আছে সোহানা। দু'জোড়া পা অনবরত ছুঁড়ছে ওরা। ক্রুজারের কাছ থেকে শ'খানেক গজ দূরে চলে এসেছে। ইঞ্জিনের শব্দ থেমে গেছে। আরও খানিকদূর গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল ক্রুজার।

গন্‌ডোলাটা দু'টুকরো হয়ে গেছে। কেমন করে যেন একটা অংশ উল্টে গিয়ে দুলছে ঢেউয়ের ধাক্কা খেতে খেতে। গন্‌ডোলিয়ারের চিহ্ন নেই কোথাও। চমকে উঠে ক্রুজারের দিকে তাকাল রানা। ইঞ্জিনের শব্দ বাড়ছে আবার।

'শাড়িটা খুলে ফেলো, সোহানা,' সতর্ক গলায় বলল রানা। ক্রুজারটা

ফিরে আসছে গন্‌ডোলার দিকে। সাহায্য করবার জন্যে নয়, বুঝতে পারল রানা। আবার সেই তীব্র গতি এসে গেছে ওটার।

'ডুব সাঁতার দিয়ে বাঁচার চেষ্টা ছাড়া উপায় নেই আমাদের,' রানা বলল সোহানার দিকে তাকিয়ে। 'লজ্জা কোরো না, খুলে ফেলো শাড়ি। হালকা করে ধরে রাখবে তুমি আমাকে। পানির যতটা সম্ভব নিচে গিয়ে সাঁতরাব—ভয় নেই, আমি বাঁচলে তোমাকে নিয়েই বাঁচব।'

'শাড়ি আমি খুলে ফেলেছি, রানা,' সোহানা বলল।

হাসি পেল রানার এই বিপদের মধ্যেও। প্রাণের নাম বাবাজী, টান পড়লে সবকিছুতেই রাজি।

ভাসমান গন্‌ডোলাটার প্রায় কাছে পৌঁছে গেছে ক্রুজার। চাঁদের আলোয় পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে ককপিটটা। দু'জন লোক ওখানে। একজন ক্রুজারের কন্ট্রোল অপারেট করছে। অন্যজন ভাসমান গন্‌ডোলাটা দেখার চেষ্টা করছে ঝুঁকে পড়ে। গন্‌ডোলার যাত্রীদেরকে খুঁজছে সে।

চিনতে ভুল করল না রানা। সোহানার পরপরই হোটেল আম্পালার হলরুমে ঢুকে লিফটে গিয়ে চড়েছিল এই লোক আজ সন্ধ্যায়।

লোকটা রানার পরিচিত। কিন্তু স্মরণ করতে পারছে না ও।

সোহানাকে নিয়ে ডুব সাঁতার দিয়ে ভেসে উঠল রানা। লোকটাকে আবছা ভাবে দেখা যাচ্ছে ককপিটে। এখনও খুঁজছে সে ওদেরকে। দাঁড়িয়ে পড়েছে আবার ক্রুজার। ডুব দিল ওরা। ডুব সাঁতার দিয়ে তীরের দিকে এগোতে এগোতে দ্রুত কাজ করছিল রানার মস্তিষ্ক। বারবার মনে পড়ছে অনীতার কথা। শেষবার ওকে হেলিকপ্টারে দেখেছে রানা। রানার পায়ের উপর দিয়ে ডিগবাজি খেয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল অনীতার দেহটা বাইরের নিশ্ছিদ্র, কালো অন্ধকারে। তীক্ষ্ণ একটা অপার্থিব চিৎকার উঠেই মিলিয়ে গেল। কিন্তু অনীতার কথা কেন মনে পড়ছে বারবার…ওর সেই অন্তিম চিৎকারটা এখনও কানে বাজছে রানার।

হঠাৎ পানির নিচে থেকে উপর দিকে উঠতে শুরু করল রানা। স্মরণ করতে পেরেছে ও। লোকটা সেই লোক না হয়েই যায় না। কিন্তু তা কি করে সম্ভব? সমাধান পেয়েও স্বস্তি পেল না রানা।

অসম্ভব, অসম্ভব—কিন্তু স্বচক্ষে দেখেও অবিশ্বাস করে কি করে ও?

পানির নিচে থেকে মাথা তুলে কূল দেখতে পেল ওরা। 'রানা, আমরা বেঁচে গেছি এ যাত্রা,' চেঁচিয়ে উঠল সোহানা।

'কিন্তু ঢাকার অফিসে আমার ফটো ঝোলানোটা যে হলো না?' বলল রানা।

'ছবি আমি ঝুলিয়ে নিলাম…অন্য জায়গায়।'

বারের কোণায় টেবিলে বসেছে ওরা। সোহানা তাকিয়ে আছে রানার দিকে, দু'চোখে রাজ্যের বিস্ময়—'কি বলছ, রানা? তুমি কি পাগল হলে?'

'প্রথমে আমিও মেনে নিতে পারিনি, সোহানা,' ধীরে ধীরে বলল রানা।

'কিন্তু যুক্তি দিয়ে বিচার করার পর অবিশ্বাস করার কিছু পাইনি।'

'কি করে বেঁচে রইল শয়তানটা? হেলিকপ্টার থেকে লাফিয়ে পড়ে কেউ বাঁচে?'

'কপ্টারটা তখন কোথায় ছিল দেখার সুযোগ ঘটেনি। জ্ঞান ছিল না আমার। কতটা ওপরে ছিল তাও বলতে পারব না। বুড়িগঙ্গা কি শীতলক্ষার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে থাকতে পারে। কিংবা 'কপ্টার তখন এগারোতলা বিল্ডিঙের ঠিক ওপর দিয়ে যাচ্ছিল।' রানা বিয়ারের গ্লাসে চুমুক দিল, 'এখন মনে পড়ছে লাফ দেবার খানিক আগে পিছন ফিরে নিচটা দেখে নিয়েছিল ও। বাঁচার উপযুক্ত জায়গা দেখে নিয়েই হয়তো লাফিয়ে পড়েছিল।'

'কিন্তু এ অসম্ভব, রানা!' সোহানা মেনে নিতে পারছে না কোনমতে।

হাসল রানা। 'অসম্ভব বলছ কেন? ভেবে দেখো, লাশ পাওয়া যায়নি ওর।' পর পর বিয়ারের গ্লাসে দু'বার চুমুক দিল ও। 'যাই হোক, আমি যাকে দেখেছি সে কবীর চৌধুরী ছাড়া আর কেউ নয়। যদি সে মরে গিয়ে থাকে তাহলে এ লোকটা তার ভূত।'

সোহানা প্রশ্ন করতে গিয়ে ক্ষান্ত হলো। রানা ভাবছে।

কূলে উঠে ভীষণ লজ্জা পেয়েছিল সোহানা। শাড়ি নেই গায়ে, ব্লাউজটা বেখাপ্পা লাগছিল বড় বেশি।

কিন্তু কি আর করা। লজ্জার মাথা খেয়ে ব্লাউজ আর পেটিকোট পরেই রওনা হয় ওরা। পঞ্চাশ গজ হাঁটার পরই পাওয়া গেল ট্যাক্সি। ড্রাইভার প্রশ্ন করেনি কোন। হোটেলের পিছন দিকে গাড়ি থেকে ওদেরকে নামিয়ে দেয় সে। মাথা নিচু করে পা বাড়িয়েছিল সোহানা গেটের দিকে। যতক্ষণ না সুইটে ঢুকে বাথরূমে নিজেকে লুকিয়ে ফেলল ততক্ষণ চোখ তুলে পলকের জন্যেও রানার দিকে তাকাতে পারেনি ও।

দু'জন শাওয়ার সেরে সোজা নিচে এসে বসেছে বারে। হলরূম হয়ে বারে ঢোকার সময় এবারও সেই হিংসুটে ইটালিয়ানকে দেখতে পেল না রানা। গন্‌ডোলা করে বেড়াতে বেরুবার আগে হলরূমে এসেছিল একবার রানা। লোকটা আছে কিনা দেখবার জন্যেই। ছিল না।

'কিন্তু কবীর চৌধুরী এখানে কেন, রানা?' জিজ্ঞেস করল সোহানা।

রানা চোখ তুলে তাকাল, 'আমারও সেই প্রশ্ন। কবীর চৌধুরী ইটালিতে কেন? কি ষড়যন্ত্র করছে ও ভেনিসে বসে?' সোহানার দিকে একটু ঝুঁকে পড়ল ও। 'আমার আরও একটা প্রশ্ন—তুমি এখানে কেন, সোহানা?'

'ভুলে যাও, রানা,' নীরস গলায় বলল সোহানা। 'আমার অ্যাসাইনমেন্টের কথা তোমাকে বলতে বাধ্য নই আমি। দিস ইজ অফিশিয়াল সিক্রেট। তাছাড়া তুমি এখন ছুটিতে। বাধ্য না হলে তোমার সাহায্য আমি চাইব না।'

'তথাস্তু।' হাসল রানা। 'আশা করি যখন আমার সাহায্য চাইতে বাধ্য বলে মনে করবে তখন অনেক দেরি হয়ে যাবে।'

'ও কথা বোলো না।' সোহানা দ্বিধাগ্রস্ত। 'তোমাকে আমার ভয় হয়, রানা। তোমার কথা খেটে যায়, অনেক দেখেছি আমি। মনে আছে গন্‌ডোলায়

তুমি কি বলেছিলে?'

হেসে ফেলে রানা বলল, 'বোঝো তাহলে। আমার কথা ঠিক ঠিক ফলে যায়। সুতরাং বলে ফেলো তোমার এখানে আসার উদ্দেশ্য।'

খিলখিল করে হেসে উঠল সোহানা। মাথা নাড়া দিয়ে চুলগুলো পিছন দিকে সরিয়ে দিয়ে বলল, 'চালাকি, না? আমার পেট থেকে একটা কথাও বের করতে পারবে না তুমি।'

গম্ভীর মুখে বলল রানা। 'বেশ, ভাল কথা।'

'রাগ করলে?' সোহানা দরদ দেখাবার ভান করল। 'রেগো না, আজ তোমাকে নতুন সম্মানে ভূষিত করব আমি। উপাধিটা একটা শব্দ—বীরপুরুষ।'

'কেন বলো তো?'

সোহানা হঠাৎ ঠাট্টা ভুলে গেল, নামিয়ে নিল চোখ জোড়া, চুপ করে রইল কিছুক্ষণ, তারপর মৃদু গলায় বলল, 'তুমি এক আশ্চর্য মানুষ, রানা। তুমি না থাকলে আজ এতক্ষণ একটা লাশ হয়ে থাকতাম আমি। একদিনে আমাকে দু'বার বাঁচিয়েছ তুমি। তোমার পায়ের শব্দ শুনেই আমার রুম থেকে তখন পালিয়েছিল কবীর চৌধুরী। তুমি অদ্ভুত মানুষ, রানা।' সোহানার গলায় স্বীকৃতি।

অস্বস্তিবোধ করছিল রানা। কি যেন বলতে গিয়ে বলতে পারল না, তারপর গলা পরিষ্কার করে নিয়ে বলল, 'তখন তোমাকে কবীর চৌধুরীই আক্রমণ করেছিল ঠিকই বলেছ তুমি, সোহানা। দ্বিতীয়বারও ইচ্ছাকৃতভাবে আমাদেরকে ডুবিয়ে মারতে চেষ্টা করল ও।'

'কিন্তু কেন, রানা?'

'জানি না,' অন্যমনস্ক ভাবে উত্তর দিল রানা।

চার

রানার সুইটে সিটিংরুমে বসে সকালের কফি পান করছিল ওরা। সোহানা নিজের সুইট থেকে এসেছে রানার নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে।

স্নান করে সেজেগুজে এসেছে সোহানা। মেরুন রঙের শাড়িতে খুব সুন্দর মানিয়েছে ওকে। সদ্য ফোটা তাজা পদ্মফুলের মত লাগছে ওকে।

কফির পেয়ালা তখনও শেষ হয়ে যায়নি, পোর্টার একটা খাম দিয়ে গেল।

ছোট একটা চিঠি। গিয়াকোমা পাঠিয়েছে। খাম ছিঁড়ে ফেলল রানা।

'প্রিয়বরেষু,' গিয়াকোমা লিখেছে, 'এই মাত্র গত রাতের দুর্ঘটনার কথা শুনলাম আমি। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তোমরা কোনও প্রকার আঘাত পাওনি। ক্রুজারটা আমারই বন্ধু সিজার মানাটোফের। ভুলবশত দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় দিয়েছে সে, ঘটনাটা সম্পর্কে তার নিজের বক্তব্য এটা। আমাকে সে অনুরোধ

করেছে তোমার সাথে তার দেখা করিয়ে দেবার জন্যে, যাতে স্বয়ং তোমার কাছে ক্ষমা চাইতে পারে। আজকেই ওর ভেনিস ত্যাগ করার কথা, কিন্তু তোমার জন্য অপেক্ষা করতে চায় সে। তোমার সুযোগ মত আমাকে ফোন কোরো এ ব্যাপারে।

ওই গন্‌ডোলিয়ারের কোন সন্ধান নেই।

বন্ধু, গিয়াকোমা।'

'সিজার মানাটোফ?' রানার হাতে থেকে চিঠিটা নিয়ে পড়ে ফেলেছে সোহানা, 'কবীর চৌধুরীর ছদ্মনাম?'

'বিশ্বাস করি না। সরাসরি খুন করার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে আমাদের মুখোমুখি হবে না কবীর চৌধুরী। মানাটোফ ওর সাঙ্গপাঙ্গ গোছের কেউ হবে। আমি ভাবছি মানাটোফের সাথে গিয়াকোমার বন্ধুত্বের কথা।' রানা চিন্তিত।

'গিয়াকোমা কেমন লোক?'

'সেজন্যেই অবাক হচ্ছি,' জোর দিয়ে বলল রানা। 'দেখা যাক, এখুনি ডেকে পাঠাচ্ছি ওদেরকে।'

সোহানা প্রশ্ন তুলল, 'কিন্তু মানাটোফই যদি কবীর চৌধুরী হয়?'

'একবার না—দু'দু'বার যখন চেষ্টা করেছে, তখন তৃতীয় বারও চেষ্টা করবে সে পথের কাঁটা দূর করার। কি ষড়যন্ত্রে সে লিপ্ত এখানে জানি না। সম্ভবত সন্দেহ করেছে আমরা ওর পরিচয় জেনে ফেলেছি, তাই বেপরোয়া হয়ে উঠেছে খুন করার জন্যে। কিন্তু কবীর চৌধুরী যতই মরিয়া হয়ে উঠুক,' রানা হাসল, 'সে চেনে মাসুদ রানাকে। মাসুদ রানার হোটেল রুমে ঢুকে তাকে খুন করার কথা সে ভাবতে সাহস পাবে না।' বেডরুমে চলে গেল রানা গিয়াকোমাকে ফোন করার জন্যে।

ক মিনিট পরই সত্য বলে প্রমাণিত হলো রানার বিশ্বাস। সিজার মানাটোফ কবীর চৌধুরী নয়। লোকটার ভুঁড়ি আছে, সরু গোঁফ ঠোঁটের উপরে, গায়ের রঙ রোদে পুড়ে প্রায় তামাটে। পরিচয় পর্ব শেষ হতে রানা এবং সোহানার কাছে আনুষ্ঠানিক ভাষায় ক্ষমা চাইল সে। তারপর ব্যাখ্যা করল দুর্ঘটনার কারণ। সব দোষ চাপাল অ্যানগেলোর উপর। লোকটা নাকি কানে কম শোনে আর ঘটে মোটামুটি বুদ্ধি থাকা সত্ত্বেও খাটায় কম। প্রথমে অবশ্য মানাটোফ গন্‌ডোলাটাকে দেখতে পায়নি। দেখার পর সে অ্যানগেলোকে থামাতে বলে ক্রুজার। কিন্তু অ্যানগেলো ফুল স্পীডে সামনে বাড়তে থাকে। ফলে দুর্ঘটনাটা ঘটে—ইত্যাদি ইত্যাদি।

মানাটোফ মিথ্যে কথা বলছে বুঝতে পারল রানা। ক্রুজারের ককপিটে দু'জন মাত্র লোক ছিল। একজন কবীর চৌধুরী। অ্যানগেলো অন্যজন। মানাটোফ ছিল না। কিন্তু প্রমাণ করতে চাইছে সে ক্রুজারে ছিল। ঘটনাটা কণ্ঠস্থ করে এসেছে আগাগোড়া কবীর চৌধুরীর কাছ থেকে শুনে।

সিগারেট অফার করল রানা ওদেরকে। গিয়াকোমা, মানাটোফ, দু'জনকেই একটা করে সিগারেট দিয়ে নিজেরটা মেঝেতে ফেলে দিল রানা। ঝুঁকে পড়ে সিগারেট তুলতে গিয়ে সোহানার সাথে চোখাচোখি হলো ওর।

সোহানার দৃষ্টি দেখেই মনোভাবটা বুঝে ফেলল রানা।

মানাটোফের গল্প অস্বীকার করে লাভ হবে না কিছুই। বরং গল্পটা বিশ্বাস করেছে ওরা একথা জেনে গিয়ে মানাটোফ কবীর চৌধুরীকে বললে মিথ্যে স্বস্তি পাবে সে। সোহানাও এই মতে বিশ্বাস করে। রানা ধন্যবাদ জানাল মানাটোফকে নিজে এসে ব্যাপারটা খোলাসা করার জন্যে। নিখোঁজ গন্ডোলিয়ারের জন্যে গিয়াকোমাকে একশো পাউন্ডের একটা চেক লিখে দিল রানা। মানাটোফ প্রতিশ্রুতি দিল সেও সমপরিমাণ টাকা গন্ডোলিয়ারের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেবে।

কফি-পর্ব শেষ হবার পর গিয়াকোমা বলল, 'উঠি, রানা। ঘণ্টাখানেক পর ইউরোপা বারে থাকব আমি। বেরুবে নাকি তোমরা?'

রানা বলল, 'ওদিকেই যাব আমরা। দেখা করব, যদি সম্ভব হয়।'

রানা আর সোহানার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল ওরা। মানাটোফ যাবার সময় বলে গেল, 'আজই ভেনিস ছাড়ছি আমি। আবার দেখা হবে আমাদের।'

ওরা চলে যেতে রানা সোহানাকে বলল, 'হুমকি দিয়ে গেল মানাটোফ, বুঝতে পেরেছ?'

'আবার দেখা হবে বলল, তাই না?'

মাথা নাড়ল রানা। সোহানা কি যেন বলতে যাচ্ছিল, বেডরূমে ফোন বেজে উঠল। সোহানা উঠে গেল চেয়ার ছেড়ে।

পঁচিশ সেকেন্ড পর ফিরে এল সোহানা। রানার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল দুই রূমের দরজার মাঝখানে। সোহানার সারামুখে কেউ যেন এক পোঁচ কালি মাখিয়ে দিয়েছে।

'পুলিস, রানা,' সোহানা নিচু গলায় বলল, 'ম্যানেজার তোমায় ডাকছে ফোনে।'

চেয়ার ছেড়ে উঠে বেডরূমের দিকে পা বাড়াল রানা, 'ভয় পেলে নাকি? ও কিছু না, রুটিন চেক।'

বেডরূমে ঢুকে তেপয়ের উপর থেকে রিসিভার তুলে নিল রানা, 'হ্যালো।'

'মি. মাসুদ রানা? পুলিস কমান্ডার মি. গ্যালিনি দেখা করতে চান আপনার সাথে।' ম্যানেজারের গলায় সতর্কতা, 'উপরে নিয়ে আসব ওঁকে?'

'অভকোর্স। প্লীজ ব্রিং হিম আপ অ্যাটওয়াঙ্গ,' সহজ গলায় বলল রানা।

এক মিনিট পরই দরজায় টোকা পড়ল। 'প্লীজ কাম ইন,' রানা বলল।

সিটিংরূমের দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল, লম্বা-চওড়া সুপুরুষ গ্যালিনি। ইউনিফর্মের সাথে বিভিন্ন ব্যাজ যুক্ত দেখেই বোঝা যায় পদস্থ পুলিস অফিসার সে।

'আপনাকে আর দরকার হবে না।' ম্যানেজারকে বলল গ্যালিনি। ম্যানেজার মাথা নেড়ে বিদায় নিতেই বাইরের দু'জন পুলিস দরজাটা বন্ধ করে দিল।

রানা বলল, 'বসুন, কমান্ডার।'

'থ্যাংক ইউ।' গ্যালিনি সরাসরি তাকাল রানার দিকে। 'আপনারা বড় রকমের একটা অন্যায় করেছেন, মি. রানা।'

রানা কথা বলতে গিয়ে বাধা পেল। হাত নেড়ে অফিসার থামিয়ে দিল রানাকে, 'শেষ করার সুযোগ দিন আমাকে। আপনারা গতরাতে এমন একটি ঘটনার সাথে জড়িত ছিলেন যার ফলে একজন ইটালিয়ান সিটিজেন মারা গেছে। এবং ঘটনাটা সম্পর্কে আপনারা নিকটস্থ থানা হেডকোয়ার্টারে রিপোর্ট করতে ব্যর্থ হয়েছেন। অপরাধ ঢাকার এই উপায়কে কি নামে অভিহিত করতে বলেন আমাকে?'

আশা করেনি রানা। কিন্তু নিজের ভুল বুঝতে পারল ও। কবীর চৌধুরী পুলিস লেলিয়ে দিয়েছে। সঠিক পদক্ষেপ নিয়েছে শয়তানটা। রানা গম্ভীর হলো একটু। 'পরিষ্কার করে বলুন যা বলতে চান, কমান্ডার। আমাদের হাতে সময় খুব কম।'

মুখের গাম্ভীর্য এতটুকু এদিক ওদিক হলো না গ্যালিনির। 'গতরাতে গ্র্যান্ড ক্যানেলের মোহনায় বেড়াতে গিয়েছিলেন আপনারা একটা গন্ডোলায় চড়ে। আপনি গন্ডোলা ভাড়া করার সময় তর্ক করেছিলেন গন্ডোলিয়ারের সাথে। আপনার বান্ধবী,' অফিসার সোহানার দিকে তাকাল, 'আপনি, মিস সোহানা, আপনার বন্ধুকে সিন ক্রিয়েট না করার অনুরোধ করে বলেছিলেন যে অত বেশি ড্রিঙ্ক করা উচিত হয়নি তোমার। গন্ডোলায় চড়েও গন্ডোলিয়ারের সাথে,' আবার ফিরে তাকাল রানার দিকে, 'আপনি তর্ক করছিলেন। গন্ডোলিয়ার এবং আপনি গ্র্যান্ড ক্যানেলের মোহনায় উত্তেজিত অবস্থায় দাঁড়িয়েছিলেন মুখোমুখি। সে-সময় একটি ক্রুজার ধীর গতিতে এগোচ্ছিল। তারপর আপনি হঠাৎ বেশি উত্তেজিত হয়ে পড়েন। এবং গন্ডোলিয়ারকে আঘাত করার জন্যে হাত ওঠান। গন্ডোলিয়ার লাফিয়ে পড়ে পানিতে। ক্রুজারের সাথে ধাক্কা লাগে গন্ডোলার।' মুখস্থ বলে যাচ্ছে গ্যালিনি, 'আপনারা সাঁতরে তীরে ওঠেন। এবং নিরীহ গন্ডোলিয়ার, একজন ইটালিয়ান সিটিজেন, সলিল সমাধি লাভ করে। আরও পরিষ্কার করে বলবার দরকার আছে মি. মাসুদ?'

উত্তর দিতে দেরি করল না রানা। 'ভুল রিপোর্ট পেয়েছেন আপনি, কমান্ডার। আমি নেশাগ্রস্ত ছিলাম না এবং যা বললেন তা প্রমাণ করা সম্ভব নয় আপনাদের পক্ষে।'

'আপনার সাথে আমি একমত নই, মি. মাসুদ,' অফিসার দৃঢ় কণ্ঠে বলল, 'কারণ ছাড়া, প্রমাণ ছাড়া ইটালিয়ান পুলিস মুভ করে না।'

সোহানা কথা বলল এবার। 'কিন্তু কমান্ডার, আমার বন্ধু ড্রিঙ্ক করেনি। গন্ডোলিয়ারের সাথে ওর কোন ঝগড়াও হয়নি, ক্রুজারটাই আক্রমণ করেছিল আমাদের।'

'দুঃখের বিষয়, আপনার সাথেও একমত হতে পারছি না আমি।' অফিসার ঘড়ি দেখল, 'আমার সুপিরিওরদের বিবেচনাধীন কেস এটা, তাঁদের সিদ্ধান্তটা জানানো আমার কর্তব্য।'

'তাঁদের সিদ্ধান্তটা কি শুনি?' রানা খেপে উঠছে আস্তে আস্তে।

'আপনারা ভিজিটর হলেও ইটালির আইনের বাইরে নন। যদি অভিযোগ অস্বীকার করেন তাহলে গ্রেফতার না করে উপায় নেই আমাদের। শুনানির জন্যে আপনাদেরকে সময় মত হাজির করা হবে কোর্টে। সময় আগে থেকে জানাতে পারছি না আমরা। কোর্ট এখন ভীষণ ব্যস্ত। কম করে তিনমাস লাগবে সিরিয়াল অনুযায়ী বিচার হলে। তবে বিকল্প ব্যবস্থা করা যায় একটা। ইটালি সরকার ভিজিটরদের যে সুযোগ দিয়ে থাকেন তার সদ্ব্যবহার করতে পারেন আপনারা। আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে যদি ইটালিয়ান টেরিটরি ছেড়ে চলে যান তাহলে আপনাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে নেয়া হবে।'

গ্যালিনি থামতেই সোহানা বলে উঠল, 'আমরা কোন ঝামেলা করতে চাই না, রানা।'

গাম্ভীর্য টলে উঠল অফিসারের। সোহানা আর রানার আলাপের একটি বর্ণও বুঝতে পারল না সে। কিন্তু বাংলা ভাষার মিঠে উচ্চারণ কৌতূহলী করে তুলেছে তাকে।

'কি বলতে চাইছ?' বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করল রানা।

'গ্রেফতার হতে চাই না আমি, রানা।' সোহানা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। ইটালি পুলিসের হাতের মুঠোয় গিয়ে পড়লে ভণ্ডুল হয়ে যাবে ওর প্ল্যান। এমনিতেও যাবে, ইটালির বাইরে চলে যেতে হলে। কিন্তু পুলিস লেলিয়ে দেবার পিছনে কবীর চৌধুরী, না স্বয়ং ইটালি সরকার জড়িত তা জানা সম্ভব নয় ওর পক্ষে। স্বেচ্ছায় বন্দী হবার চেয়ে ইটালির বাইরে গিয়ে মুক্ত থাকাটা অনেক কাজের হবে। সে কথাই আবার বলল সোহানা, 'আমার উদ্দেশ্য বানচাল হয়ে যাচ্ছে দু'ভাবেই, রানা। কিন্তু ইটালি সরকারের মুঠোয় পড়তে চাই না আমি। ওরা হয়তো আমার পরিচয় এবং উদ্দেশ্য আঁচ করতে পেরেই পিছনে লেগেছে। তোমাকে অবশ্য পরামর্শ দেবার আমি কেউ নই, অফিশিয়ালি। তবে বন্ধু হিসেবে বলব তুমিও রাজি হয়ে যাও ইটালি ত্যাগ করতে। কবীর চৌধুরীকে তুমি নাকানি-চোবানি খাইয়েছ, সুযোগ মত আবার ঘায়েল করতে পারবে তাকে। কিন্তু তার পরিকল্পনা মত সবকিছু ঘটতে দিলে হিতে বিপরীত হবে। আপাতত তার পথ থেকে তুমি সরে গেলে সে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকবে। কিভাবে তাকে দমন করবে তা মুক্ত এলাকায় বসে চিন্তা ভাবনা করতে পারবে তুমি।'

সোহানার কথায় যুক্তি আছে। রানা দ্রুত ভাবছিল। এভাবে ভিজে-বেড়ালের মত লেজ গুটিয়ে পালিয়ে যেতে ওর পৌরুষে লাগছে। কিন্তু ঝোঁকের মাথায় কিছু করা ঠিক হবে না তাও সত্যি।

'আপনাদের মতামতের জন্যে আমি অপেক্ষা করছি, মি. মাসুদ।' নিস্তব্ধতা ভাঙল অফিসার।

জবাব দিল সোহানা। 'আমরা বরং ইটালি ত্যাগ করব কমান্ডার।' ক্রোধ ও ঘৃণা ফুটে উঠল ওর চোখেমুখে, কিছুই লুকোবার চেষ্টা করল না ও। 'আপনাদের আচরণে আমরা মর্মাহত। আশা করি আপনার ওপরঅলাদের

কথাটা জানাবেন। আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে আমরা ইটালি ত্যাগ করব।'

'ধন্যবাদ, মিস সোহানা।' অফিসার হাঁফ ছেড়ে বাঁচল যেন। 'বিদেশী অতিথিদের অ্যারেস্ট করা একটা জঘন্য কর্তব্য। আপনারা আমাকে রেহাই দিয়েছেন, অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনাদের পাসপোর্ট, প্লীজ।'

কোন কথা বলল না রানা। সোহানা চলে গেল নিজের সুইটে। তিন মিনিট পর পাসপোর্ট নিয়ে এসে অফিসারের হাতে দিল ও। রানা আগেই দিয়েছে নিজেরটা। অফিসার দশ মিনিট পর ফিরে আসছে বলে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

অফিসার বিদায় নিতেও কোন কথা বলল না রানা। ওর মনে খোঁচা মারছে শুধু একটি প্রশ্ন—সোহানা ভয় পেয়েছে—কেন?

কি অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে এসেছে সোহানা?

ইউরোপা বারে ভিড় দেখে সাবধান হয়ে গেল সোহানা। কবীর চৌধুরী শেষবার হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থের চেষ্টা করলে অবাক হবার কিছুই নেই। রানার দিকে তাকাল ও। বোঝা গেল না কি ভাবছে রানা।

গিয়াকোমাকে ঘিরে রেখেছে একদল লোক। সবখানেই পরিচিত লোক থাকে ওর। রানাদের টেবিলে পৌঁছুতে আরও কুড়ি মিনিট দেরি হলো তার। চেয়ারে বসেই প্রশ্ন করল, 'আই ডোন্ট অ্যান্ডারস্ট্যান্ড, রানা। এমন তাড়াহুড়ো করে কর্তারা তোমাদেরকে বের করে দিচ্ছে কেন?'

'তুমি জানলে কি ভাবে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

গিয়াকোমা খুলে বলল সব, 'তোমার কাছ থেকে বাড়ি ফেরার পরই ফোন করে আমাকে চীফ অভ পুলিস। অনেকদিন আগে পরিচয় হয়েছিল ভদ্রলোকের সাথে। আমাকে জিজ্ঞেস করল তুমি আমার বন্ধু কিনা। হ্যাঁ বলতেই বলল ব্যাপারটা জাতীয় স্বার্থের সাথে জড়িত সিনর গিয়াকোমা। আপনার বন্ধুর পিস্ অভ মাইন্ড যদি বজায় রাখতে চান তাহলে কোনরকম তৎপরতা না দেখিয়ে সীমানা অতিক্রম করার জন্যে পরামর্শ দিন তাকে। আমি বললাম—কিন্তু আমার বন্ধু সম্পর্কে আমিও কম জানি না। সে তার দেশের একজন সম্মানিত নাগরিক। এতে চীফ জানাল তাদের ইনফরমেশন নাকি সম্পূর্ণ উল্টো আর সিক্রেট। এর পরপরই ফোন ছেড়ে দেয় ভদ্রলোক।'

গোটা পৃথিবীতে এক ডজনেরও কম লোক জানে রানার আসল পরিচয়। গিয়াকোমাও জানে না। জানে কবীর চৌধুরী। কবীর চৌধুরী পুলিসকে জানিয়ে দিয়েছে যা জানাবার। দ্রুত চিন্তা করছিল রানা। হঠাৎ প্রশ্ন করল ও, 'মানাটোফকে কতদিন থেকে চেনো তুমি, গিয়াকোমা?' সবটা জানতে চায় ও, 'কি জানো ওর সম্পর্কে?'

'খুব বেশি দিনের পরিচয় নয় ওর সাথে। আমাদের ইয়ট ক্লাবের মেম্বার। দু'একবার ব্রিজও খেলেছি। খুব ধনী লোক। বারলেটায় বসবাস করে। ইটালির দক্ষিণে, অ্যাপুলিয়ায়। লাইট ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ব্যবসা করে। একটা ফ্যাক্টরি আছে, এয়ারক্র্যাফটের পার্টস তৈরি করে। মোটামুটি এই জানি।'

গিয়াকোমা রানার গাম্ভীর্যে রীতিমত বিস্মিত হয়েছে। 'কি ব্যাপার, রানা? কিছুই বোধগম্য হচ্ছে না আমার। খুলে বলতে আপত্তি আছে?'

রানা তাকিয়ে রইল গিয়াকোমার দিকে কয়েক সেকেন্ড। তারপর সোহানা আর নিজের পাসপোর্টটা পকেট থেকে বের করে বাড়িয়ে দিল ওর দিকে।

পাসপোর্টের উপর অ্যাডিশনাল এন্ট্রিতে লেখা : পারমিশন টু সারকুলেট অন ইটালিয়ান টেরিটরি ইজ উইথড্রন উইথ এফেক্ট ফ্রম মিডনাইট অন টুয়েনটি ফিফথ ইনস্ট্যান্ট। টানা হাতের লম্বা একটা সই নিচে, বড় একটা সীলের উপর। গিয়াকোমা চোখ তুলে বলল, 'দ্যাটস অফিশিয়াল, অল রাইট।' একটু হাসল ও, আশ্বস্ত করতে চাইল রানাকে, 'অবশ্য দুশ্চিন্তা কোরো না তোমরা। ব্যাপারটা খোঁজ নিয়ে দেখছি আমি। ক্রিমিন্যালদের মত দেশ থেকে বেরিয়ে যাবে তোমরা—অসম্ভব, আমি তা হতে দিতে পারি না।'

'না, মি. গিয়াকোমা,' এতক্ষণ পর কথা বলল সোহানা, 'আমরা নিজেদের স্বার্থেই বর্ডার ক্রস করব।'

রানা বলল, 'সব কথা বলা যাবে না, গিয়াকোমা। দুঃখিত। এ ব্যাপারে তোমার করার কিছুই নেই। আমরা খানিক পরই রওনা হচ্ছি ব্রেনার পাসের উদ্দেশে।'

গিয়াকোমা স্বদেশ থেকে বন্ধুকে এমন জঘন্যভাবে বের করে দেয়া হচ্ছে দেখে লজ্জায় দুঃখে চুপ করে রইল অনেকক্ষণ। নানা ভাবে ওর মনের ক্ষোভ দূর করতে চেষ্টা করল রানা। আধঘণ্টার মত গল্প করে বিদায় নিল ওরা। গিয়াকোমা কথা বলতে পারল না ভাল করে। আঘাত পেয়েছে লোকটা রানাকে এভাবে বিদায় নিতে হচ্ছে দেখে।

হোটেল আম্পালা থেকে নিচে নামল ওরা সাড়ে চারটের দিকে। রানার গাড়ি বেন্টলীতে ব্যাগ তুলে দিয়ে গেছে পোর্টার আগেই।

ভেনিস থেকে রাস্তাটা মেসট্রির মেনল্যান্ডে গিয়ে মিশেছে। অনেকক্ষণ নিঃশব্দে ড্রাইভ করল রানা। পরাজয়ের অনুভূতিটা নিষ্কৃতি দিচ্ছে না ওকে। অতি সহজে হার স্বীকার করেছে ও। সোহানাকে কথাটা ও বলেই ফেলল, 'আর একবার ভেবে দেখো, সোহানা। কবীর চৌধুরী কি ষড়যন্ত্র করছে তা না জেনেই পালাচ্ছি আমরা।'

সোহানার কোন দ্বিধা নেই, 'পালাচ্ছি কে বলল? আপাতত ক্ষমা করে দিয়ে যাচ্ছি শয়তানটাকে। কবীর চৌধুরী কি ষড়যন্ত্র করছে তা আমরা জানবই। এখানেই ক্ষান্ত দিচ্ছি না আমরা।' সোহানা হঠাৎ শব্দ করে হেসে উঠল, 'আমরা না বলে ''আমি' বলাই ভাল। তুমি তো ছুটিতে।'

'কবীর চৌধুরী বেঁচে থাকতে আমার ছুটি নেই। ছুটি ক্যান্সেল করে দিয়েছি আমি।' রানাকে সত্যি সত্যি কঠোর মনে হলো সোহানার।

ক্লান্ত হয়ে পড়েছে ওরা। গত কয়েক ঘণ্টায় অনেকগুলো কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে।

রাত কাটাবার জন্যে ভেরোনাতে থামবে ঠিক করেছে রানা। সময়-সীমা

থাকতে থাকতেই ওখান থেকে বর্ডার পার হয়ে ইটালি ছাড়া যাবে অনায়াসে। ইনসব্রুক থেকে বর্ডার পঁচিশ মাইল মাত্র। ইনস্‌ব্রুককেই সোহানাকে নিয়ে উঠবে ও।

ডাইসেন্‌জার কাছাকাছি এসে রানা গাড়ির গতি কম করল আরও খানিকটা। দশ মাইল আগে থেকেই স্পীড ক্রমশ কমিয়ে আনছে ও।

সোহানা নিস্তব্ধতা ভাঙল হঠাৎ. 'ওরা কারা, রানা?'

'জানি না.' স্পীড বাড়িয়ে দিয়ে বলল রানা, 'তবে ভাই-বেরাদার কেউ নয়।'

রীয়ার উইন্ডো দিয়ে আরেকবার পিছনে তাকাল সোহানা। প্রায় মাইল খানেক রাস্তা সোজা সমতল পড়ে রয়েছে পিছনে। খুব কম ট্রাফিক। সিকি মাইলের চেয়েও কম দরে রয়েছে স্পোর্টস্‌ স্যালুনটা। লেটেস্ট মডেল। ভারী বেন্টলীর চেয়ে শক্তিশালী তাতে সন্দেহ নেই। ডাইসের্নজারের ভেতর দিয়ে যাবার সময় গাড়িটা আরও নিকটবর্তী হলো। একটা ইন্টার-সেকশনের কাছে আলফা-রোমিও বাধ্য হলো বেন্টলীর পিছনে থামতে। সোহানা দেখল চারজন প্যাসেঞ্জার গাড়িটায়। ধোপ-দুরস্ত পোশাক পরা সাধারণ ইটালিয়ান ব্যবসায়ী-দের মত হাবভাব। নাম্বার প্লেট দেখে একটু অবাকই হলো ও। বারীতে রেজিস্টার করা গাড়ি। বারী ইটালির অপর প্রান্তের কাছাকাছি একটি বড় শহর। অনেক দূর পাড়ি দিয়েছে গাড়িটা। কিন্তু অনুসরণ করছে কেন ওরা?

ভেরোনা পেরোবার সময় মাত্র কয়েক গজ পিছনে লেগে রইল আলফা-রোমিও। ঘণ্টায় একশো মাইল বেগে ছুটছে দুটো গাড়ি। আলফা-রোমিওকে খসাবার কোন চেষ্টা করল না রানা।

ছ'টা বাজতে কয়েক মিনিট বাকি থাকতে ভেরোনার বাইরে এসে পড়ল গাড়ি। ভেরোনায় রাত কাটাবার কথা, কিন্তু থামল না রানা। টেরেন্টোর মেন রোড বেছে নিল ও। সিটির টাউন কন্ট্রোল পয়েন্ট অতিক্রম করার সময় মাত্র পাঁচ ছয় গজ পিছনে দেখা গেল আলফা-রোমিওকে। N 12 এ উঠে এল রানা গাড়ি নিয়ে। ইটালি থেকে অস্ট্রিয়া এবং ওয়েস্ট জার্মানী যাবার জন্যে N 12 প্রধান রাস্তাগুলোর অন্যতম। হাইওয়েতে উঠে ভেনিস ছাড়ার পর এই প্রথম বেন্টলীর তীব্রগতি কাজে লাগাল রানা। এদিকের রাস্তাঘাট ভালভাবে চেনে ও। একটা প্ল্যান করে নিল মনে মনে। ছোটখাট শহর ডোমেগলায়ারায় পৌঁছুবার পর ও যদি হঠাৎ সাইড টার্ন নিতে পারে তাহলে আলফা-রোমিওকে আধমাইল পিছনে রেখে ভেরোনায় অনায়াসে ফিরে যেতে পারবে। কিন্তু রেলওয়ে ক্রসিং-এর কথা ভাবেনি রানা। প্রথম দুটো খোলা পেল। আশি মাইল স্পীডে পেরিয়ে গেল ও। মোড় নেবার পর এক কিলোমিটারের মধ্যে আর একটা লেভেল ক্রসিং। গেট বন্ধ। নিরুপায় হয়ে বেন্টলী দাঁড় করাল রানা। স্পোর্টস্‌ স্যালুন আলফা-রোমিও সজোরে এসে ব্রেক কষে দাঁড়াল পাশেই। চারজন প্যাসেঞ্জারের কেউই ফিরে তাকাল না ওদের দিকে। যেন কিছুই ঘটেনি।

ট্রেন চলে যেতে গেট উঠে গেল উপরে। রানা দাঁড় করিয়ে রাখল গাড়ি।

পিছন থেকে হর্ন বেজে উঠল তিন-চারটে গাড়ির। কিন্তু আলফা-রোমিও স্টার্ট নিল না। আধ মিনিট দাঁড়িয়ে থেকে বাধ্য হয়ে গাড়ি ছেড়ে দিল রানা। স্টার্ট নিয়ে পিছু ধরল আলফা-রোমিও।

পরবর্তী বড় শহর টেরেন্টো। সোহানা বলল, 'বোঝা গেল ব্যাপারটা। কোনমতেই হারাতে চায় না ওরা আমাদেরকে। ভাবছি থামবার পর কি ঘটবে। ভেবে কিনারা পাচ্ছি না কেন অনুসরণ করছে ওরা।' হাসল ও 'শেষ পর্যন্ত কোথায় থামব আমরা তা জানার জন্যে প্রচুর পরিশ্রম করেছে বেচারারা। রানা, আমি বিশ্বাস করি না ওরা পুলিসের লোক কবীর চৌধুরীরই লোক এরা।'

'হতে পারে,' বলল রানা। 'আমরা ইটালি ত্যাগ করছি সে ব্যাপারে ডেফিনিট রিপোর্ট চায়।'

টেরেন্টো পৌঁছে গাড়ির গতি কমাতে হলো। আঁকাবাঁকা রাস্তা, একপাশে রেল লাইন, অপর পাশে নদী। সন্ধেটা চমৎকার। গাছে ফুল ফুটেছে। চাঁদ ওঠেনি, তবে তারার সমাবেশ আকাশ জুড়ে। এই মনোমুগ্ধকর পরিবেশে ভাবতে অবাক লাগে যে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে দু'বার ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছিল ওদেরকে।

শহরের মাঝামাঝি জায়গায় পৌঁছুল বেন্টলী। এক শো কুড়ি মাইল দৌড়েছে গাড়িটা। এরপর স্নান ও পান করার কল্পনা নিতান্ত আকর্ষণীয় হয়ে উঠল সোহানার মনে।

লেক গারডা এবং ব্রেসিয়ার মধ্যবর্তী রাজপথের উপর হোটেল একসেলশিয়র। এদিককার অন্যান্য হোটেলের মতই গ্যারেজটা হোটেলের পিছন দিকে।

হোটেলের সামনে গাড়ি দাঁড় করাল রানা। গাড়ি থেকে নেমে বলল, 'বসো তুমি। রুম খালি আছে কি না দেখি। রিভলভারটার কথা স্মরণ রেখো। আলফা-রোমিও ইচ্ছা করে পিছনে রয়ে গেছে বলে আমার বিশ্বাস। আধমিনিটের ভেতর পৌঁছে যেতে পারে।'

সোহানার কানে সব কথা ঢুকল না। হ্যান্ডব্যাগ খুলে মেকআপ ঠিকঠাক করতে ব্যস্ত ও।

রানা সুইং ডোর ঠেলে হোটেলের ভিতর ঢুকতেই হল পোর্টার মুখ তুলে তাকাল, 'গুড ইভনিং, স্যার।' ইংরেজিতে ওইটুকুই দৌড় তার, আঙুল বাড়িয়ে ডেস্ক ক্লার্কের দিকে এগোতে বলল সে রানাকে।

হোটেলের সামনের দিকে গাড়ি না দেখে বোর্ডার প্রায় নেই বুঝে নিয়েছে রানা। ক্লার্ককে রুমের কথা জিজ্ঞেস করতে একটু অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল সে ওর দিকে। অপ্রত্যাশিত গেস্ট দেখে ইতস্তত করছে লোকটা। খবর না দিয়ে গেস্ট বড় একটা আসে না এদিককার হোটেলে। রানা রিপিট করল রুমের কথা। ক্লার্ক চার্ট খুলে চোখ বুলাতে শুরু করল। খানিকপর মাথা তুলে জানতে চাইল, 'ক'টা রুম দরকার আপনার, স্যার?'

'দুটো বেডরুম।'

'আপনি এশিয়ান, স্যার?'
'ও ইয়েস।' বিরক্ত হলো রানা।
'আসল কথা আমাদের হোটেল এখনও ফুল স্টাফ নিয়ে চালু হয়নি।' ক্লার্কটা ঠিক কি বোঝাতে চায় ধরতে পারল না রানা।
'রুম হবে, না হবে না?' সরাসরি প্রশ্ন করল রানা।
'এখুনি আপনাকে জানাতে পারব বলে আশা করি, স্যার। ম্যানেজারের সাথে আমি আলাপ করে আসছি।' ক্লার্ক উঠে দাঁড়াল। 'আপনার নামটা, স্যার?'
'মাসুদ রানা।'
'দুটো বেডরুম কেন দরকার?'
লোকটার ব্যবহারে রীতিমত চটে উঠল রানা। কিন্তু কিছু বলবার আগেই 'ম্যানেজার' লেখা দরজাটা খুলে গেল ঝট করে। একজন লোক আধা ছুটন্ত ভাবে এগিয়ে এল ওদের দিকে। রানার দিকে দৃষ্টি তার। 'আপনার নাম মি. মাসুদ রানা?'
রানা ভ্রূ কুঁচকে দেখল লোকটাকে। 'কেন?'
'এক্সকিউজ মি, স্যার, ইংলিশ কারটা সম্ভবত আপনার?' ম্যানেজার শঙ্কিত, 'একজন মহিলা, সম্ভবত আপনার স্ত্রী ছিলেন ওটায়?'
'হ্যাঁ—কি হয়েছে?' রানা দ্রুত চিন্তা করার চেষ্টা করছে। সুইং-ডোর দিয়ে সোজা বাইরে তাকাল রানা। বেন্টলী নেই বাইরে।
'ব্যাপারটা কি?' দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করল রানা অধৈর্যভাবে।
'আপনার স্ত্রী সম্ভবত ইনএক্সপেরিয়েন্সড ড্রাইভার। কি কারণে ঠিক জানি না, গাড়িটা উনি হোটেলের সামনে থেকে গ্যারেজের দিকে নিয়ে গেছেন। আপনি জানেন গ্যারেজ পিছন দিকের বেসমেন্টের সাথে?'
ধমকে উঠল রানা, 'বাজে কথা বাদ দিয়ে কি হয়েছে বলুন।'
'ছোটখাটো একটা দুর্ঘটনা হয়েছে, স্যার। সিরিয়াস কিছু না অবশ্য। কিন্তু আপনি যদি একবার দেখেন স্বচক্ষে…'
রানা পা বাড়িয়ে দিয়েছে ততক্ষণ। ম্যানেজার বলে উঠল, 'এদিক দিয়ে তাড়াতাড়ি হবে, স্যার। আমার সাথে আসুন।' 'SERVIZIO লেখা দরজাটা দেখিয়ে দিল ম্যানেজার। দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল রানা। সামনেই সিঁড়ি।
'সিঁড়িটা সোজা গ্যারেজে গেছে…'
রানা দৌড়ুল। ম্যানেজার দ্রুত অনুসরণ করল তাকে। কিন্তু পিছিয়ে পড়ল সে বেশ খানিকটা। ডান দিকে দু'বার বাঁক নিল সিঁড়ি। শেষ ল্যান্ডিংয়ে পৌঁছে গ্যারেজের প্রসারিত জায়গাটা চোখে পড়ল রানার। এদিক ওদিক তাকাল ও। সোহানা বা বেন্টলীর কোন চিহ্ন নেই কোথাও। ম্যানেজারের দিকে তাকাবার জন্যে ঘাড় ফেরাল ও। কিন্তু তার আগেই পিছন থেকে মৃদু একটা শব্দ হলো।
আঘাতটা অসহ্য, টের পেল রানা সেই মুহূর্তে। কষ্ট বা ব্যথা কোনটাই ভোগ করতে হলো না ওকে। কংক্রিটের মেঝের উপর পড়ে গেল শরীরটা

নিজের অজ্ঞাতে। কপালের পাশে প্রচণ্ড এক আঘাত খেয়েই জ্ঞান হারিয়ে ফেলল রানা।

'দারুণ, স্টেফানো।' অপেক্ষাকৃত লম্বা ইটালিয়ান বাহবা দিল স্টেফানোকে, 'এক ঘুসিতেই কাত করে দিয়েছ। গাড়ির বুটে রেখে এসো ওকে। না, আসার দরকার নেই, পালাও তোমরা। কিন্তু সুন্দরী যেন বুঝে না ফেলতে পারে, সাবধান। উগো আর আমি থাকছি।' ম্যানেজারের দিকে তাকাল লোকটা, ডেস্ক ক্লার্ক আর হল পোর্টারও আছে সেখানে। 'মনে থাকবে তো যা বলেছি? চীফ অভ সিকিউরিটি পুলিসের স্পেশাল বাহিনীর লোক আমরা। যে লোকটাকে নিয়ে যাচ্ছি সে বিদেশের দুর্ধর্ষ একজন স্পাই। জাতীয় স্বার্থ জড়িত এ ব্যাপারে। সুতরাং মুখ খোলা চলবে না। এমন কি আঞ্চলিক পুলিস এলেও আমাদের কথা উল্লেখ করা নিষেধ। আপনারা একেবারে কিছুই জানেন না। কোন বিদেশী আপনাদের হোটেলে আজ ঢোকেইনি। মনে থাকবে?' গম্ভীর এবং কঠোর কণ্ঠস্বর লোকটার। স্টেফানো রানার অচেতন দেহটা নিয়ে চলে গেল গ্যারেজের বাইরে।

ম্যানেজার হাত কচলাতে কচলাতে অতি কষ্টে হাসল, 'থাকবে স্যার, অবশ্যই মনে থাকবে।'

'দেখবেন, আপনার কর্মচারীরা যেন ভুল-ত্রুটি করে না বসে।'

'না, স্যার। ওদেরকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিচ্ছি আমি। আর একবার ভাল করে শিখিয়ে পড়িয়ে নেব।'

লোকটার গাম্ভীর্যে এতটুকু রদবদল হলো না। 'তাহলেই ভাল। কোনরকম গোলমাল কোথাও যদি করে ফেলেন পরিণতির জন্যে সিক্রেট পুলিস দায়ী থাকবে না।' দৃঢ় পদক্ষেপে সিঁড়ির ক'টা ধাপ অতিক্রম করে গ্যারেজের দিকে নেমে গেল লোকটা।

ম্যানেজার বাকি দু'জনকে নিয়ে হলরূমে ফিরে এল। পাঁচ মিনিট ধরে বোঝাল সে পোর্টার আর ডেস্ক ক্লার্ককে। পোর্টার কথা বলে উঠল মাঝখানে, 'স্যার, ওই যে, ভদ্রমহিলা এদিকেই আসছেন।' চকিতে তাকাল সে হোটেলের সুইং-ডোরের দিকে।

তিনজন লোক যে-যার জায়গার দিকে দ্রুত পা বাড়াল। ম্যানেজার থমকে দাঁড়াল তাঁর চেম্বারের দোরগোড়ায়। ঘাড় ফিরিয়ে বাকি দু'জনার দিকে তাকাল সে। 'মনে থাকে যেন,' নাটকীয় ভাবে বলল সে, 'আমরা কিছুই জানি না—কিচ্ছু না।'

মেকআপ ঠিক করার ফাঁকে হোটেলের সুইং-ডোর ঠেলে রানাকে ভিতরে ঢুকতে দেখেছিল সোহানা। কয়েক সেকেন্ড পর গাড়ির পিছন দিকে তাকাল ও। ক্রমশ নিচু গ্যারেজের পথ দেখতে পেল ও। তারও দুশো গজ পরে ক্রসরোড মেন রোডের সাথে যুক্ত হয়েছে। আলফা-রোমিওর কথা মনে পড়ে যেতে মাথায় এক বুদ্ধি খেলে গেল সোহানার। আলফা-রোমিও বেন্টলীকে রাস্তার মাঝখানে হারিয়ে ফেলেছে, ধারণা করল ও। কিন্তু অনুমানের উপর নির্ভর করে এদিকে আবার এসে পড়তে পারে। এলেই

পরিষ্কার দেখতে পাবে বেন্টলীকে।

সোহানা হোটেলের সুইং-ডোরের দিকে তাকাল। এখনও ফিরে আসছে না রানা। হোটেলের ব্যবস্থাপনা কেমন পরীক্ষা করে দেখছে হয়তো। গাড়িতে স্টার্ট দিল সোহানা। গ্যারেজের দিকে না গিয়ে গাড়িটা সামনে এগিয়ে নিয়ে গেল ও। গলির ভিতর দাঁড় করিয়ে সিক্রেট মাস্টার সুইচ টিপে নেমে পড়ল সোহানা। ধীর পদক্ষেপে হোটেলের সামনে এসে দাঁড়িয়ে রইল ও। আলফা-রোমিও যদি এসে পড়ে তাহলে হোটেলের সামনের বাগানে নিজেকে লুকিয়ে ফেলতে পারবে ও। বেন্টলীকে হঠাৎ দেখতে পাবে না তারা।

মাঝেমধ্যেই মেন রোডের দিকে তাকাচ্ছিল সোহানা। আলফা-রোমিও আসছে না। ইতস্তত দৃষ্টিতে চারদিকের দৃশ্যের উপর নজর বোলাতে লাগল ও।

সন্ধ্যা জমাট বাঁধছে। তারা ফুটেছে আরও ঘন হয়ে। পাঁচ কি সাত মিনিট হয়ে গেছে হোটেলে ঢুকেছে রানা। হঠাৎ সচকিত হয়ে উঠল সোহানা। কোথাও কোন গাড়ির নামগন্ধ নেই। অথচ মোটর গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দ শোনা যাচ্ছে আশেপাশে। তীব্র গতিতে কোন গাড়ি ছুটে আসছে।

চোখের পলকে হোটেলের গ্যারেজের দিক থেকে একটা গাড়ির বেরিয়ে এল। মোড় নিয়েই মেন রোডের দিকে ছুটল গাড়িটা। চিনতে পেরে বিমূঢ় হয়ে পড়ল সোহানা। সম্পূর্ণ ভুল ধারণা করেছিল ও। আলফা-রোমিও ওদের আগেই হোটেলের গ্যারেজে পৌঁছে গিয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ অমন তুমুল গতিতে ছুটে বেরিয়ে গেল কেন গাড়িটা? প্যাসেঞ্জারদেরকে দেখার সুযোগও পায়নি সে।

বিরক্তিবোধ ধীরে ধীরে মাথা চাড়া দিয়ে উঠল সোহানার ভেতর। এত দেরি হবার কারণ কি রানার? সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে আরও দু'তিন মিনিট কাটল। মনে মনে রানার উপর খেপে উঠল ও। রাগের মাথায় সশব্দ পায়ে হোটেলের প্রবেশ পথের দিকে এগোল ও।

দশমিনিট পর ক্লান্ত ও পরাজিত হয়ে একই পথে হোটেল থেকে বেরিয়ে এল সোহানা। ম্যানেজার, ডেস্ক ক্লার্ক, হল পোর্টার—তিনজনই একবাক্যে বলেছে কোন বিদেশী আজ হোটেলে ঢোকেনি। সোহানার বুঝতে অসুবিধে হয়নি কিছুই। তিনজনের হাবভাবেই ধরা পড়ে গেছে সব। তাছাড়া গ্যারেজে নামার সিঁড়ির শেষ ধাপে পেয়েছে ও নাইলনের ক্যামেলিয়া ফুল। রানার বাটন হোলে পরিয়ে দিয়েছিল গিয়াকোমা। আলফা-রোমিওর লোকগুলো রানাকে কাবু করে নিয়ে চলে গেছে সে ব্যাপারে সন্দেহ নেই সোহানার।

বিভ্রান্ত হয়ে হোটেল থেকে বেরিয়ে সরাসরি গাড়িতে এসে উঠল ও। দ্রুত চিন্তা করে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে হবে। কি করতে পারে এখন সে? এখানে বিশ্রাম না নিয়ে মিলানে যেতে পারে গাড়ি চালিয়ে, সেখান থেকে এমব্যাসির মাধ্যমে খবর পাঠাতে পারে মেজর জেনারেলের কাছে। কিন্তু উত্তর পাবার আগেই নির্দিষ্ট আটচল্লিশ ঘণ্টা পার হয়ে যাবে। ইটালিয়ান পুলিস আটকে

দেবে কয়েদখানায়। না, রিস্ক নেবে না ও। ভেবে চিন্তে একটা পথ বের করল সোহানা। মিলানে পৌঁছে প্লেন ধরবে ও। সোজা লন্ডনে চলে যাবে। তারপর যোগাযোগ করবে ঢাকার সাথে।

মাস্টার কী রিলিজ করে গাড়ি স্টার্ট দিল সোহানা

'সীট স্টিল। ডোন্ট মুভ।' ঘাড়ের পিছনে ঠাণ্ডা ধাতুর ছোঁয়া পেয়ে স্থির হয়ে গেল সোহানার হাত দুটো। লোকটা এক হাত বাড়িয়ে দিয়ে হর্নের বোতামে চাপ দিল একবার।

আশপাশ থেকে বুট জুতোর শব্দ শোনা গেল হর্ন থামতেই। আর একজন ইটালিয়ান ফ্রন্ট ডোরের সামনে এসে দাঁড়াল। পিছন থেকে প্রথম লোকটা বলল, 'উঠে পড়ো, উগো। দেরি হয়ে গেছে এমনিতেই।'

উগো দরজা খুলে সোহানার পাশে বসল।

'এসব কি?' সোহানা পাশের লোকটার দিকে হিংস্র চোখে তাকাল, লোকটাকে চিনতে পেরেছে ও। আলফা-রোমিওর আরোহীদের একজন। সোহানা পিছনের লোকটাকে দেখতে না পেলেও বুঝল সে-ও আলফা-রোমিওর আরোহী।

'কি চাও তোমরা?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল সোহানা, 'মগের মুল্লুক? জানো এর ফলে তোমাদের কি দশা হবে?'

ঘাড়ের পিছন থেকে ধাতব বস্তুটা সরে গেল। দুটো হাত হঠাৎ অক্টোপাসের মত জড়িয়ে ধরল ওর গলা। দু'হাত দিয়ে ছাড়াবার ব্যর্থ চেষ্টা করল সোহানা। পাশের লোকটা হাতের রুমাল দিয়ে চেপে ধরল ওর নাক মুখ। হাত-পা ছোঁড়াছুঁড়ির কোনও সুযোগ না পেয়েই জ্ঞান হারাল সোহানা।

সময় নষ্ট করল না ওরা। কর্ড দিয়ে ওর দুটো হাত বাঁধা হলো। সোহানার অচেতন দেহটা ব্যাক সীটে রেখে এল উগো।

পাঁচ

জ্ঞান ফিরে পেয়েই আধ ডজন প্রচণ্ড ঘুসির সিদ্ধান্ত নিল রানা। কবীর চৌধুরীর মুখের চারদিকে মারবে ও।

নিঃসাড় পড়ে রইল। জায়গাটা মোটেই আরামদায়ক না। বুঝতে অসুবিধে হলো না, গাড়ির বুটের ভিতর গুঁজে রাখা হয়েছে ওকে। প্রবল গতিতে ছুটছে গাড়ি।

বুটের ফাটল দিয়ে চুইয়ে চুইয়ে বাষ্প ঢুকছে। বিপদটা টের পেল রানা। এখন ওর একমাত্র কাজ জ্ঞান ফিরে এসেছে তা ওদেরকে বুঝতে না দেয়া। মনে পড়ল হোটেলের ম্যানেজার ঠিক আটটা বাজতে পাঁচ মিনিট আগে সোহানার অ্যাক্সিডেন্টের কথা বলতে শুরু করে। আলফা-রোমিওর শয়তানগুলো ব্যাপারটার জন্যে দায়ী এবং গোটা ব্যাপারের জন্যে দায়ী কবীর

চৌধুরী, তা বুঝে নিয়েছে রানা জ্ঞান ফিরে পেতেই। ওকে কুপোকাত করার পরমুহূর্তেই ওরা যদি গাড়ি স্টার্ট দিয়ে থাকে তাহলে পঞ্চাশ মিনিট ধরে ছুটছে আলফা-রোমিও। স্পীড অনুমান করে রানা হিসেব বের করল। গাড়ি চল্লিশ মাইলের বেশি পথ পেরিয়ে এসেছে ইতোমধ্যে। ঘড়ির কাঁটা বলছে ন'টা বাজতে পনেরো মিনিট বাকি।

আস্তে আস্তে দাঁড়িয়ে পড়ল গাড়ি। রেল-ক্রসিং সামনে। ট্রেনের শব্দ। হিসেব যদি ভুল না হয় তাহলে আলফা-রোমিও দক্ষিণ দিকে যাচ্ছে। ডোমেগ-লায়রা আর ভেরোনার মাঝখানে কোথাও হবে রেল-ক্রসিংটা।

গাড়িটা দাঁড়িয়ে থাকতেই প্যাসেঞ্জার সীট থেকে নিচে নামল কেউ। নিঃসাড় পড়ে রইল রানা। বুট খোলার শব্দ ঢুকল কানে। সম্পূর্ণ শক্তি ফিরে পাওয়া দরকার আক্রমণ করে মুক্তি লাভের জন্যে। সময় হয়নি এখনও। দম বন্ধ করে পড়ে রইল ও। ওকে অচেতন দেখে সন্তুষ্ট হয়ে বুট নামিয়ে দিয়ে ফিরে গেল লোকটা। তারপর কথা শোনা গেল তার, 'ঘুসিটা জোরাল হয়ে গেছে, গেলিনা। ব্যাটা বাঁচবে কিনা সন্দেহ হচ্ছে আমার।' গাড়ি চলতে শুরু করল আবার।

পনেরো মিনিট পর একটি শহরে ঢুকল আলফা-রোমিও। রানার হিসেবে এটা ভেরোনা। ওর মনে পড়ল ভেনিস থেকে রওনা হবার সময় স্বেচ্ছায় ভায়া ভেরোনা রুটটা বেছে নিয়েছিল ও। টেরেন্টোয় যদি সোজাসুজি পৌঁছুতে চাইত তাহলে বাস্সানো হয়ে সহজ পথটা বেছে নিত, পঁচিশ মাইল বাঁচত কম করেও তাতে। তার মানে, শহরটা যদি ভেরোনা হয় নিশ্চয় ওরা ভেনিসের দিকে যাচ্ছে না। দক্ষিণ দিকে, অ্যাপুলিয়াতে সিনোর মানাটোফের আস্তানা। কবীর চৌধুরীর আস্তানা হয়তো ওটাই। রানার মনে পড়ল আলফা-রোমিও বারীতে রেজিস্টারড্। আর কোন সন্দেহ নেই। দক্ষিণ দিকেই যাচ্ছে গাড়ি। ইটালির ম্যাপটা মানসপটে স্থাপন করল ও। পরবর্তী শহর তাহলে মোডেনা। পো ভ্যালির শেষ মাথায়, সত্তর মাইল সামনে। গাড়ির স্পীড অনুমান করল। একঘন্টারও বেশি লাগবে এই স্পীডে মোডেনা পৌঁছুতে। না, অতক্ষণ অপেক্ষা করা যাবে না।

রাস্তার ডান দিকে মাথা রেখে বুটের ভিতর পড়ে রয়েছে ও। কানের কয়েক ইঞ্চি দূরে ছন্দময় টিক টিক শব্দ হচ্ছে। গাড়ির গতির সাথে কমে বাড়ে শব্দটা। লোয়ার গিয়ারে যাবার সময় দ্রুত হয় টিক টিক। ইলেকট্রিক্যালি ড্রিভেল পেট্রল পাম্প। বেন্টলীর পেট্রল পাম্পের ডুপ্লিকেট আছে। কিন্তু খুব কম গাড়িরই থাকে। পেট্রল পাম্পটা হুইল আর্কের ঠিক উপরের একটি তাকের আড়ালে। টার্মিনালে ইলেকট্রিক লীড জড়ানো, অনুভব করতে পারল রানা। টার্মিনালটা ঢিলে, প্যাঁচ খুলতে অসুবিধা হবে না সময় মত। তার বিচ্ছিন্ন করে ফেলাটাও একটা টানের অপেক্ষা। বুটের ঢাকনিটা দড়ি দিয়ে বাঁধা। এক ধাক্কায় ছেঁড়া অসম্ভব মনে হলো না। দ্রুত কাজ শুরু করল ওর মাথা।

বাধা পড়ল কাজে। আচমকা দাঁড়িয়ে পড়ল গাড়ি। পাঁচ সেকেন্ড পর

বুটের ঢাকনি উঠল উপর পানে। তিন সেকেন্ডের নিস্তব্ধতা। কোন আভাস না দিয়েই প্রচণ্ড আঘাতটা এসে লাগল রানার তলপেটে। সবটুকু ইচ্ছাশক্তি খাটিয়ে গলা থেকে আর্তনাদ বেরুতে দিল না ও। আবার একটা প্রচণ্ড আঘাত আসবে, আশা করছিল ও।

চুপচাপ সহ্য করল রানা। গেলিনা একটা সরু লাঠি দিয়ে খোঁচাচ্ছে ওকে। তিনবারের বারও রানাকে নড়তে-চড়তে না দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে ফিরে গেল সে। গাড়িতে চড়ে কথা বলছে, 'বস্ জীবিত পেতে চান ওকে। যদি সম্ভব হয়, বলেছিলেন। মরে গেলেও আসে যায় না কিছু...'

'মরুক, বাঁচুক আমাদের তাতে কি। আমি ভাবছি দেরির কথা,' উত্তর দিচ্ছে স্টেফানো। ওদের কথাবার্তা শুনে রানা বুঝতে পারল রাস্তাটা আন্ডার রিপেয়ার। বিকল্প সরু একটা রাস্তা সামনে। ওয়ান ওয়ে। অটোমেটিক সিগন্যাল কন্ট্রোল করে ট্রাফিক। সিগন্যাল আলফা-রোমিওর বিপক্ষে।

বিকল্প সরু রাস্তাটা এবড়োখেবড়ো। ঝাঁকানি খেয়ে শরীরটা এপাশ ওপাশ করছে। কিন্তু এখনই কাজে হাত দিতে হবে বুঝতে পারল রানা। মেন রোডে পৌঁছুতে দেরি আছে মিনিট দশেক। হিসেব ভুল না হলে বিরাট একটা ব্রিজ পড়বে মেন রোড ধরে খানিকটা গেলেই।

হাতড়ে হাতড়ে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির খোপ থেকে একটা স্টীলের বার তুলে নিল ও। আঠারো ইঞ্চি লম্বা, দেড় ইঞ্চি চওড়া। চলনসই।

মেন রোডে উঠে এল গাড়ি। আস্তে আস্তে পেট্রল পাম্পের টার্মিন্যালের প্যাঁচ খুলল রানা। টান মেরে না ছিঁড়ে স্ক্রুর প্যাঁচ ঢিলে করে বিচ্ছিন্ন করল তার। থেমে গেল টিক টিক। তিরিশ সেকেন্ড অবধি কিছুই ঘটল না। পরমুহূর্তে মিস ফায়ার করল ইঞ্জিন। পরপর বিস্ফোরণের ধাক্কা এসে লাগতে শুরু করল রানার ঠিক নিচে এগজস্ট থেকে। গাড়ির গতি কমতে কমতে দাঁড়িয়ে পড়ল একেবারে। কথা বলছে স্টেফানো আর গেলিনা। হ্যান্ড ব্রেক কষে গাড়ি দাঁড় করবার সময় শব্দ হলো, সেই সুযোগে বুটের ঢাকনিতে বাঁধা দড়ি ছিঁড়ে ফেলল রানা।

ভাগ্য পরীক্ষার সময় হাজির হয়েছে। শতকরা নব্বই জন এই পরিস্থিতিতে গাড়ির সামনে বনেট খুলে সমস্যাটা বুঝতে চায়। কিন্তু পেট্রল পাম্পে গোলমাল হয়েছে অনুমান করে থাকলে ওরা বুটের দিকেই এগোবে।

দু'জনই দরজা খুলে রাস্তায় নামল। বুট খোলা হলে কোন উপায় থাকবে না রানার। হাত-পা জড়ো করে কোনরকমে পড়ে আছে ও। এই অবস্থায় আক্রমণ করে সুবিধে করা অসম্ভব। কিন্তু বনেট খোলার শব্দ কানে ঢুকতেই সবেগে বুটের ঢাকনিটা একহাতে উপর দিকে ঠেলে পা দুটো নামিলে দিল রানা নিচের দিকে।

রাস্তায় নেমে ভারসাম্য ফিরে পেতেই দেখল বনেট বন্ধ করে তাকিয়ে আছে ওর দিকে দু'জন। কয়েক পা পিছিয়ে এল রানা। হাতে ধরা স্টীলের বারটা লুকোবার চেষ্টা করল না।

আগে পা বাড়াল গেলিনা। ডান হাতটা পকেটের মুখে চলে গেছে।

স্টেফানো আক্রমণের ভঙ্গিতে দু'হাত বাড়িয়ে দিয়ে এগোচ্ছে।

খোলাখুলি যুদ্ধ। স্টেফানোর ডান হাত পকেটে ঢুকছে। হেঁটে আসছে সোজা রানার দিকে।

স্টীলের বারের একটা প্রান্ত শক্ত মুঠোয় ধরে রেখেছে রানা। ধীরেসুস্থে দম বন্ধ করল। পর পর দু'বার তাকাল গেলিনার মুখ থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে বুকের ঠিক মাঝখানে। তারপরই বিদ্যুৎ খেলে গেল শরীরে। ছুরি থ্রো করার কায়দায় প্রচণ্ড শক্তিতে স্টীলের বারটা গেলিনার বুক লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারল ও।

ছোরার মত ছুঁচাল বলে গেলিনার বুকে নিখুঁত বিঁধে গিয়ে আটকে গেল বারটা। দু'সেকেন্ড রইল সেটা গেলিনার বুকে। তার আগেই বীভৎস একটা শব্দ কানে ঢুকেছে বুকের হাড় ভেঙে যাবার। গেলিনার হাত দুটো শূন্যের দিকে উঠে গেল চকিতে। তারপর কাটা কলা গাছের মত সশব্দে পড়ে গেল দেহটা রাস্তার উপর। ঠিক তখনই লাফ দিল রানা।

স্টীলের বারটাকে ধরবার জন্যে স্টেফানো ঝুঁকে পড়েছে। এক লাফে তার ঘাড়ে গিয়ে পড়ল রানা। বারটা ছাড়ল না স্টেফানো। চিৎ হয়ে পড়ে গিয়ে দু'হাতে কনুইয়ের উপর ভর দিয়ে মাথাটা উঁচু করল ও। হাঁটু ভাঁজ করে উঠে দাঁড়াবার মহরত দেখাচ্ছে যেন। স্টেফানোর থুতনিতে সবুট লাথি মারল রানা। হাতের ভাঁজ ভেঙে যেতে মাথাটা রাস্তার উপর ঠক্ করে ঠুকে গেল। বুকের উপর পা তুলল রানা। সবেগে নেমে এল বুট। স্টেফানোর গলায় আটকে থাকা বাতাস বেরিয়ে এল ফোঁস করে। তারপরই নিঃসাড় হয়ে গেল দেহটা।

দু'জনার পকেট হাতড়ে একটা নোট বুক পেল রানা। সেটা নিজের পকেটে ভরে দু'জনার কোমর থেকে বেল্ট খুলে নিল। বাঁধল একসাথে। তারপর রাস্তার পাশের অল্প নিচু খাদটা পরীক্ষা করে এসে টেনে নিয়ে গেল জ্ঞানহীন দেহ দুটো খাদের কিনারায়। এদিক ওদিক তাকিয়ে ঠেলে দিল ওদেরকে। গড়াতে গড়াতে নেমে গেল ওরা খাদের নিচে। জ্ঞান ফিরে এলে বাঁচবে। আর ইতোমধ্যেই মরে গিয়ে থাকলে তো প্রশ্নই ওঠে না।

বুট খুলে বিচ্ছিন্ন তার জোড়া দিয়ে টার্মিনালের প্যাঁচ কষতে একমিনিটও লাগল না রানার। গাড়ির ভিতর ঢুকে স্টার্টারে চাপ দিতেই স্টার্ট নিল ইঞ্জিন। গাড়ি ছেড়ে দিয়ে একটা আরামের নিঃশ্বাস ছাড়ল ও।

মাইলখানেক যাবার পর একটা রেস্তোরাঁ পড়ল রাস্তার পাশে। ছোট শহর। গতি শ্লথ না করেই নামটা পড়ে নিল রানা। রেভেরি। আরও ক'মাইল এগোবার পর গাড়িটা সার্চ করার জন্যে ব্রেক করল ও। একটা পরিকল্পনা করা দরকার এখন।

টেরেন্টোয় আক্রান্ত হবার পর এই প্রথম ভাবল রানা হোটেল থেকে ওকে বেরিয়ে আসতে না দেখে সোহানা কি কি করেছে ইতোমধ্যে। কিংবা সোহানাকে নিয়ে কে কি করেছে। আলফা-রোমিওর বাকি দু'জন আরোহীর কথা ভোলেনি রানা।

একটা টর্চ ছাড়া কিছুই পাওয়া গেল না গাড়ির ভিতর। ভেবেচিন্তে

টেরেন্টোয় আবার ফিরে যাওয়া ছাড়া আর কোন উপায় দেখল না ও। সবচেয়ে আগে সোহানার খবর চাই।

টেরেন্টো নব্বই মাইল দূরে। মরিয়া হয়ে গাড়ি চালাতে শুরু করল রানা ফিরতি পথে। গেলিনা আর স্টেফানোকে যেখানে ফেলে রেখে গিয়েছিল সে জায়গাটা অতিক্রম করার সময় প্রতিজ্ঞার কথাটা আর একবার মনে পড়ে গেল ওর। আধ ডজন ঘুসি, চোখেমুখে।

এক মাইল যাবার পর চোখে পড়ল টেমপোরারি ব্রিজের ওয়ার্নিং নোটিশ। ব্রিজ পেরিয়েই সিঙ্গল লাইন ট্র্যাক সেকশন। দুটো গাড়ি সামনে, আলফা-রোমিওকে দাঁড় করাতে বাধ্য হলো রানা। খুব সরু রাস্তা। বাঁ দিকে দক্ষিণগামী গাড়িগুলোর জন্যে সামান্য একটু জায়গা। ডান দিকে খালি জায়গা নেই বললেই চলে। বনভূমির সীমানা কাঁটা তার দিয়ে ঘেরা। পিছনে কয়েকটা গাড়ি লাইন দিল। সামনে বা পিছনে কোন দিকে যাবার উপায় নেই। দু'তিন মিনিট কেটে গেল। দক্ষিণমুখী গাড়িগুলো ধীর গতিতে চলে যাচ্ছে পাশ কাটিয়ে।

বিরক্তিতে ভ্রূ কুঁচকে দক্ষিণ মুখো আর ক'টা গাড়ি যাবে জানার জন্যে জানালা দিয়ে মাথা বের করে দেখার চেষ্টা করল রানা। তারপরই চোখে পড়ল ওর বেন্টলীটা।

সাবলীল ভাবে পাশ কাটিয়ে চলে গেল গাড়িটা। দাঁড় করানো গাড়িগুলোর হেডলাইটের আলোয় পরিষ্কার দেখা গেল সামনের সীটে দু'জন মাত্র আরোহী। পিছনের সীটে একটা লম্বা বস্তার মত মোটা কম্বল চাপা দেয়া। আরোহী দু'জনই তাকিয়েছিল রাস্তার বিপরীত দিকে।

ঝট্ করে গাড়ির দরজা খুলে নেমে পড়ল রানা। পিছন পিছন দৌড়ে গাড়িটার গতি রোধ করার চেষ্টা ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারল না ও। কিন্তু দৌড়ুল না। লাভ হবে না কোনও।

বোকার মত তাকিয়ে রইল রানা। প্রতি সেকেন্ডে দূরে সরে যাচ্ছে বেন্টলীর পিছনের লাল দুটো আলো। সোহানা গাড়িতেই আছে। সোহানা না সোহানার লাশ বয়ে নিয়ে যাচ্ছে ওরা? গাড়ির ভিতর উঠে এল রানা। পাঁচটা অসহ্য মিনিট অতিবাহিত হলো একে একে। তারপর ধীরে ধীরে আলফা-রোমিওর সামনে গাড়িগুলো এগোতে শুরু করল ধীরে গতিতে। পিছন থেকে গোটা চারেক গাড়ির হর্ন ধমকে উঠল একযোগে।

মোড় নেবার উপায় নেই। বাধ্য হয়ে সারবন্দী ভাবে প্রথমে আস্তে আস্তে, তারপর দ্রুত বেগে মাইলখানেক রাস্তা অতিক্রম করার পর মেন রোডের উপর এল আলফা-রোমিও। রাস্তার কিনারায় একটা পাইন গাছের পাশে ওটাকে দাঁড় করাল রানা। সাঁ সাঁ করে গোটা সাতেক গাড়ি পাশ কাটিয়ে চলে গেল। রাস্তা পরিষ্কার হতে গাড়ি ঘুরিয়ে নিল রানা।

টেমপোরারি ব্রিজের কাছাকাছি আলফা-রোমিও পৌঁছুতেই নীল আলো লালে বদলে যেতে দেখল ও। আবার মিনিট পাঁচেক ধরে সামনের সারবন্দী গাড়িগুলোর সাথে আস্তে আস্তে এগোবার পালা আরম্ভ হলো। অবশেষে

হাইওয়েতে উঠে এল আলফা-রোমিও। গাড়িকে পক্ষীরাজের মত উড়িয়ে নিয়ে চলল। দশ সেকেন্ডের মধ্যে আলফা-রোমিও ওভারটেক করল তিনটে গাড়ি। পনেরো মিনিটের কিছু বেশি বেন্টলী পাশ কাটিয়ে গেছে ওকে। পনেরো মাইলের তফাৎ এখন বড়জোর।

স্পীড বাড়িয়ে চলল রানা পরবর্তী পঁচাত্তর মিনিট একনাগাড়ে। পঁয়ত্রিশ মাইলের পথ মোডেনায় পৌঁছুতে পনেরো মিনিট লাগল আলফা-রোমিওর। শহরের মধ্যে গতি কমাতে বাধ্য হলো ও। পুলিসের সাথে গোলমাল বাধাবার ইচ্ছা নেই কোন। কিন্তু মেন রোডে পৌঁছে বোলোনিয়ার দিকে ছুটল গাড়ি একশো আশি কিলোমিটার বেগে। স্পীড মিটারের কাঁটার দিকে চোখ পড়তে মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠল রানার। মিনিটে প্রায় দু'মাইল গতিতে ছুটছে আলফা-রোমিও, কিন্তু ইঞ্জিন শান্ত ও সাবলীল। লাইট পোস্টগুলো তীব্রবেগে সামনে থেকে উল্টো দিকে দৌড়ুচ্ছে একটার পর একটা। গাড়ির কাউন্টারে লাল ওয়ার্নিং আলো জ্বলে উঠতে দেখল ও। তিন সেকেন্ড সেদিকে তাকিয়ে রইল ও। রাস্তার সামনে চোখ মেলল হঠাৎ। তারপরই ব্রেক কষল রানা। চোখের সামনে দুলে উঠল পৃথিবীটা পলকের মধ্যে।

কয়েক সেকেন্ড অসহায় বোধ করল রানা। প্রাণের ঝুঁকি নিয়েছে ও। খরগোশটা বোকার মত তাকিয়ে আছে সরাসরি আলফা-রোমিওর দুই লাইটের দিকে। রাস্তার মাঝখান থেকে একচুল নড়ার লক্ষণ নেই অবোধ জানোয়ারটার।

বিদ্যুৎবেগে মুখ ঘুরে গেল আলফা-রোমিওর। পিছনটা রাস্তা ছেড়ে উঠে পড়ল আধহাত শূন্যে। স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে গাড়ি সোজা করার চেষ্টা করল রানা। তীক্ষ্ণ, কর্কশ শব্দ উঠল কংক্রিটের সাথে চাকার ঘর্ষণে। তড়াক করে লাফ মারল খরগোশটা। ওর আধহাত দূর দিয়ে তীরের মত বেরিয়ে গেল গাড়ি।

সামান্য একটা জানোয়ারের জন্যে আর কোনদিন প্রাণের ঝুঁকি নেবে না, ভাবল রানা।

ঘড়িতে সাড়ে এগারোটা দেখে হিসেব করল ও।

বোলোনিয়ায় পৌঁছে গেছে আলফা-রোমিও। মোডেনা থেকে পঁচিশ মাইল। পনেরো মিনিট লেগেছে। শহরের ভিতরে আবার গতি কমাল রানা।

শহর থেকে বেরিয়ে ডজন দুয়েক গাড়ি ওভারটেক করে পনেরো মিনিটে ইমোন-এর শহরতলিতে পৌঁছে সামনের লাল আলোর টুকরোটাকে পেন্ডুলামের মত ঝুলতে দেখতে পেল ও। হেডলাইটের আলোয় পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে খাকী ইউনিফর্ম। দ্রুত চিন্তা করে নিল রানা। গতি কমিয়ে ফেলেছে ও আলফা-রোমিওর। করপোরেলের কাছ থেকে তিনগজ পিছনে গাড়ি দাঁড় করাল রানা। রেগুলার রোড চেক হচ্ছে বুঝতে পেরেছে ও। করপোরেল পা বাড়াবার আগেই হাতছানি দিল ও।

নোটবুক আর বল-পেন্সিল হাতে করপোরেল জানালার কাছে এসে দাঁড়াতে স্থানীয় ভাষায় প্রশ্ন করল রানা, 'এক্সকিউজ মি, অফিসার। কতক্ষণ ধরে এখানে আছেন আপনি?'

'দেড় ঘণ্টা, স্যার,' বিদেশী একজন লোককে ইটালিয়ান ভাষা বলতে শুনে গর্ব অনুভব করল করপোরেল, 'বলুন কি করতে পারি আপনার জন্যে?'

হাসল রানা। একটু ইতস্তত ভাব দেখাল। তারপর বলল, 'আপনার লিস্টটা একটু দেখতে পারি কি?'

বিনীত ভাবে মাথা নাড়ল করপোরেল, 'অবশ্যই, স্যার।' ভাল করে লক্ষ করল সে রানাকে, 'কি জানতে চান, স্যার?'

'একটা বেন্টলী,' বলল রানা। 'কতক্ষণ আগে এখান দিয়ে গেছে জানতে চাই।'

প্রশ্নের সম্মুখীন হবার আগেই বানানো গল্পটা বলতে শুরু করল রানা। দক্ষিণ দিকে যাচ্ছিল ওরা—রানা, আর রানার বন্ধু। বেন্টলী আর আলফা-রোমিওতে ছিল ওরা। ওর বন্ধুরা গাড়ি বদলাবার প্রস্তাব দেয়। স্পীড পরীক্ষা করার ইচ্ছা রানারও কম ছিল না। রাজি হয়ে যায় সে। কিন্তু ওর বেন্টলী হারিয়ে দিয়েছে আলফা-রোমিওকে। বেন্টলীর চেয়ে কতটা পিছনে আছে আলফা-রোমিও সেটা জানতে পারলে উপকৃত হবে সে।

নীরবে শুনল করপোরেল কথাগুলো। তারপর প্রশ্ন করল, 'গাড়ি কোথায় বদল করেছেন আপনারা বললেন?'

'ভেরোনায়।'

'এবং দক্ষিণ দিকে যাচ্ছেন আপনারা,' করপোরেল একটু চিন্তা করল, 'বুঝতে পেরেছি ব্যাপারটা কি ঘটেছে! আপনি আসলে জানেন না, স্যার, রিমিনি এবং পেস্কারার মাঝখানের রাস্তাটা মেরামতের জন্যে বন্ধ। আপনার বন্ধুরা এদেশীয়, তারা নিশ্চয় জানে ব্যাপারটা। তারা ফ্লুরেন্সের ভেতর দিয়ে ফুটা পাস হয়ে তারপর হয় সীয়েনা এবং র‍্যাডিকোফানির উপর দিয়ে রোমের দিকে চলে গেছেন কিংবা পেরুজিয়া এবং আপুইলা হয়ে চলে গেছেন ইস্ট কোস্টের দিকে। আপনাকে জানানো উচিত ছিল ওদের।'

কোন আশা নেই। দক্ষিণে যাবার আরও অন্তত দুটো বিকল্প রাস্তা আছে। ভুল হয়ে গেছে।

কথা বলে চলেছে করপোরেল। ধন্যবাদ জানিয়ে রানা বলল, 'আমি বরং বোলোনিয়াতেই ফিরে যাই। কাল সকালে আবার ছুটব।' গাড়ি ঘুরিয়ে নিল ও।

বেন্টলীকে ধরা অসম্ভব। এখন কি করতে পারে ও?

আনমনা হয়ে মিনিট পাঁচেক গাড়ি চালাবার পরই সিদ্ধান্তে উপনীত হলো রানা। বোলোনিয়া থেকে ত্রিভিসো একশো ত্রিশ মাইলের বেশি নয়। ইটালিয়ান এয়ারলাইনের একটা প্লেন সোয়া চারটের পর যে-কোন সময় ছাড়বে জানা আছে ওর। লন্ডনেই নাস্তা সারবে ও।

ফিলিং স্টেশনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে ট্যাঙ্ক ভর্তি পেট্রল নিয়ে নিল রানা। তিনটের সময় মেস্ট্রি পৌঁছল আলফা-রোমিও।

এয়ারপোর্টে গাড়ি থেকে নেমে খোঁজ নিয়ে জানা গেল ঘণ্টা খানেক বাকি আছে প্লেন ছাড়তে। রেস্তোরাঁর টেলিফোন বুদে সরাসরি গিয়ে ঢুকল রানা। লন্ডনের এজেন্টকে নির্দেশ দিয়ে রাখতে চায় ও ঢাকার সাথে আগে থেকেই

যোগাযোগ করার জন্যে।

কল বুক করার পর বেসিনে হাত মুখ ধুয়ে এক কাপ কফি নিয়ে বসল রানা। পাঁচ-সাতজন রাত-জাগা লোক কফির পেয়ালায় চুমুক দিচ্ছে ধীরে ধীরে রেস্তোরাঁয়। রানার দিকে লক্ষ্য নেই কারও। কফি শেষ হবার সাত মিনিট পর উত্তর এল লন্ডন থেকে। উঠে গিয়ে রিসিভার তুলে নিল রানা, 'হ্যালো। জিরো ওয়ান, ওয়ান জিরো?'

'জিরো ওয়ান, ওয়ান জিরো,' অপর প্রান্ত থেকে পরিষ্কার উত্তর এল, 'নাম্বার, প্লীজ?'

নিজের নাম্বার বলল রানা, 'কেমন আছ, আহাদ?'

'আরে!' অপর প্রান্তে আহাদ যেন বিশ্বাস করতে পারছে না, 'আপনি?'

কোথাও কোন গোলমাল হয়েছে। পাঁচ সেকেন্ড কোন কথা বলল না রানা। দ্রুত চিন্তা করছে ও। তারপর গম্ভীর গলায় বলে উঠল আস্তে আস্তে, 'হোয়াটস্ দ্য ম্যাটার, আহাদ?'

'না,···মানে—আচ্ছা, আপনি একটু অপেক্ষা করুন···' আহাদ কথা শেষ করল না।

রানা বলে উঠল, 'হ্যালো।'

উত্তর এল না কোন। অথচ যোগাযোগ কাটেনি ফোনের। অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় দেখল না রানা।

একে একে তিন মিনিট কেটে গেল। অধৈর্য হয়ে উঠল রানা। কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের লন্ডন ব্রাঞ্চে কিছু একটা ঘটেছে। দ্রুত কল্পনা করার চেষ্টা করল ও।

তিন মিনিট পনেরো সেকেন্ড পর অপর প্রান্ত থেকে নতুন একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল। ছ্যাঁত্ করে উঠল রানার বুকের ভিতর।

'রানা বলছ?' সেই গম্ভীর গলা। অতি-পরিচিত। কিন্তু ভুল শুনছে নাকি ও?

'জ্বী, স্যার।' পাঁচ সেকেন্ড পর গলা দিয়ে শব্দ বের হলো রানার।

'ত্রিভিসো থেকে বলছ?'

'জ্বী, স্যার।'

'চলে এসো, রানা। চারটে বিশ মিনিটে প্লেন আছে একটা। মিস কোরো না।'

কিছুই বুঝতে পারল না রানা। ওর মনের কথা জানে নাকি বুড়ো? এদিকে কৌতূহলও মিটছে না—লন্ডনে কেন বস্?

'আপনি কখন এলেন লন্ডনে, স্যার?' প্রশ্নটা না করে পারল না ও, 'আমি কি লন্ডনে যাব?'

গম্ভীর কণ্ঠস্বর ভেসে এল। রানা মানসপটে দেখতে পেল কাঁচা-পাকা ভুরু জোড়া কুঁচকে উঠেছে বুড়োর, 'এলে সব জানতে পারবে। হ্যাঁ, লন্ডনে এসো।'

বুড়োকে খেপিয়ে দেবার লোভটা সামলাতে পারল না রানা, 'কিন্তু,

স্যার, আমার এখানে কিছু জরুরী কাজ রয়েছে যে।'

'সব ফেলে চলে এসো,' ভারী গলায় বললেন রাহাত খান। 'দিস ইজ মাই অর্ডার, রানা।'

ওরেব্বাপরে! রোমাঞ্চিত বোধ করল রানা। বড় ধরনের কোথাও কিছু একটা ঘটেছে তাহলে।

'ঠিক আছে, স্যার,' বলল রানা। 'আমি আসছি।' ফোন ছেড়ে দিলেন মেজর জেনারেল রাহাত খান—ওর আগেই।

ছয়

সাতটা তিরিশ মিনিটে লন্ডন এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে এল রানা। আহাদ অপেক্ষা করছিল গাড়ি নিয়ে। রানাকে সোজা পিকাডেলি স্কয়্যারের এমব্যাসিতে নিয়ে এল ও। পথে কথাবার্তা বিশেষ কিছু হলো না। রানা শুধু জানতে চাইল, 'বুড়ো লন্ডনে পৌঁছেছে কবে?'

'বলতে পারি না। গতকাল হাইকমিশনার কল করেছিলেন আমাকে' বলল আহাদ। 'গিয়ে দেখি বস্ স্বয়ং হাজির। আমাকে ডেকেছিলেন তৈরি থাকার জন্যে। যে-কোন মুহূর্তে ইটালিতে যেতে হতে পারে। আটজনের একটা দলের সাথে। ইউরোপের সব এজেন্টকে লন্ডনে হাজির হবার নির্দেশ পাঠিয়েছেন বস্। এখন আর আমাদের দরকার হবে না।'

'কেন?'

'আপনি না এলে আমরা যেতাম। এখন বোধহয় দরকার পড়বে না,' নিরুৎসুক কণ্ঠে বলল আহাদ।

কথা না বলে রাস্তার দিকে তাকাল রানা।

দূতাবাসের তেতলায় থার্ড সেক্রেটারির সাথে দেখা হলো রানার। ভদ্রলোক ওর পরিচিত নয়। কিন্তু পরিচয় দিতেই হাত বাড়িয়ে দিলেন করমর্দনের জন্যে, নিজের পরিচয় পেশ করে বললেন, 'আপনার জন্যে মেজর জেনারেল অপেক্ষা করছেন, মি. মাসুদ। আসুন পৌঁছে দিই আপনাকে।'

আহাদ নিচতলা থেকেই বিদায় নিয়ে চলে গেছে। রানা থার্ড সেক্রেটারির সাথে পাশাপাশি হেঁটে করিডরের মাঝখানে একটা বন্ধ দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। দরজায় নক করলেন থার্ড সেক্রেটারি।

ভিতর থেকে ভারী গলা ভেসে এল, 'কাম ইন।'

দরজা ঠেলে রুমের ভিতর পা দিল রানা। বুকের ভিতর পুরানো ধক ধক শব্দটা শুরু হয়েছে এখানেও। বুড়োর মুখোমুখি হবার আগে এরকম হয় ওর। বিশ্বাস নেই, বুড়ো হয়তো প্রথমেই কড়া ভাবে ধমকে উঠবে খামোকা।

মেজর জেনারেল রাহাত খান ছাড়া দামী কার্পেট পাতা রুমের ভিতর আর কেউ নেই। ওয়াল-স্ক্রিনগুলো দুলছে জানালা গলে আসা লন্ডনের

গ্রীষ্মকালীন বাতাসে। প্রকাণ্ড সেক্রেটারিয়েট টেবিলের উপর ইউরোপের একটা ম্যাপ পাতা। টেবিলের উপর প্রসারিত শীর্ণ একটি হাত একটা জ্বলন্ত পাইপ ধরে আছে। পাইপটা থেকে সরু নীলচে ধোঁয়া উঠছে এঁকে বেঁকে। আস্তে আস্তে পা ফেলে টেবিলের দিকে এগোতে এগোতে সব দেখে নিল রানা। মাথা নিচু করে ম্যাপ দেখছে বুড়ো।

'বসো, রানা,' মাথা না তুলেই বললেন রাহাত খান। নিঃশব্দে বসে পড়ল রানা।

'তোমার ডান পাশের ফাইলটা নেড়ে চেড়ে দেখো।' গম্ভীর গলায় নির্দেশ এল, 'সব জানতে পারবে।'

ফাইলটা পড়ে ফেলতে পাঁচ মিনিটও লাগল না রানা। বিশেষ কিছু নেই ওতে। ইটালিতে বাশারকে কেন পাঠানো হয়েছিল, তারপর সোহানাকে পাঠানো হয়েছে ইত্যাদি খবরাখবর ছাড়া বিশেষ কিছুই জানতে পারল না ও। কিন্তু এটুকুই যথেষ্ট। গোটা রহস্য কি জানতে বাকি রইল না ওর। অদ্ভুত দ্রুতগতিসম্পন্ন এয়ারক্র্যাফট বা সসারকে নিয়ে সমস্যা। দ্রুত চিন্তাস্রোত বয়ে গেল রানার মাথায়—কবীর চৌধুরীর সাথে এই রহস্যের যোগাযোগ···সম্ভব! মানাটোফ এয়ারক্র্যাফটের খুচরো অংশ তৈরি করে গিয়াকোমা বলেছিল।

'বাশারকে মেরে ফেলেছে,' রানার দিকে চোখ তুলে তাকালেন রাহাত খান, 'আহত হয়েছিল ও। শত্রুর হাত থেকে পালিয়ে গিয়ে মেসেজ পাঠিয়েছিল—শেষ মেসেজ। মেসেজটা পাঠাবার সময় হার্ট-ফেল করে। পুরো মেসেজ তাই পাইনি আমরা।' পাইপ মুখে তুলতে গিয়ে নিজেকে সামলে নিয়ে পাইপের দিকে খানিকক্ষণ চোখ রাখলেন তিনি, 'সোহানারও কোন খবর নেই।' পাইপটা নিরীক্ষণ করা থেকে নিবৃত্ত করে মুখের দিকে এখন সেটাকে টেনে আনছেন তিনি।

'সোহানাকে কবীর চৌধুরী ধরে নিয়ে গেছে, স্যার,' নেহাত গোবেচারার মত বলল রানা।

পাইপ ধরা হাতটা নেমে এল টেবিলের উপর। ভুরু জোড়া অতিমাত্রায় কুঁচকে ওঠায় কপালের ঠিক মাঝখানে গভীর গর্তের সৃষ্টি হলো একটা। একজোড়া চোখ তল্লাশি চালাচ্ছে রানার সারা মুখে।

মনে মনে হাসল রানা। কৌতূহলে মরে যাচ্ছে বুড়ো। কিন্তু নিরুৎসুক গাম্ভীর্য ঝেড়ে ফেলে সরাসরি প্রশ্ন করবে না তবু।

'রিপোর্ট করোনি কেন?' জবাবদিহি চাওয়ার ভঙ্গি রাহাত খানের গলায়।

'রিপোর্ট খানিক আগে লেখা শেষ করেছি, স্যার।' পকেট থেকে লম্বা একটা খাম বের করল রানা, প্লেনে বসে লিখে ফেলেছে আগেই ও। 'সব জানতে পারবেন এটা পড়ে।' খামটা টেবিলের মাঝখানে রাখল ও।

খামটার প্রতি কোন আকর্ষণ দেখা গেল না রাহাত খানের। রানার দিকে তিন সেকেন্ড তাকিয়ে থাকার পর কাটা কাটা শব্দে উচ্চারণ করলেন, 'বিকেল চারটায় দেখা করবে। যাও।'

এরকম আশা করেনি রানা। আস্তে আস্তে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে

দরজার কাছে চলে এল ও। পিছন থেকে ডাক পড়বে আবার ভাবল ও। কিন্তু না। কোন শব্দ নেই পিছনে। দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এসে পাঁচ সেকেন্ড বোকার মত দাঁড়িয়ে রইল ও। তারপর নিরুপায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকিয়ে মনে মনে বলল—বুড়োর মাথা খারাপ হয়ে গেছে!

বিকেল চারটায় আবার সেই একই দৃশ্যের অবতারণা হলো।

মাঝখানের সময়টা হোটেলে স্নানাহার সেরে লম্বা ঘুম দিয়েছে রানা। রাহাত খানের মাথায় কি সব পরিকল্পনা কিলবিল করছে সে-সম্পর্কে মিছে ভাবনা চিন্তে করে মাথাটা ভারাক্রান্ত করার কোন ইচ্ছে ছিল না ওর। যথাসময়ে পৌঁছে গেল ও এমব্যাসির ওয়াল-স্ক্রিন ঝোলানো রুমে।

'বাশারকে যে কাজে পাঠানো হয়েছিল সে কাজ শেষ করেছিল সে,' পাইপে টোবাকো ভরতে ভরতে বললেন রাহাত খান। 'যাবার সময় ফাইলটা পাবে তুমি। ওর সংগ্রহ করা সমস্ত তথ্য পাবে ওতে। বি.ও.এ. সি-র একটা প্লেন আজ ছাড়বে রাত দশটায়। যাত্রী তুমি একা। সাসেরটায় ল্যান্ড করার কথা ওটার রি-ফিলিংয়ের জন্যে। কমপাস ট্রাবলের জন্যে খানিকটা ডান দিকে চলে যাবে প্লেন। গোপনে নামবে ফোগিয়াতে। ফোগিয়া এয়ারপোর্টের নাম শুনেছ?'

উত্তরে 'না' বললেই ধমকে উঠবে বুড়ো, জানে রানা। নামটা ও শুনেছে। 'জ্বী, স্যার। ন্যাটোর ইমার্জেন্সী ল্যান্ডিং গ্রাউন্ড আছে ফোগিয়ায়।'

'লুসেরা রোডের পাশেই এয়ারপোর্ট। লুসেরা শহরের তিন মাইল বাইরে। ফোগিয়া এয়ারপোর্ট এখন ব্যবহার করা হয় না। লোকজন নেই। দিনের বেলায় গরু চরে। তোমরা যখন নামবে তখন জ্যোছনা থাকবে। তোমাকে নামিয়ে দিয়েই চলে যাবে প্লেন সাসেরটায়। এরপর তোমাকে কেউ কোনও রকম সাহায্য করবে না। ওখানে তোমার কাজ কি হবে, রানা?'

হাতের তালু দুটো ঘামছে ওর। বুড়ো খোলাখুলি কিছুই বলেনি এখন অবধি। সমস্যাটার উপর আলোকপাত করার কোন ইচ্ছা আছে বলেও মনে হয় না। যা জানার জানতে হবে বাশারের পাঠানো তথ্যভারাক্রান্ত ফাইল পড়ে।

ঢোক গিলে ধীরে ধীরে বলল রানা, 'বাশারের তথ্যগুলো পরীক্ষা করে দেখা দরকার, স্যার। তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করব।'

'সবচেয়ে আগে সোহানাকে উদ্ধার করবে।' রাহাত খানের গলায় আদেশ। 'একজনকে ইতিমধ্যেই হারিয়েছি আমি। আর একজনকে বিপদের মুখে ফেলে রাখতে পারি না। তোমার প্রথম কাজ, যে-ভাবেই হোক, কবীর চৌধুরীর হাত থেকে সোহানাকে মুক্ত করা।'

রানা বলল, 'কবীর চৌধুরী এয়ারক্র্যাফট-রহস্যের সাথে জড়িত। কবীর...'

ওর কথায় কান না দিয়ে মেজর জেনারেল রাহাত খান বললেন, 'এবার আর কাঁচা কাজ করে এসো না, রানা। আবার যেন বেঁচে না যায় শয়তানটা।

এটা আমার দু'নম্বর অর্ডার। আর কিছু জানার আছে?'

তোমার মাথার ভিতরের সেলগুলো কি দিয়ে তৈরি জানার বড় ইচ্ছা আমার, মনে মনে বলল রানা। মুখে বলল, 'না, স্যার।'

'যাও তাহলে। আহাদ এয়ারপোর্টে পৌঁছে দেবে তোমাকে। পাসপোর্ট, ফাইল—সব পাবে ওর কাছ থেকে।' রাহাত খান চোখ নামালেন টেবিলের উপর পেতে রাখা ইউরোপের ম্যাপে।

নিঃশব্দ পায়ে রুম থেকে বেরিয়ে গেল রানা।

চাঁদের আলোয় রানওয়ের দিকে তাকাল ও। ভাল দেখা গেল না। কিন্তু পাইলট জেনে শুনেই ল্যান্ডিঙের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আধ-মিনিটের মধ্যে রানওয়ে ছুঁলো চাকা। রানওয়ের পাশে গভীর ঝোপ-ঝাড়। ম্লান জ্যোৎস্না ছাড়া কোথাও কোন আলোর চিহ্ন নেই। আধ মাইল দৌড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল প্লেন।

মাঝরাত হতে আঠারো মিনিট বাকি। হাতঘড়ি থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে উঠে দাঁড়াল রানা সীট ছেড়ে। পাইলটের কেবিনে ঢোকার সাথে সাথে ক্যাপ্টেন বলে উঠল, 'বেস্ট অভ লাক, মি. আন-নোন।'

দরজা খুলে লাফ দিয়ে টারমাকে নামল রানা। পনেরো সেকেন্ড দাঁড়িয়ে থেকে এদিক ওদিক দেখে নিয়ে দক্ষিণ দিকের টারমাকের ধার ঘেঁষে হন হন করে হাঁটতে শুরু করল ও। হাতে অ্যাটাচি কেস।

সাত মিনিট পর নির্জন এয়ারপোর্ট এলাকা থেকে রাস্তায় পৌঁছুল রানা। প্রশস্ত রাস্তা। ঝকঝক তকতক করছে। শহরের দিকে চলে গেছে সোজা। আকাশে একটি পাখি বা রাস্তায় একটি কুকুর—কিছুই নেই। দ্রুত হেঁটে মিনিট পাঁচেক পর চৌমাথায় এসে দাঁড়াল ও। লাইট পোস্টগুলো শুরু হয়েছে এখান থেকে। সোজা রাস্তার দিকে না গিয়ে ডান দিকে মোড় নিল রানা।

পঁচিশ গজ এগোবার পর ছোট্ট সাইনবোর্ডটা দেখা গেল একটা লাইট-পোস্টের গায়ে ঝোলানো। সান নিকানডো রোড।

দুশো গজ পেরোবার পর পাহাড়ের খাড়া গা দেখতে পেল রানা। হাঁটার গতি শ্লথ করল ও। আর খানিকটা হাঁটলে পাহাড়ে ওঠার রাস্তা পাওয়া যাবে। বাশার ওখান দিয়েই উপরে উঠে গিয়েছিল।

এয়ারপোর্ট থেকে সরাসরি শহরে গিয়ে হোটেলে ওঠার পরিকল্পনাটা শেষ মুহূর্তে বাতিল করে দিয়েছে রানা। বাশার যা দেখেছিল তা একবার দেখা দরকার নিজের চোখে।

ওটা আসলে ঠিক পাহাড় নয়। বস্তুত মন্টি সোরানো একটা মৃত আগ্নেয়গিরি। আগ্নেয়গিরিটার দুটো মুখ। একটা চুড়োর কাছে। দ্বিতীয়টা পশ্চিম দিকের ঢালু পাহাড়ের গায়ে, চুড়ো থেকে দুশো ফিট নিচে। নিচের আগ্নেয়গিরির মুখ থেকে খাড়া নেমে গেছে পাহাড়ের গা—মিশেছে চওড়া একটা রাস্তার কিনারায়। অ্যাপ্রিসিনা থেকে সান মার্কোয় যাবার একটাই মাত্র রাস্তা ওটা।

চাঁদের আলোয় আবছাভাবে কাঁটাতারের বেড়া চোখে পড়ল রানার। দাঁড়িয়ে পড়ে বেড়াটা পরীক্ষা করল ও। কংক্রিটের পিলার দশ-বারো হাত পর পর। ছয় ইঞ্চি পর পর কাঁটাতার জড়ানো পিলারের গায়ে। দেড় মানুষ উঁচু। সন্তর্পণে তার বেয়ে উপরে উঠতে শুরু করল রানা। পিলারের মাথায় উঠে লাফিয়ে অপর দিকে নামল।

মন্টি সোরানো মানাটোফের এস্টেট। সুরক্ষিত করার চেষ্টার কোন ত্রুটি নেই তার।

কাঁটাতারের বাধা অতিক্রম করে ঢালু পাহাড়ের গা বেয়ে উঠতে শুরু করল ও। আড়াই ঘণ্টা প্রচণ্ড কায়িক পরিশ্রম করার পর আগ্নেয়গিরির শীর্ষ মুখ পেরিয়ে এল রানা। দুটো বড় পাথরের মাঝখানে থামল ও। চুড়ো থেকে শ'খানেক ফিট নিচে জায়গাটা। জ্বালামুখ দুটোর মাঝামাঝি জায়গায় পাথর দুটো। এর বেশি এগোবার চেষ্টা করা বোকামি। বাশারের রিপোর্ট অনুযায়ী আর দশ কদম পর থেকে মাইন পোঁতা আছে নুড়ি পাথরের নিচে।

ছোট জ্বালামুখটার পশ্চিম দিকটা খোলামেলা। সমতল পাথরের প্রশস্ত জায়গা খানিকটা। তারপর খাড়া নেমে গেছে পাহাড়ের গা। একধারে সরু একটা পথ, হারিয়ে গেছে বাঁ দিকের সার বাঁধা ঘরগুলোর পাশ ঘেঁষে। উত্তর দিকের মেন গেটে গিয়ে মিশেছে পথটা। মেন গেটটা দেখতে পাবার কথা দিনের আলোয়। পাহাড়ের গা বেয়ে গাড়ি আসে ওই টানেলে। মোটা স্টীলের দরজা পেরিয়ে সরু পথটা দিয়ে জ্বালামুখের সামনের চত্বরে পৌঁছানো যায়। ওটাই ভিতরে ঢোকার রাস্তা। আরও আছে। জ্বালামুখটা চত্বরের বেশ খানিকটা উপরে। বাশার এয়ারক্র্যাফটটাকে উঠতে দেখেছিল জ্বালামুখের নিচে থেকে।

ঘরগুলোর পরিষ্কার কাঠামো দেখার জন্যে সকাল অবধি অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় দেখল না রানা। ঘড়ি দেখল ও। আধঘণ্টা পরই একটু একটু আলো পাওয়া যাবে।

পনেরো মিনিট পর অ্যাটাচি কেসটা খুলে ফেলল রানা বিনকিউলারটা বের করার জন্যে। প্রথম গুলির শব্দটা হলো তখনই।

দুটো পাথরের মাঝখানে দাঁড়িয়েছিল ও। মাথার কাছ ঘেঁষে বেরিয়ে গেল বুলেট। ঝপ্ করে বসে পড়ল রানা। পরপর দুটো বুলেট এসে লাগল পাথরের গায়ে।

গুলি করা ছাড়া উপায় নেই ওদের। মাইন ফেলে রাখায় এগিয়ে আসার পথ বন্ধ ওদের। রানাকে ফাঁদে ফেলতে হলে সান নিকানডো রোডের পাশ দিয়ে পাহাড়ে উঠে আসতে হবে শত্রুপক্ষকে।

হঠাৎ মনে মনে থমকে গেল রানা। জেনে ফেলেছে শত্রু পক্ষ ওর উপস্থিতি। অনুমান করা মোটেই কষ্টসাধ্য নয় কোন্ পথে উপরে উঠে এসেছে ও। শত্রু সান নিকানডো রোডে পৌঁছে যায়নি তো ইতোমধ্যে? নিচের জ্বালামুখের ডান পাশের ঘরগুলো থেকে কেউ যদি একটা গাড়ি স্টার্ট দিয়ে পাহাড় বেয়ে নেমে গিয়ে থাকে তাহলে ওর তা জানার কথা নয়। গাড়ির শব্দ

শুনতে না পাবারই কথা। প্রধান বাড়িটা থেকেও গাড়ি যেতে পারে।

দ্রুত হাতে অ্যাটাচি কেস বন্ধ করে হামাগুড়ি দিয়ে দ্বিতীয় পাথরটার ওপারে চলে গেল রানা। ছুটে এল একঝাঁক বুলেট।

চারটে রাইফেল একসাথে গর্জে উঠেছে বুঝতে পারল ও। দ্বিতীয় পাথরটার ওপারে গিয়ে ঢালু পাহাড়ের গা বেয়ে দ্রুত নামতে লাগল রানা। বুলেট ওর কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। কিন্তু সামনে যদি শত্রুপক্ষ সদলে বাধা দেয় তাহলে বাঁচার উপায় কি? একটা রিভলভার ক'জনকে রোধ করতে পারবে?

শত্রুপক্ষ থাকবে নিচে, আত্মগোপন করে। ওকে নামতে হবে নিচের দিকে। আত্মগোপন করে পিছিয়ে যাওয়া সম্ভব। নামা সম্ভব নয়।

নামতে নামতে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। রাতের আঁধারে শত্রুর মুখোমুখি হওয়াটা স্রেফ বোকামি। দিনের আলোয় অনেক বেশি সাবধান হবার সুযোগ পাবে ও।

যে-পথে নেমে এসেছে সেই পথেই উপরে উঠতে শুরু করল রানা। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওঠা যায়। কিন্তু পাথরের খাঁজ ধরে ধরে যতটা সম্ভব মাথা নিচু করে উপরে উঠে চলল ও। প্রথম পাথরটা হাত দশেক দূরে থাকতে এগোবার গতি আরও শ্লথ করল ও। প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে সামনে বাড়ছে। কুড়ি মিনিট পর প্রথম পাথরটাকে পেরিয়ে দুটো পাথরের মাঝখানে চলে এল রানা আবার।

গুলির শব্দ ত্রিশ মিনিট আগেই থেমে গেছে। নতুন করে আর কোন শব্দ হলো না রাইফেলের। পরিশ্রম সার্থক। ওরা মনে করেছে পালিয়ে গেছে অনাহূত আগন্তুক। জোরে নিঃশ্বাস ছেড়ে নিচের আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখের ডান পাশের ঘরগুলোর দিকে তাকাল রানা। আলোকিত হয়ে উঠছে পুবের আকাশ। সারবাঁধা ঘরগুলোর ছাদের উপর উঁচু পাঁচিল দেখা যাচ্ছে। পাঁচিলের গায়ে ফোকর রয়েছে এক গজ পরপর। ওখান থেকেই গুলি করা হয়েছিল, অনুমান করল ও।

নিঃসাড় পড়ে রইল রানা শক্ত পাথরের ওপর উপুড় হয়ে। মাথাটা খানিক উঁচু করে আবছা আলোয় জ্বালামুখের আশপাশটা দেখার চেষ্টা করল ও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে।

ডান দিকের সরু পথটা হারিয়ে গিয়ে মিশেছে স্টীলের গেটের কাছে। তারপর টানেল শুরু। টানেল গিয়ে শেষ হয়েছে আধ মাইলটাক দূরে। তারপর পাহাড়ের গা বেয়ে খোলা রাস্তা।

আরও আধ ঘণ্টা পর রানা লোকজনের চলাফেরা লক্ষ করল সারবাঁধা ঘরগুলোর ভিতর। কয়েকটা জানালা খুলে গেল। দু'জন লোক দুটো দরজা দিয়ে দু'মিনিটের ব্যবধানে বেরিয়ে এসে উত্তর দিকে চলে গেল। রানার হিসেবে উত্তর দিকেই বসবাসের জন্য প্রধান বাড়িটা থাকার কথা। নিজের জায়গা থেকে বাড়িটাকে দেখতে পেল না ও। মানাটোফে বাংলোটার নাম দিয়েছে কাসা বিলাভিসটা।

খানিকপর আরও লোকজনের সাড়া পাওয়া গেল। ঘুম থেকে উঠে বিছানা ছেড়ে যে-যার কাজে হাত দিচ্ছে। ঘরগুলোয় চাকরবাকরদের গতিবিধি টের পেল রানা। বিছানা ঠিকঠাক করে রাখছে তারা। কোথাও কোন অস্বাভাবিকতা নেই। গ্রীষ্মকালীন অবসর বিনোদনের আদর্শ বাংলো ছাড়া আর কিছু সন্দেহ করবার উপায় নেই। কবীর চৌধুরী বা মানাটোফের কোন চিহ্ন দেখল না রানা।

ক্রমে দিনের আলো ব্যাপক ভাবে ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। সূর্য উঠল পাহাড়ের আড়ালে। টানেল থেকে বেরিয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে যাচ্ছে ভ্যান। মাঝে মাঝে মোড় নিয়ে হারিয়ে যাচ্ছে সেটা আড়ালে। পাঁচ দশ মিনিট পর আবার দৃষ্টি সীমার মধ্যে মোড় নিয়ে ফিরে আসছে ভ্যানটা। মেন রোডের দিকে নেমে যাচ্ছে ওটা। কাসা বিলাভিসটার প্রধান বিল্ডিং থেকে রওনা দিয়েছে ভ্যানটা।

সময় গড়িয়ে চলেছে ঢিমে তালে। ফেরার কথা মনে থাকলেও কৌতূহল না মিটিয়ে ফিরতে ইচ্ছা করছে না রানার। ঘন্টার পর ঘন্টা কেটে যাচ্ছে, অথচ ঘটছে না কিছুই। কিছু না দেখে ফিরে যাওয়াটা মনঃপূত হচ্ছে না ওর।

বেলা তখন দশটা। ঘাড় ফিরিয়ে উত্তর দিকে তাকাল রানা। আরও একটা গাড়ি দৃষ্টিতে ধরা পড়ল। আগেরটা বহু আগেই নেমে গেছে নিচের মেন রোডে। এটা ভ্যান নয়। উপর দিকে উঠে আসছে মন্থরবেগে।

প্রায় একহাজার গজ দূরে তখনও গাড়িটা। কিন্তু পরিচিত ঠেকল যেন রানার চোখে। বিনকিউলার বের করে চোখে লাগাবার পরমুহূর্তেই পাহাড়ের বাঁকে মোড় নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল গাড়িটা। কিন্তু নিজের বেন্টলীকে একপলক দেখেই চিনে নিয়েছে ও।

তিন মিনিট পর আবার দেখা গেল বেন্টলীকে। টানেলের দিকে এগোচ্ছে সেটা। টানেলের ভিতর দিয়ে আধমাইল পথ পেরিয়ে মেন গেটের সামনে এসে দাঁড়াল বেন্টলী। রানার কাছ থেকে মাত্র দুশো গজ দূরে মেন গেট।

প্রায় একই সাথে বেন্টলীর দু'দিকের দরজা খুলে গেল। দু'জন লোক নামল ভিতর থেকে। ড্রাইভার পিছনের দরজা খুলে মাথা নিচু করে গাড়ির ভিতরে কারও সাথে কথা বলে দু'পা পিছিয়ে এল।

রানা পরিষ্কার দেখতে পেল না সোহানাকে।

গাড়ি থেকে ধীরেসুস্থে নামল ও। ড্রাইভার একটা হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল, কিন্তু কারও সাহায্য না নিয়েই মেন গেটের দিকে পা বাড়াল সোহানা। ওর মুখের হাবভাব স্পষ্ট দেখতে পেল না রানা দূর থেকে। কিন্তু সোহানা সুস্থ আছে বুঝতে পেরে ভাল লাগল ওর।

মেন গেট পেরিয়ে ভিতরে ঢুকল সোহানা। এরপর তাকে আর দেখতে পেল না রানা। ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে ভিতরে ঢুকে গেল। অপর আরোহী সোহানার পিছু পিছু আগেই অদৃশ্য হয়ে গেছে।

আরও একঘণ্টা অপেক্ষা করার পরও নতুন কিছু দেখার সুযোগ ঘটল না রানার। বিনকিউলার অ্যাটাচি কেসে ভরে হামাগুড়ি দিয়ে নামতে শুরু করল ও

পাহাড় থেকে।

শহরে ঢোকার মুখেই গ্যারেজটা। সরাসরি ম্যানেজারের কেবিনে ঢুকল রানা।

নীল রঙের একটা ফিয়াট ভাড়ায় নিয়ে গ্যারেজ থেকে সোজা হোটেল আলবেরগোর দিকে রওনা হলো ও। গাড়ির ভাড়া বাবদ অগ্রিম দিতে কোনও অসুবিধে হলো না ওর। বুড়ো বস্ ইটালিয়ান কারেন্সি ভরে দিতেও ভোলেনি অ্যাটাচি কেসে।

ছোট শহর লুসেরা। কিন্তু লোকবসতি খুব ঘন। লোকসংখ্যার অর্ধেক প্রাইভেট কার। কড়া রোদেও বাচ্চারা ফুটবল খেলছে রাস্তার ধারে। কাফেগুলোয় মেয়েদের ভিড়। ছাদ-খোলা গাড়িতে করে অর্ধনগ্ন যুবক যুবতীরা রঙিন বল লুফতে লুফতে চলেছে সমুদ্রের দিকে। ফোগিয়া থেকে পঁচিশ মাইল উত্তরে সমুদ্র-সৈকত।

হোটেল আলবেরগোর তেতলায় একটা রুম পেল রানা। গ্যারেজে গাড়ি তোলার ভার পোর্টারকে দিয়ে সোজা নিজের রুমে উঠে এল ও অ্যাটাচি কেস হাতে নিয়ে। পাঁচ মিনিট পর রুম-বয়কে ডেকে লাঞ্চের অর্ডার দিয়ে ঢুকল বাথরুমে।

শাওয়ারের নিচে ভিজতে ভিজতে পরিকল্পনা ঠিক করল রানা। যে করে হোক কাসা বিলাভিসটায় আজ বিকেলে যাবে ও। শেষবার কবীর চৌধুরীকে ভেনিসে দেখা গেছে। বর্তমানে লুসেরায় সে আছে কিনা জানা নেই ওর। কিন্তু মানাটোফ সম্ভবত আছে। ওখানে যাওয়া মানে স্বেচ্ছায় বন্দী হওয়া। এছাড়া কোনও উপায় দেখল না রানা। মানাটোফ বা কবীর চৌধুরীর আস্তানায় লুকিয়ে প্রবেশ করা অসাধ্য না হলেও সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। পাহাড়ের গায়ে কোথাও না কোথাও অবশ্যই লুকানো গুপ্ত পথ আছে। জার্মানরা গত যুদ্ধে বোমার গুদাম করেছিল মন্টি সোরানোকে। টানেল দিয়ে যাওয়া-আসার রাস্তা ছাড়া অন্তত আর দু'চারটে গোপন পথ তারা তৈরি করেছিল নিশ্চয়ই। মৃত আগ্নেয়গিরির ভেতর বিপদের সময় আটকে মরার ইচ্ছা তাদের থাকার কথা নয়।

কিন্তু পথ আবিষ্কার করে কাসা বিলাভিসটায় পৌঁছুতে হলে প্রচুর সময়ের দরকার। হয়তো চার-পাঁচদিন লেগে যাবে।

তারচেয়ে বন্দী হওয়া ভাল। কবীর চৌধুরী আগ্নেয়গিরির পেটের ভিতর আস্তানা গেড়ে কি কাজে ব্যস্ত তা জানার সুযোগ পাবে ও। সোহানার সাথেও দেখা হবার সম্ভাবনা রয়েছে।

লাঞ্চ সেরে দরজা জানালা বন্ধ করে ঘুমিয়ে পড়ল রানা। রুম-বয়কে বলে রেখেছে আগেই, সময়মত ডাকবে সে।

কিন্তু কেউ ডাকার আগেই ঘুম ভেঙে গেল ওর। ঝট্ করে বালিশের তলা থেকে রিভলভারটা হাতে নিল ও। কান পেতে শোনবার দরকার হলো না। শব্দটা জোরেশোরেই হচ্ছে। কাগজের শব্দ। খস্-খস্স্-খস্-খস্-খস্স্।

সন্তর্পণে বিছানা ছেড়ে ব্যালকনির দিকের দরজাটার পাশে গিয়ে দাঁড়াল

রানা। তালা খুলে ফেলল ও নিঃশব্দে। তারপর আচমকা নব ধরে টান মারতেই দরজার পাল্লা দুটো খুলে গেল। মুচকি হাসল ও।

ব্যালকনিতে আটকে গেছে একটা ঘুড়ি। রিভলভারটা বিছানার উপর ছুঁড়ে দিয়ে ব্যালকনির রেলিঙের কাছে এসে দাঁড়াল ও। দুটি ছেলে তাকিয়ে আছে উপর দিকে। একজনের হাতে একটা লাটাই। দু'ভাই হবে ওরা। দু'জনেই ছোট। একজন দশ-এগারো, অন্যজন আট নয় বছরের। রানাকে দেখে পরস্পর কি যেন বলাবলি করল। বড় ছেলেটি উপর দিকে তাকাল আবার। রানার মেজাজ বোঝার চেষ্টা করছে সে। তারপর জোরে চিৎকার করে কি যেন বলল। ঘুড়িটা ছাড়িয়ে দেবার অনুরোধ।

একটু ভাবল রানা। ঘুড়িটা ছিঁড়ে গেছে রেলিঙের এপারে আটকে গিয়ে। ওরা জানে না এখনও। ছেঁড়া ঘুড়ি দেখে মন খারাপ হয়ে যাবে বেচারাদের।

ছেলেটির অনুরোধের উত্তরে হেসে অপেক্ষা করার ইঙ্গিত করল রানা। ব্যালকনি থেকে রূমের ভিতর চলে গেল ও। কয়েক সেকেন্ড পর বেরিয়ে এসে ছেঁড়া ঘুড়িটা ছাড়াল রেলিং থেকে। তারপর সুতোর সাথে বেঁধে দিল একটা ইটালিয়ান নোট। এদেশের আড়াই টাকার সমান মান নোটটার।

ছেঁড়া ঘুড়িসহ নোটটা ছেলে দুটোর হাতে পৌঁছুল। দু'জনেই অবাক হয়ে তাকাল রানার দিকে। বড় ছেলেটি কি যেন বলল ছোটটিকে। প্রবল বেগে মাথা নাড়ল ছোট ছেলেটি। হাসি পেল রানার। ছোট ছেলেটির হাবভাব দেখে বুঝতে পারছে ও, টাকাটা ফিরিয়ে দেবার প্রস্তাব মেনে নিতে রাজি নয় সে। বড় ছেলেটি আরও কি সব বলছে তাকে। রানা দেখল পকেটে হাত ঢুকিয়ে দুটো চকোলেট বের করল ছোট ছেলেটি। বড়টিও তাই করল। তারপর রানাকে চকোলেটগুলো দেখিয়ে নিজেদের ভাষায় বলল, 'আপনাকে আমাদের এই চকোলেটগুলো নিতে হবে।'

রানা দু'হাত একত্রিত করে লুফে নেবার ভঙ্গি করে বলল, 'ছুঁড়ে দাও, দেখি ধরতে পারি কিনা।'

চকোলেটগুলো ঘুড়ির কাগজে মুড়ে ছুঁড়ে দিল বড় ছেলেটি। কিন্তু অত উঁচুতে উঠল না প্যাকেটটা। দ্বিতীয় এবং তৃতীয়বারও ব্যর্থ হলো সে।

'থাক, অন্য কোন সময় দিয়ো, কেমন?' হেসে ফেলে বলল রানা।

অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ছেলে দুটো। রানা ফিরে এল রূমে। দরজায় নক হলো তখনই। রূম-বয় সময় মতই এসেছে। রানা দরজা না খুলেই বলল, 'কফি নিয়ে এসো। তাড়াতাড়ি।'

'দরজাটা খুলুন, স্যার,' বাইরে থেকে বলল রূম-বয়। 'আপনার একটা চিঠি আছে।'

চিঠি?

বিস্মিত ভাবটা প্রকাশ না করে দরজা খুলল রানা। একটা খাম এগিয়ে দিল রূম-বয়। রানা হাত বাড়িয়ে খামটা নিতেই চলে যাবার জন্যে ঘুরে দাঁড়াল সে। ওকে বাধা দিল রানা, 'কে নিয়ে এসেছে এই চিঠি? কখন?'

'আধঘণ্টা আগে একটা লোক এসেছিল, স্যার। আমি তখন ম্যানেজারের

চেম্বারে ছিলাম। সাদা একটা মরিস গাড়ি করে এসেছিল। আপনার নাম করে দিয়ে গেছে চিঠিটা। ম্যানেজার তখনই দিয়েছিল ওটা আমাকে আপনার কাছে পৌঁছে দেবার জন্যে।' অপরাধী ভঙ্গিতে মাথা নিচু করল ছেলেটা। 'দুঃখিত, স্যার। সাথে সাথে পৌঁছে দেয়া উচিত ছিল আমার। কিন্তু আপনাকে বিরক্ত করা হবে ভেবে...'

'ঠিক আছে, তুমি কফি নিয়ে এসো।'

দরজা বন্ধ করে দিয়ে খামের উপর লেখাটা পড়ল রানা। পরিষ্কার ইংরেজীতে টাইপ করা—টু মেজর মাসুদ রানা। হোটেল আলবেরগো, রুম নাম্বার নাইনটিন, সেকেন্ড ফ্লোর। লুসেরা।

খামটা ছিঁড়ে চিঠিটা বের করল রানা। সম্বোধনের জায়গায় 'বন্ধুবরেষু মাসুদ রানা' লেখা। চিঠির শেষে লেখা, 'তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী কবীর চৌধুরী।'

দুটোই মিথ্যে কথা। মনে মনে হাসল রানা। কবীর চৌধুরী বন্ধু নয়, শুভাকাঙ্ক্ষী তো নয়ই।

কিন্তু হাসি নিভে গেল ওর ঠোঁট থেকে। ধরা পড়ে গেছে ও। এত সাবধানে ইটালিতে ফিরে এসেও শয়তানটার চোখকে ফাঁকি দেয়া গেল না।

কবীর চৌধুরী লিখেছে:

'ভেনিস থেকে ফিরেই আমি শুনলাম খানিক আগে ফোগিয়া এয়ারপোর্টে একটা প্লেন ল্যান্ড করার প্রায় সাথে সাথে আবার উড়ে গেছে। প্লেনটা বি. ও. এ. সি-র জানতে পেরেই আমি বুঝলাম মাসুদ রানা এই অপ্রত্যাশিত ল্যান্ডিঙের সাথে জড়িত।

'আমার ফোগিয়ার বন্ধুবান্ধবেরা খুব অল্প সময়ে খুঁজে বের করেছে তোমাকে।

'আশা করেছিলাম বটে তুমি আবার ইটালিতে ফিরে আসবে অচিরেই, কিন্তু এত তাড়াতাড়ি তা অবশ্যই ভাবিনি। যাক, আমার জন্যে ভালই হয়েছে বলতে হবে। মিস সোহানা প্রতি মুহূর্তে কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের যে-কোন এজেন্টকে আশা করছে আমার আস্তানায়। ওকে উদ্ধার করার জন্যে মেজর জেনারেল রাহাত খান লোক পাঠাবে একথা ভাবা ওর পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। রাহাত খান ওকে বিশেষ দৃষ্টিতে দেখে তা তো আর ওর অজানা নেই।

'অন্য যে-কোন এজেন্টের চেয়ে তোমার ওপর আস্থা মিস সোহানার বেশি। ইতোমধ্যেই সে তোমার নাম শুনিয়ে ভয় দেখিয়েছে আমাকে দু'বার। ও খুশি হবে তোমার উপস্থিতিতে। বিশ্বাস করো, আমিও খুশি হব। ভয় পেয়ো না, তোমাকে আমি এই মুহূর্তে অতিথি হিসেবেই চাই।

'সান মারকো রোড ধরে সোজা গাড়ি চালিয়ে এলে একটা লজ্ দেখতে পাবে। গেটের সামনে গাড়ি দাঁড় করালেই আমাকে পেতে কোনও অসুবিধে হবে না তোমার।

'তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী কবীর চৌধুরী।'

সাত

রুম-বয় কফি পট সাজিয়ে দিয়ে চলে যাচ্ছিল। রানা বলল, 'গ্যারেজ থেকে গাড়ি বের করতে বলো। আমি নামছি।'

সম্মতি জানিয়ে রুম-বয় চলে যেতে কফির পেয়ালায় চুমুক দিল রানা আয়েশ করে। এ বরং ভালই হলো। কবীর চৌধুরী না ডাকলেও যেতে হত ওকে।

কিন্তু খুঁতখুঁতে ভাবটা দূর হলো না মন থেকে। কেন এই আহ্বান? কবীর চৌধুরী আশা করল কেন ডাকলেই সুড়সুড় করে গিয়ে হাজির হবে সে?

প্রশ্নটা ওর মনকে ক্ষতবিক্ষত করার পক্ষে যথেষ্ট। হঠাৎ বুঝতে পারল রানা। ঠাট্টা করেছে কবীর চৌধুরী। হ্যাঁ, ক্ষমতার দম্ভে ঠাট্টা করেছে শয়তানটা।

লুসেরা শহরের ভিতর যে-কোন কুকাজ করার মত ক্ষমতা কবীর চৌধুরীর আছে। রানাকে জোর করে নিজের মুঠোয় নিয়ে যাওয়া মোটেই কষ্টসাধ্য হবে না তার পক্ষে। কিন্তু জোর করার আগে খেলাচ্ছলে চিঠিটা পাঠিয়েছে সে। রানা যদি না যায় তাহলে উপযুক্ত ব্যবস্থা সে নেবে। ঠাট্টা ছাড়া আর কি!

নিচে নেমে গাড়িতে ওঠার আগেই কচি কণ্ঠের চিৎকার শুনে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রানা। সেই দুই ছেলে ছুটে আসছে ওর দিকে। দু'জনের হাতে দুটো নতুন ঘুড়ি। রানার পাশে এসে দাঁড়াল দুইজন। গালভরা হাসি ওদের মুখে। রানা কথা না বলে ডান হাতটা পাতল ওদের সামনে। পকেট থেকে মুঠো ভর্তি চকোলেট বের করে ওর হাতের মাঝখানে রাখল বড় ছেলেটি। ছোট ছেলেটিও একমুঠো চকোলেট বের করল। টাকা ভাঙিয়ে ঘুড়ি আর চকোলেট কিনে হোটেলের আশেপাশে ঘুরঘুর করছিল ওরা রানা যদি নিচে নামে সেই আশায়।

চকোলেটগুলো পকেটে ভরে দু'জনার গাল টিপে আদর করে রানা বলল, 'লক্ষ্মী ছেলে তোমরা। এবার যাও।'

'তা আমরা যাচ্ছি,' বড় ছেলেটি আবদার করে বলল, 'কিন্তু আগামীকাল আমার জন্মদিনের পার্টিতে দাওয়াত তোমার। যাবে তো? এই তো কাছেই আমাদের বাড়ি। দুশো তেরো নম্বর, চারটে বাড়ি পরই।'

'অবশ্যই,' হাসি মুখে বলল রানা। 'কিন্তু আমি একটা কাজে অন্য জায়গায় যাচ্ছি। কবে ফিরব জানি না। ফিরলে দেখা করব, কেমন?'

ছোট ছেলেটি সম্মতি জানিয়ে বলল, 'ঠিক আছে। তাড়াতাড়ি ফিরে আসার চেষ্টা কোরো।'

ছেলে দুটো ধীর পায়ে চলে যেতে গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিল রানা। পাঁচ

সেকেন্ড পর পেছন থেকে শব্দ হলো আর একটি গাড়ি স্টার্ট নেবার। ধীরে ধীরে ঘাড় ফিরিয়ে পিছনের জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল রানা। একশো গজ পিছনে ফোক্সওয়াগেন গাড়িটা। দু'জন আরোহী।

গাড়িটা ছেড়ে দিয়ে রিয়ার ভিউ মিররে চোখ রাখল ও।

পিছনের গাড়িটা অনুসরণ করতে শুরু করেছে।

আধমাইলটাক এগিয়ে সামনের রাস্তার ধারে পার্ক করা সাদা মরিসটাকে দেখল রানা। ওর ফিয়াট সেটাকে পেরিয়ে যাবার আগে ছেড়ে দিল মরিস।

তেমাথার কাছে পৌঁছে সাদা মরিস মেন রোডের ওপর আড়াআড়ি ভাবে দাঁড়িয়ে পড়ল। পাশেই একটা গলি। পিছনের ফোক্সওয়াগেন ওভারটেক করল ফিয়াটকে। সরু গলিতে ঢুকে গেল সেটা। রানা ফিয়াট নিয়ে গলি ধরে খানিক দূরে এগোবার পরই আবার পিছনে দেখা গেল সাদা মরিসকে।

কবীর চৌধুরী কাসা বিলাডিসটার সামনের দরজায় অপেক্ষা করছিল। ফোক্সওয়াগেনটা পশ্চিম দিকের উঁচু ঢিবির উপর উঠে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। হাসি মুখে দু'পা এগিয়ে এসে নির্ভয়ে ফিয়াটের দরজা খুলে ফেলল কবীর চৌধুরী, 'গুড ইভনিং, রানা। তোমার সুবুদ্ধি দেখে খুশি হয়েছি আমি।'

শত্রুতামূলক কোনও হাবভাব প্রকাশ পেল না কবীর চৌধুরীর ব্যবহারে। অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করছে সে গোটা ব্যাপারটাকে।

গাড়ির ভিতর থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এল রানা। কবীর চৌধুরীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সরাসরি তাকাল ও কোলে কালি পড়া এক জোড়া চোখের দিকে।

'আমার ধারণা, মিস সোহানাকে দেখতে চাও তুমি। কিন্তু তার আগে তোমার সাথে কথা আছে আমার,' বলল কবীর চৌধুরী।

'আমি তৈরি,' সংক্ষেপে বলল রানা। 'কেন এখানে নিয়ে এসেছ আমাকে সেটাই জানতে চাই।'

'উইল ইউ ফলো মি?' উঁচু ঢিবির পাশ দিয়ে আগে বাড়ল কবীর চৌধুরী। দরজা পেরিয়ে বড় একটি সুসজ্জিত ঘরের ভিতর ওর পিছু পিছু ঢুকল রানা। আসবাব-পত্র দেখে অফিস রুম বলে মনে হলো। বিরাট একটা টেবিলের ধারে কয়েকটা চেয়ার।

'প্লীজ সীট ডাউন, রানা।' কবীর চৌধুরী টেবিলের অপর দিকে গিয়ে দাঁড়াল। কয়েক দফায় কয়েকটা বিষয় ব্যাখ্যা করব আমি—সেসব পরে হবে। তার আগে বলো, আমাকে বেঁচে থাকতে দেখে কী রকম চমকে গেছ তুমি?'

'না, খুশি হয়েছি আমি,' শান্ত গলায় বলল রানা। 'তোমাকে নিজের হাতে খুন করার নতুন সুযোগ পাওয়া গেছে একটা। সুযোগটা হাতছাড়া না করার চেষ্টা করব আমি।'

'এতটুকু বদলাওনি তুমি, তাই না?' কবীর চৌধুরী গম্ভীর হলো, 'কিন্তু বদলাতে হবে তোমাকে, রানা।'

'কি বলতে চাও বলে ফেলো, চৌধুরী,' অসহিষ্ণু গলায় বলল রানা,

'ভণিতা করছ কেন?'

ধীরে ধীরে বদলে গেল কবীর চৌধুরীর চেহারা। রানার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর মুখ খুলল। 'তোমাকে এখানে নিয়ে এসেছি, রানা,' কবীর চৌধুরী শান্ত অথচ ভারী গলায় বলল, 'কারণ আমি বিশ্বাস করি বর্তমানে যে অসীম গুরুত্বপূর্ণ কাজ আমি হাতে নিয়েছি তাকে স্বয়ং-সম্পূর্ণ করার জন্যে তোমার সাহায্য আমার একান্ত ভাবে দরকার। আমি জানি আমার সম্পর্কে তোমার মনোভাব কি রকম। কিন্তু, বিশ্বাস করো, আমার উচ্চাশা এমনই মূল্যবান যে সব কথা জানার পর আমাকে সমর্থন না করে পারবে না তুমি। এমন কিছু বলার আছে আমার যা শুনে আমাকে সাহায্য করার জন্যে তুমি নিজেই ব্যাকুল না হয়ে পারবে না। কিন্তু সে সব আরও পরের ব্যাপার।' টেলিফোন রিসিভারের উপর হাত বোলাতে বোলাতে গভীর ভাবে কিছু ভাবল কবীর চৌধুরী। তারপর আবার বলল, 'আমাকে বিশ্বাস করার কোন কারণ নেই তোমার। কিন্তু ভুলো না, আমি এমন এক প্রচণ্ড ক্ষমতা হাতে নিয়ে কথা বলছি যে, মিথ্যা কথা বলার কোনও প্রয়োজন আমার নেই। বলব সব তোমাকে—দেখাব, নিশ্চয়—কিন্তু তার আগে, তোমার বিশ্রাম দরকার। বিশ্রাম নিতে যাবার আগে, রানা, আমার একটা প্রস্তাব আছে।'

'বলে ফেলো,' কৌতূহল প্রকাশ না করে বলল রানা, 'আমি শুনছি।'

রানার কথা যেন শুনতে পায়নি কবীর চৌধুরী। চেহারা বা কণ্ঠস্বরের কোনও পরিবর্তন নেই, 'হিয়ার ইজ মাই প্রোপোজাল। আগামী চব্বিশ ঘণ্টা আমার পরিকল্পনায় কোনও রকম হাত বা বাধা দেবার চেষ্টা কোরো না। এই সময়টা তুমি দেখে, এবং শুনে, বোঝার চেষ্টা করো কোথায় গিয়ে পৌঁছেছি আমি, আর শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছি। যদি চব্বিশ ঘণ্টার ভেতর যুক্তি দিয়ে তোমাকে বোঝাতে না পারি আমি তাহলে··· সে তখনকার সমস্যা তখন সমাধান করা যাবে। আমার প্রস্তাবে যদি তুমি রাজি থাকো তাহলে তুমি আর সোহানা আমার ঘনিষ্ঠ সহচর এবং সম্মানীয় অতিথি হিসেবে থাকতে পারবে। কোথাও যেতে তোমাদের বাধা নেই, কেউ তোমাদের অসম্মান করবে না, আরাম-আয়েশের সম্ভাব্য সব রকম ব্যবস্থা করা হবে তোমাদের জন্যে। নিরস্ত্র থাকার এই প্রস্তাব দিচ্ছি তোমাদের স্বার্থে। আমার সদা সতর্ক প্রহরীদের হাতে মারা পড়ো এটা আপাতত চাইছি না আমি। কোন রকম বদ মতলব প্রকাশ পেলেই মেরে ফেলা হবে তোমাদের।'

বিরক্ত কণ্ঠে জবাব চাইল রানা, 'যদি রাজি না হই?'

'ছেড়ে দেব তোমাকে।' কবীর চৌধুরী হাসল, 'কিন্তু তাতে বিশেষ সুবিধে হবে না তোমার। আমার পছন্দসই ব্যবস্থা করব তখন কাজ উদ্ধারের জন্যে। তোমাকে আবার আমার হাতে পড়তে হবে। তখন আমার কোনও প্রস্তাব থাকবে না।'

'সোহানাকে নিয়ে কি করবে বললে না?' ব্যঙ্গাত্মক কণ্ঠে জানতে চাইল রানা।

'ওর মাথাটা পার্সেল করে পাঠিয়ে দেব লন্ডনে তোমাদের এমব্যাসিতে।

মেজর জেনারেল রাহাত খান আধমিনিট অন্তত হাঁ করে তাকিয়ে থাকবে পার্সেল খুলে,' নির্বিকার গলায় বলল কবীর চৌধুরী।

তা পারে শয়তানটা। হত্যায় কুণ্ঠা নেই কবীর চৌধুরীর। রানা সংযত করল মেজাজকে। 'বেশ,' বলল ও। 'আগামীকাল সন্ধ্যা পর্যন্ত তোমার কোন কাজেই বাধা দেব না। কিন্তু সোহানার সাথে দেখা না হওয়ার আগে ওর সম্পর্কে কোনও নিশ্চয়তা দিতে পারছি না আমি।'

'তুমি বোঝাতে পারবে ওকে।' কবীর চৌধুরী হাসল নিঃশব্দে, 'তোমার আদেশ ও অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে।' ফোনের রিসিভার তুলে বলল, 'ফ্যালকন? মিস সোহানার রুমে যাবেন মি. রানা। ওকে সাথে করে নিয়ে যাও।' রিসিভার নামিয়ে রেখে অন্দরমহলের দরজার দিকে ইঙ্গিত করল কবীর চৌধুরী, 'তুমি যেতে পারো, রানা।'

চেয়ার ছেড়ে ধীর পায়ে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল রানা। তারপর ঝট্ করে পিছন ফিরে তাকাল ও, 'তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে, চৌধুরী। আজ হয়তো নয়—কিন্তু তোমাকে ছাড়ব না আমি। তুমি আর আমি এক সাথে পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে পারি না। তোমাকে মরতে হবে।'

খেপে ওঠার কোনও লক্ষণ দেখা গেল না কবীর চৌধুরীর মাঝে। হেসেও উঠল না সে। দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের সাথে বলল, 'মানি না কথাগুলো। সব শোনার পর তুমি মত বদলাবে। আমি শিওর।'

দরজা খুলে বাইরের করিডরে পা ফেলে রানা এই প্রথম প্রশ্ন করল নিজেকে! কি এমন কথা বলতে চায় কবীর চৌধুরী? এমন প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস কোথা থেকে পাচ্ছে সে? ভিত্তিহীন কোনও জিনিসের উপর নির্ভর করে বড়াই করা কবীর চৌধুরীর স্বভাব নয়। উদ্বেগ বোধ করল রানা।

ফ্যালকনের দু পকেটে দুটি পিস্তল। করিডরে এসে দাঁড়িয়েছে সে। রানা তাকাতেই মাথা হেঁট করে অগ্রসর হবার জন্যে ইঙ্গিতে পথ দেখাল সে।

লিফটে চড়ে দোতলায় উঠল রানা। সোহানার রুম ভিতর থেকে বন্ধ ছিল। ফ্যালকন মৃদু শব্দে টোকা মারল দরজার গায়ে। ঝাঁঝাল গলা শোনা গেল ভিতর থেকে, 'কে? কেন বিরক্ত করছ আমাকে?'

ফ্যালকন বিনীত ভাবে বলল, 'মাফ করবেন, মিস সোহানা, মি. মাসুদ রানা আপনার দর্শনপ্রার্থী।'

আর কোন শব্দ এল না ভিতর থেকে। আধ মিনিট পর খুট্ করে খুলে গেল দরজা।

ফ্যালকন সামান্য একটু নত হয়ে সম্মান জানাল। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে করিডর ধরে অদৃশ্য হয়ে গেল। সোহানা সরে দাঁড়িয়ে ঢোকার পথ করে দিয়ে মৃদুস্বরে বলল, 'ভিতরে এসো, রানা।'

ভিতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল রানা। সোহানাকে সুসজ্জিত রুম দিয়েছে কবীর চৌধুরী। ড্রয়িংরুমের খোলা দরজা দিয়ে বেডরুমটা দেখা যাচ্ছে। সোফা সেট, টি. ভি, রেডিও, ফোন, স্টীলের আলমারি—সব আছে। শাড়ির বদলে প্যান্ট পরেছে সোহানা। লাল রঙের প্যান্টের সাথে হাফ-হাতা

সাদা শার্টে মানিয়েছে ওকে।

সোফায় বসে পকেট থেকে চেস্টারফিল্ডের প্যাকেট বের করল রানা। সিগারেট ধরিয়ে তাকাল সোহানার দিকে। ওকে লক্ষ করছে সোহানা। সোহানাই আবার কথা বলল, 'কেমন আছ, রানা?'

'তুমি কেমন আছ?' পাল্টা প্রশ্ন করল রানা।

'দেখতেই পাচ্ছ, শয়তানটার খপ্পরে রয়েছি,' নির্বিকার ভাবে বলল সোহানা।

'মুঠো থেকে কাল পালিয়েছিলাম। আজ আবার ধরা পড়েছি।'

'দুঃখ হয় তোমার জন্যে, রানা।' রানাকে বাঁকা কথা বলার অভ্যাসটা যেন ত্যাগ করতে পারছে না সোহানা, 'কাজের মানুষ হলে এই হয় বিপদ। ছিলে ছুটিতে। কারও সাতে পাঁচে ছিলে না। কাজটা নিয়ে এলাম আমি। অথচ তোমাকেও ওরা বাদ দিল না। দুর্ভাগ্যক্রমে তুমি ছিলে ভেনিসে। তাছাড়া শত্রুপক্ষ তোমাকে ভাল করেই চেনে। যমের মত ভয় করে ওরা তোমায়। সেটাই হলো কাল।'

নিঃশব্দে রানা হাসল একটু, 'তোমার কাজের কতদূর কি হলো, সোহানা?' হঠাৎ চিন্তিত হয়ে উঠল ও, 'এয়ারক্র্যাফটটা দেখেছ নাকি?'

পাঁচ সেকেন্ড রানার দিকে নিঃশব্দে তাকিয়ে রইল সোহানা। তারপর বলল, 'এয়ারক্র্যাফটের কথা তুমি জানলে কোথা থেকে?'

'জানি।' মুচকি হাসল রানা, 'তুমি কতদূর এগিয়েছ তাই বলো।'

রানার মুখোমুখি সোফায় বসল সোহানা। লাল ঠোঁট দুটো ফাঁক হলো একটু। হাসছে ও, 'বলব না। এটা আমার অ্যাসাইনমেন্ট। তুমি এর মধ্যে কেউ নও।'

পকেট থেকে একটুকরো লম্বা কাগজ বের করল রানা ধীরে ধীরে। রাহাত খান অনেক জিনিসের সাথে নিজের হাতে সই করা এই কাগজটাও ভরে দিয়েছেন ওর অ্যাটাচি কেসে। কাগজটায় চোখ রাখল রানা।

আধ মিনিট পর অধৈর্যভাবে প্রশ্ন করল সোহানা, 'কি ওটা?'

'দেখতে চাও নাকি?' কৌতুক নাচছে রানার দুই চোখে। কাগজটা সোহানার দিকে বাড়িয়ে দিল ও।

কাগজের আড়ালে সোহানার মুখটা দেখতে পেল না রানা। ওটা পড়তে পড়তে লাল হয়ে উঠেছে সোহানার সারা মুখ। ওতে লেখা কথাগুলো বাংলা করলে দাঁড়ায়: 'সোহানা, প্রথম সুযোগেই ফিরে এসো লন্ডনে। রানা সব দায়িত্ব বুঝে নিয়েছে।'

'এক্সকিউজ মি, রানা। তোমাদের বিরক্ত করতে হচ্ছে বলে আমি লজ্জিত,' কবীর চৌধুরীর গলা ভেসে এল লুকানো লাউডস্পীকারে। 'কিন্তু তোমার সবরকম আরামের দিকে দৃষ্টি রাখা আমার কর্তব্য। তাই বলছি তোমাকে যে-সব কথা বলব বলে জানিয়েছি সে-সব নিয়ে দুশ্চিন্তা করে খামোকা রাতের ঘুমটুকু নষ্ট কোরো না। কাল সকালেই সব জানতে পারবে তুমি। বিরক্ত করলাম বলে আর একবার ক্ষমা চাইছি। গুড নাইট।'

কোন মন্তব্য করল না রানা। ওর মুখের চেহারা শুধু কঠিন হয়ে উঠেছে দেখল সোহানা। সোহানাই কথা বলল, 'সরি, রানা। সত্যি কথা বলছি তোমাকে, কিছুই এখন পর্যন্ত জানতে পারিনি আমি। কবীর চৌধুরী কড়া পাহারায় রেখেছে আমাকে। প্রতিটি দেয়ালে ট্র্যান্সমিটার বসানো, সব সময় চোখে চোখে রেখেছে...'

নিবিড় ঘুম দিয়ে বেলা সাড়ে সাতটায় চোখ মেলল রানা।

কাপড়চোপড় পরে বাইরে বেরিয়ে গেলে কেউ বাধা দেবে কিনা ভাবল ও। বাড়ির ভিতর চলাফেরার শব্দ কানে আসছে। ঘুম ভাঙার পাঁচ মিনিট পরই দরজায় টোকা পড়ল। ওরা কি লক্ষ্য করছিল ওকে?

একজন উর্দিপরা বেয়ারা ট্রে হাতে ভিতরে ঢুকল রানার ডাকে।

'গুড মর্নিং, স্যার,' বিনীত ভঙ্গিতে বলল বেয়ারা, 'ঈল কাপো জানিয়েছেন আধ ঘণ্টার মধ্যে খোলা ছাদে আপনাকে পেলে তিনি খুশি হবেন।' ঈল কাপো কবীর চৌধুরীর ইটালিয়ান নাম।

হলের ঘড়িতে ঢং করে একটি শব্দ হলো। খোলা ছাদে কবীর চৌধুরী বসে রয়েছে, হলের দরজা পেরিয়ে সামনে চোখ মেলেই দেখল রানা।

বাতাস নেই এক ফোঁটা। রৌদ্রোজ্জ্বল সকাল। পশ্চিম উপত্যকার নিচে ছোট পর্বতগুলো আবছা দেখাচ্ছে ভোরের কুয়াশায়।

কবীর চৌধুরী সহাস্যে আহ্বান জানাল ওকে। 'আমরা পরস্পরকে পছন্দ করি না, রানা,' বলল সে। 'আমি জানি সুযোগ পেলে আমাকে খুন করবে তুমি। সোহানা তারপর বাঁচবে না—একথা জেনেও সুযোগ হারাবে না তুমি। আমিও তোমার সম্পর্কে সেইরকম মনোভাব পোষণ করি। কিন্তু এই মুহূর্তে পরস্পরের সহকর্মী হওয়া দরকার। আমাদের নিজ নিজ স্বার্থেই তা দরকার।'

রানা অল্প একটু হাসল, বলল, 'ওসব কথা বাদ দাও। কি যেন বলতে চাও তুমি?'

'অনেক কথা বলতে চাই। এ জায়গাটা কেমন? বসব কি আমরা?'

দুটো চেয়ার, একটা টেবিল, টেবিলের উপর টেলিফোন। টেলিফোন ছাড়া এক কদম নড়ে না কবীর চৌধুরী। ওরা বসল।

'আমার উদ্দেশ্য কি বলতে চাই। ইতিমধ্যে প্রচুর কাজ করে ফেলেছি। লক্ষ্য হাসিলের জন্যে হাতিয়ার অর্জন করেছি। আমার উদ্দেশ্য কি জানো, রানা? এই পৃথিবীর মানবকুল যাতে নিজেদের ধ্বংস না করতে পারে তার একটা কার্যকরী ব্যবস্থা করা। আশা করি এক কথায় তুমি আমার সাথে একমত হবে। এটা একটা রিয়েল ডেঞ্জার।'

কোনও মন্তব্য করল না রানা।

'ভয় পৃথিবীকে শাসন করে,' বলে চলল কবীর চৌধুরী, 'পৃথিবীর ভাল মানুষেরা এই সঙ্কট থেকে মানবজাতিকে মুক্ত করার পথে এক পা এক পা এগোচ্ছে। একদিন সে চুক্তি বাস্তবায়িত হবে। কিন্তু তাতে কতটা ফল পাবে পৃথিবীর মানুষ? বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে আর কত দিন লাগবে? আসলে

পৃথিবীর যে-কোন রাষ্ট্রের কাছে মানবজাতিকে ধ্বংস করার মত হাতিয়ার থাকা পর্যন্ত নিরস্ত্রীকরণ চুক্তি বা "যুদ্ধ নয়" চুক্তি যত বারই সম্পাদিত হোক না কেন—পৃথিবীর মানুষ নিরাপদ বোধ করতে পারে না। তুমি একমত?'

রানা বলল, 'অনেকটা। তোমার কথা শেষ করো আগে।'

'চার-পাঁচটা রাষ্ট্রের হাতে এই পৃথিবীর মানুষের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। অদূর ভবিষ্যতে মোট এক ডজন রাষ্ট্র আল্টিমেট উইপন তৈরি করতে এবং তা ব্যবহার করতে শিখবে। বারোটি রাষ্ট্রের বারোজন রাষ্ট্র প্রধানের যে-কোন একজন ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় ব্যবহার করতে পারে চরম অস্ত্র। যার পরিণতি মানবজাতির সম্পূর্ণ ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই নয়।'

রানার দিকে একটু ঝুঁকে পড়ল কবীর চৌধুরী, 'অ্যাক্সিডেন্টকেও ভুলে গেলে চলবে না। চরম অস্ত্র যাদের কাছে থাকছে তারা কাজে লাগিয়েছে কিছু টেকনিশিয়ানদের। তাদের কাজ বোমা নিক্ষেপ করা, রকেট ছোঁড়া কিংবা নির্দিষ্ট একটি বোতাম টেপা। কেউ আতঙ্কে, কেউ পাগল হয়ে গিয়ে, কেউবা স্রেফ নিজের অজ্ঞাতে বোধবুদ্ধি হারিয়ে টিপে দিতে পারে বিপজ্জনক ভয়ঙ্কর বোতামটা। উড়িয়ে দেয়া যায় কি দুর্ঘটনার আশঙ্কা?'

কবীর চৌধুরী উঠে দাঁড়াল চেয়ার ছেড়ে। কথা বলার সময় চোখমুখের রেখা থেকে থেকে বদলে যাচ্ছে তার। লোকটা যে আন্তরিক সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ রইল না রানার। ও বলল, 'নতুন আর কি বললে তুমি? যা বললে তা সবই সত্যি। এ সমস্যার কোনও সমাধান নেই।'

'শোনো, বন্ধু,' নিজের চেয়ারের পিছনে দাঁড়িয়ে দুই হাতলের উপর ভর দিয়ে রানার দিকে ঝুঁকে পড়ল কবীর চৌধুরী, 'রাজনীতিকরা যখন বৈঠকখানায় মীটিঙের পর মীটিং করেছে, আমি তখন কাজ করেছি। সেজন্যেই তোমাকে এখানে এনেছি। কারণ সমাধান পেয়ে গেছি আমি এবং তুমি আমার অনেক যন্ত্রের মধ্যে একটি।' কবীর চৌধুরী চেয়ারে বসল। 'প্রথম থেকে সব শোনো তুমি, রানা। তাহলে বুঝতে পারবে। বর্তমানে পৃথিবী দু'ভাগে বিভক্ত—দুটো ব্লক। দুই ব্লকের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব সবার জানা। দু'দলের কাছেই আছে চরম অস্ত্র, মানবজাতিকে একদম ধ্বংস করার পক্ষে যথেষ্ট।'

টেবিলের উপর থেকে গ্লাসটা তুলে নিয়ে গলায় এক ঢোক পানি ঢালল কবীর চৌধুরী, 'তৃতীয় একটি ব্লক সৃষ্টি করার মত সম্পদ এবং টেকনিক্যাল নলেজ আমি সংগ্রহ করেছি। প্রতিভাবান বিজ্ঞানী আর সম্পদশালী বহু লোককে আমি সাহায্যকারী হিসেবে পেয়েছি, যারা প্রধান দুই ব্লকের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব চলছে তাকে ঘৃণা করে এবং তাদের প্রভাবকে ক্ষুণ্ন করার জন্যে যে-কোন ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত। হাইড্রোজেন বোমার দ্বারা যে আতঙ্ক জনজীবনে ছড়িয়ে পড়েছে তাকে চিরতরে নষ্ট করে দেবার যে কোন প্রচেষ্টায় তারা আগ্রহী ছিল, আমি তাদের আগ্রহকে কাজে লাগিয়েছি।'

রানার দিকে নিষ্পলক কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল কবীর চৌধুরী। তারপর আবার শুরু করল, 'আমার মাথার ভিতর চব্বিশ ঘণ্টা আলোড়িত হচ্ছিল এমন একটি অস্ত্র তৈরি করার চিন্তা যা হাইড্রোজেন বোমাকে ছাড়িয়ে

যাবে। একটিমাত্র হাইড্রোজেন বোমা তৈরি করার জন্যে প্রচুর টাকা, মূল্যবান বহু ব্রেন এবং জিনিসপত্র দরকার। তারপর তৈরি করার সময় সামান্য এতটুকু ভুল হলে অবিশ্বাস্য দুর্ঘটনা ঘটে যাবার আশঙ্কা। বোমা গুদামজাত করাটাও প্রকাণ্ড এক সমস্যা। এতগুলো ঝামেলা সৃষ্টি করে যে-বস্তু সেটা চরম ধ্বংসাত্মক অস্ত্র হতে পারে না, এই ছিল আমার ধারণা। তাই হাইড্রোজেন বোমা তৈরি করার কথা ভাবা আমি ছেড়ে দিলাম। তার বদলে আমি ভাবতে আরম্ভ করি এমন কোন জিনিস আবিষ্কার করা সম্ভব কিনা, যা হাইড্রোজেন বোমাকে, যে-কোন দূরত্ব থেকে, যে-কোন আবহাওয়ায় অকেজো করে দেয়া যায়। কিংবা সেগুলোকে ফাটিয়ে দেয়া যায়। যদি যায় তাহলে নিউক্লিয়ার বোমা মূল্যহীন হয়ে পড়তে বাধ্য। অসহনীয় আতঙ্কের এবং নিরাপত্তা বোধহীনতার হাত থেকে পৃথিবীর মানুষ চিরতরে বেঁচে যাবে তাহলে।'

আবার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল কবীর চৌধুরী। আবেগে কাঁপছে তার দুই হাত। ঠিকরে বেরুচ্ছে চোখ দুটো।

'আমি সফল,' চেঁচিয়ে উঠল সে, 'আমার হাতে এমন সব যন্ত্র আছে যা দিয়ে যে-কোন রাষ্ট্রের যে-কোন জায়গায় হাইড্রোজেন বোমা ফাটিয়ে দিতে পারি আমি। আমি এক বাস্তব বিভীষিকা এই মুহূর্তে। আমি এক মহাবিপদ, এই বিপদের মুখোমুখি হবার ক্ষমতা পৃথিবীর কারও নেই। তোমার সহযোগিতা পাবার জন্যে এটুকুই কি যথেষ্ট নয়, রানা, মাই ফ্রেন্ড?' সশব্দে ফের চেয়ারে বসে পড়ল কবীর চৌধুরী। রুমাল বের করে মুখের ঘাম মুছল সে।

শান্তভাবে কথা বলার চেষ্টা করল রানা, 'দাবি করছ অনেক দূর এগিয়েছ তুমি। তোমাকে বিশ্বাস করব কেন আমি?'

হঠাৎ ঠাণ্ডা হয়ে গেল কবীর চৌধুরী। মৃদু হাসল, 'অর্জন না করলে অত বড় দাবি করতাম না,' বলল সে। 'কিন্তু আমার সমস্যার নার্ভে আঙুল রেখেছ তুমি। আমি যা অর্জন করেছি তা সামান্য নয়। গোটা পৃথিবীকে হতভম্ব করে দেবার জন্যে যথেষ্ট। কিন্তু কে বিশ্বাস করবে আমার কথা? সরাসরি কোন রাষ্ট্রকে যদি আমার কথা জানাই তাহলে সে-কথায় গুরুত্ব দেয়া তো দূরের কথা, আমাকে বদ্ধ পাগল ঠাওরাবে তারা। কিন্তু তোমার কথা আলাদা। তুমি বি. সি. আই-এর এজেন্ট, এবং বি. সি. আই-এর চীফ মেজর জেনারেল রাহাত খান। রাহাত খানকে যদি তুমি ঠিক ঠিক বোঝাতে পারো তাহলে সে ঠিক ঠিক বোঝাতে পারবে তার এবং বিদেশের অন্যান্য রাষ্ট্র প্রধানকে। আর আমার দায়িত্ব তোমাকে বোঝাবার। কথায় বলব, চোখেও দেখাব। আমার গল্পের কথায় ফিরে আসি আবার। আমার দ্বিতীয় সমস্যা ছিল পৃথিবীব্যাপী বিস্ফোরণমূলক বস্তু কোথায়, কি পর্যায়ে আছে তার একটি তালিকা তৈরি করা। অর্থাৎ আণবিক বোমা তৈরি করার কাজ কোথায় কি পর্যন্ত এগিয়েছে এবং তৈরি বোমার বেস্ বা গুদামের তালিকা করা। খুব অল্প সময়ের ভেতর তালিকা সম্পূর্ণ করতে পেরেছি আমি, সর্বত্র রয়েছে আমার ডান হাত-বাঁ হাতের বিরাট কাহিনী। আমি আশ্চর্য হয়েছি ফ্রান্সের আণবিক বোমা গুদামজাত করার খরচ বহুল অত্যাধুনিক পদ্ধতি জেনে। ফ্রান্স এই তো সেদিন

মাঠে নেমেছে আণবিক বোমা হাতে নিয়ে।

'ইটালিতে মূল হেডকোয়ার্টার করেছি আমি। কারণ ব্যাখ্যা করব না। নিউক্লিয়ার বেস্‌কে মূল্যহীন করার কাজে আমি কতটা সফল হয়েছি তা বললাম তোমাকে। এবং বলব এমন একটি যান সম্পর্কে যার সাহায্যে আমি যে ক্ষমতা অর্জন করেছি তা নিখুঁত এবং বাধাহীনভাবে ব্যবহার করা যাবে। ব্রেকফাস্টের পর সেটা দেখাব তোমাকে। ওটার যান্ত্রিক জটিলতা তুমি বুঝবে না। দরকারও নেই বোঝার। গুণ এবং কার্যক্ষমতা দেখালেই তুমি বুঝতে পারবে পৃথিবীর আশ্চর্যতম আবিষ্কার ওটা। এ ব্যাপারেও বন্ধুদের সাহায্য পেয়েছি আমি। আমি একজন বিজ্ঞানী। তাই আর একজন বিজ্ঞানীর কৃতিত্ব আমাকে গর্বিত করে তোলে। তার নাম না বলে পারছি না। আমার সেই বন্ধুর নাম কারামোভিচ।'

'কারামোভিচ,' অবাক হয়ে প্রশ্ন করল রানা। 'ভ্লাদিমির কারামোভিচ? কিন্তু তিনি তো আজ পাঁচ বছর আগে সাইবেরিয়ায় নিহত হয়েছেন!'

'হ্যাঁ, শব্দের চেয়ে পাঁচগুণ বেশি গতিসম্পন্ন এয়ারক্র্যাফট তৈরি করা যায় কিনা পরীক্ষা করার সময় তিনি নিহত হয়েছেন বলে খবর ছড়িয়ে পড়ে। নিজের ডিজাইনে তৈরি করা এয়ারক্র্যাফটে চড়ে আকাশে ওড়েন তিনি। তারপর তাঁর এবং ওই এয়ারক্র্যাফটের খবর বহুদিন পাওয়া যায়নি। কয়েক মাস পর এয়ারক্র্যাফটটা পাওয়া যায় বিধ্বস্ত অবস্থায় সাইবেরিয়ায়। সবাই সন্দেহ করেছিল কারামোভিচের লাশ ছিন্নভিন্ন হয়ে মিশে গেছে ধুলোর সাথে। না, তিনি নিহত হননি। এর বেশি কিছু জানতে চেয়ো না। আমাদের এয়ারক্র্যাফট সম্পর্কে বলবার বিশেষ কিছু নেই আপাতত আজ রাতেই তোমাকে অনেক কিছু দেখাবার আছে। শুধু আভাস দিয়ে রাখি খানিকটা: কল্পনার অতীত গতিসম্পন্ন এই এয়ারক্র্যাফট। কোন শব্দ প্রায় হয় না বললেই চলে। ভিতরে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি একেবারে নেই। তার মানে এয়ারক্র্যাফটের ভিতর কয়েক টন ওজনের মেশিন থাকলেও তার ওজন থাকবে না।'

'জানি না, সব কথা তোমার সত্যি কিনা,' বলল রানা। 'সত্যি হলে স্বীকার করতে হয় ব্যাপারটা বিরাট কিছু—গোটা ব্যাপারটাই অদ্ভুত। কিন্তু বহু অসুবিধের মুখোমুখি হতে হবে তোমাকে…'

উত্তেজিত হয়ে উঠল কবীর চৌধুরী, 'দেখো, রানা, ইতিমধ্যেই তুমি অর্ধেকটা বিশ্বাস করে ফেলেছ। অসুবিধে অবশ্যই আছে, সেগুলো পরে ভাবব আমরা। সবচেয়ে বড় অসুবিধে,' রানার দিকে ঝুঁকে পড়ল আবার কবীর চৌধুরী, 'কেউ আমাকে বিশ্বাস করবে না। এখানেই তোমার সাহায্য চাই আমি। শোনো। ধরো, ব্রিটেনে অবস্থিত আমেরিকান স্ট্র্যাটেজিক এয়ার কমান্ডের একটি প্লেন উড়ছে আকাশে, হাইড্রোজেন বোমা পেটে নিয়ে—ইচ্ছা করে যদি সেই বোমা ফাটিয়ে দিই আমি, তাহলে কাণ্ডটা কি ঘটবে? উত্তরটা আমাকেই দিতে দাও। বর্তমানে যে অকথিত যুদ্ধ চলছে দুই প্রধান ব্লকের মধ্যে তা থেকে বোঝা যায় অমন একটি কাণ্ড ঘটলেই দুই পরাশক্তি পরস্পরকে সন্দেহ করে যুদ্ধ বাধিয়ে দেবে। আমি চাই না। যুদ্ধকে চিরতরে

বন্ধ করতে চাই আমি—অথচ তাই ঘটে যাবে।

'ব্রিটিশ গভর্নমেন্টকে তোমার এবং মেজর জেনারেল রাহাত খানকে বোঝাতে হবে যে আমি পাগল নই, এবং আমার হুমকি বাজে কথার বান্ডিল নয়।'

হঠাৎ মনে পড়ে গেল রানার, নুরেমবার্গের র‍্যালিতে এডলফ্ হিটলারের বক্তৃতা দেবার দৃশ্যের কথা। একটি নিউজফিল্মে দেখেছিল ও বহুদিন আগে। এখনও মনে পড়লেই দৃশ্যটা জ্বলজ্বল করে ভাসে চোখের সামনে। কবীর চৌধুরীর মতই হিটলার দৃঢ়, উন্মত্ত কণ্ঠে, হাত ছুঁড়ে, চোখ ঘুরিয়ে নিজের কথা বলেছিল।

'তোমার সব কথা শুনব আমি, চৌধুরী,' বলল রানা। 'আর আমি যদি উচিত মনে করি তাহলে তোমার দূত হতে আপত্তি করব না। যদিও আমাকে হতে হবে শয়তানের দূত।'

কবীর চৌধুরী কথা বলল না। প্রায় ছুটে একটা ঘরের ভেতর ঢুকে গেল সে।

আট

'ব্রেকফাস্ট তৈরি, স্যার,' একজন উর্দিপরা বেয়ারা এসে জানাল। 'ঈল কাপো আপনাকে অপেক্ষা করতে মানা করেছেন। মিস সোহানা নিজের রুমে ব্রেকফাস্ট করছেন। ঈল কাপো খানিক পরই আপনার সাথে দেখা করবেন।'

হলরুমে বেয়ারার সাথে যোগ দিল একজন বাটলার। পরিষ্কার বুঝতে পারল রানা লোকটা সশস্ত্র।

দ্বিতীয় কাপ কফি শেষ করার পরপরই কবীর চৌধুরী এল। খানিক আগে খোলা ছাদের কবীর চৌধুরীর সাথে এর কোনও মিল খুঁজে পেল না রানা। প্রকৃতিস্থ হয়ে এসেছে সে। রানার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল কবীর চৌধুরী। সহজ গলায় বলল, 'দুঃখিত, দেরি করে ফেললাম। শুধু এক কাপ কফি পান করব আমি। অপেক্ষা করতে হবে না তোমাকে।'

পাঁচ মিনিটে কাজ শেষ করল সে। 'চলো, দেখা যাক?'

রানাকে সঙ্গে করে হলরুম পেরিয়ে একটা প্যাসেজে এল কবীর চৌধুরী। প্যাসেজটা গিয়ে শেষ হয়েছে বিরাট এক টেনিস খেলার কোর্টের মত প্রশস্ত জায়গায়। আগ্নেয়গিরি জ্বালামুখের অভ্যন্তর ভাগ এই জায়গা। কবীর চৌধুরীকে আর একটা প্যাসেজের শেষ মাথা পর্যন্ত অনুসরণ করল রানা। প্যাসেজের শেষ মাথায় লিফট্টা। কবীর চৌধুরী বোতাম টিপতেই দরজা খুলে গেল। দু'জন সশস্ত্র গার্ড নেমে এল লিফট থেকে। কবীর চৌধুরীকে দেখে মাথা ঝুঁকিয়ে সম্মান দেখাল তারা। তারপর কোন কথা না বলে প্যাসেজ ধরে সোজা চলে গেল। কবীর চৌধুরীর সাথে লিফটে চড়ল রানা।

'আমরা যাচ্ছি আন্ডার গ্রাউন্ড হ্যাঙ্গারে,' কবীর চৌধুরী বলল। 'নিচেরটাই আসলে জ্বালামুখের মেঝে। গ্রাউন্ড লেভেলে যে মেঝে দেখলে সেটা ফল্স্—যুদ্ধের সময় তৈরি করেছিল জার্মানরা। তখন অবশ্যই কাসা বিলাভিসটা এখানে তৈরি হয়নি।'

লিফট থেকে নেমে এল ওরা চওড়া একটা প্যাসেজে। দেয়ালগুলো চুনকাম করা। মেঝেটা খানিক ঢালু হয়ে নিচের দিকে নেমে গেছে।

'স্লাইডিং রুফ্টাও বুঝি জার্মানরা তৈরি করেছিল?' রানা প্রশ্ন করল। বাশারের সংগৃহীত তথ্যটা যাচাই করতে চায় ও।

'ওটার কথাও জানো তুমি?'

হ্যাঁ, না কিছুই বলল না রানা।

'না, হেডকোয়ার্টার হিসেবে এটাকে যখন ব্যবহার করার পরিকল্পনা করি তখন আমিই তৈরি করেছিলাম ওটা। করেছি বহু কিছুই। কাসা বিলাভিসটার প্রধান বিল্ডিঙের উপর, পাহাড়ের গায়ে অনেকগুলো গোপন প্রবেশ পথ ছিল। সিমেন্ট দিয়ে বন্ধ করে দিয়েছি সবগুলো।'

প্যাসেজের শেষ মাথায় এসে দাঁড়িয়েছে ওরা। মোটা স্টীলের দরজা পথ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে। পকেট থেকে চাবি বের করে তালা খুলল কবীর চৌধুরী। প্রকাণ্ড এক গুহার ভিতর ঢুকল ওরা। পাথরের দেয়াল ঘষে ঘষে মসৃণ করে চুনকাম করা হয়েছে। গুহাটার আয়তন অন্তত দুশো গজ, প্রায় গোলাকার। জায়গাটা গোলাপী আলোয় আলোকিত। মেঝে এবং দেয়ালের খানিকটা অংশে আলোর বন্যা, ছাদ এবং দেয়ালের উপরকার অংশ অন্ধকারাচ্ছন্ন।

'আগ্নেয়গিরির আসল মেঝেতে দাঁড়িয়ে রয়েছি এখন আমরা,' বলল কবীর চৌধুরী। 'ওই যে ওটা দেখাতে এনেছি তোমাকে।' আঙুল বাড়িয়ে গুহার মাঝখানটা দেখাল সে।

রানা যত বড় আশা করেছিল এয়ারক্র্যাফটটা তার চেয়ে ছোট। ওর দেখা কোনও এয়ারক্র্যাফটের সাথে বিন্দুমাত্র মিল নেই এটার। ওটার দিকে এগোতে এগোতে কবীর চৌধুরী বলল, 'দু'এক মিনিটে ওটা দেখে ওয়র্কশপে যাব আমরা। কিছু দেখাবার আছে তোমাকে।'

এয়ারক্র্যাফটের গোলাকার বেড় পেরিয়ে রানা মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করল উপরের ও নিচের প্লেট দুটো। উপর নিচের অংশ ঠিক প্লেটের মতই দেখতে। নিচের প্লেটটা ত্রিশ ফিট ডায়ামিটারের হবে। সেটা গোলাকার স্তম্ভমূলে বসানো। স্তম্ভটা তিন ফিটের মত উঁচু, স্টীলের থাম দিয়ে তৈরি করা। একটা গর্তের ভিতর থেকে উঠে এসেছে স্তম্ভটা। কবীর চৌধুরীর পিছন পিছন সিঁড়ির কয়েকটা ধাপ বেয়ে নিচে নামল রানা। আকাশযানটার পেটের কাছে এসে দাঁড়াল ও। এয়ারক্র্যাফটের কোমর ক্রমে সরু হয়ে আবার মোটা হতে হতে উপরের প্লেটের সাথে মিশেছে। হাত দিয়ে স্পর্শ করল রানা এয়ারক্র্যাফটটার গা। মসৃণ। লক্ষ করল আলো পড়ার ফলে গা থেকে প্রতিফলিত হচ্ছে না।

বিপরীত দিকের সিঁড়ি বেয়ে গর্ত থেকে উপরে উঠে এল ওরা। দেয়ালের গায়ে বসানো একটা স্টীলের দরজা খুলে অপেক্ষাকৃত ছোট একটা হলের ভিতর ঢুকল কবীর চৌধুরী। অনুসরণ করে ভিতরে ঢুকে রানা দেখল জায়গাটা ভারী মেশিনে ঠাসা। দু'জন লোক কাজ করছে একটা বেঞ্চে।

'ইমার্জেন্সি কাজের জন্যে এই ওয়র্কশপ। ছোটখাট মেরামত চলে এখানে। তাছাড়া বাকি সবই করা হয় ইটালির নর্থে,' বলল কবীর চৌধুরী।

মেশিনগুলো দেখছিল রানা। কবীর চৌধুরী একজন মেকানিককে ডেকে অনর্গল জার্মান ভাষায় কিছু নির্দেশ দিল। লোকটা তখুনি একজোড়া গ্যাস সিলিন্ডারের ভাল্‌ভ অ্যাডজাস্ট করতে শুরু করল। দ্বিতীয় লোকটি এক টুকরো ধাতব পদার্থ নিয়ে চলে গেল হলের শেষ প্রান্তে। দেয়ালের গায়ে সেটাকে ঝুলিয়ে রেখে ফিরে এল সে। এয়ারক্র্যাফটটার বহিরাবরণ এই ধাতব পদার্থ দিয়ে তৈরি তা লক্ষ্য করতে ভুল হয়নি রানার।

দ্বিতীয় লোকটি আর এক টুকরো ধাতব বস্তু রাখল মেঝের উপর। প্রথম লোকটা গ্যাস সিলিন্ডারের যুক্ত পাইপের মুখটা ওটার কাছাকাছি নিয়ে গিয়ে বোতাম টিপল। নীলচে একটুকরো চোখ ধাঁধানো আলো লাফিয়ে বেরিয়ে এল পাইপের মুখ থেকে।

স্টীল হলে কয়েক সেকেন্ডে গলে যেত ধাতব বস্তুর অংশটি। কিন্তু এটিতে কোন ক্রিয়া করল না। হাসতে হাসতে কবীর চৌধুরী জিনিসটার উপর আঙুল রাখল। আঙুলটা সে আস্তে আস্তে সরিয়ে নিয়ে গেল ঠিক যে জায়গায় নীলচে তীব্র আগুন পড়ছে তার আধ ইঞ্চির মধ্যে। 'তুমি নিজে দেখো,' হাসিমুখেই বলল সে রানাকে।

রানা ধাতব বস্তুটি মেঝে থেকে এক হাতে তুলে নিয়ে যেখানটায় নীল আগুন পড়েছে তার বিপরীত দিকে আঙুল রাখল। এয়ারক্র্যাফটের গায়ে হাত দেবার সময় যা অনুভূত হয়েছিল এখনও তাই হলো। বিন্দুমাত্র উত্তাপ নেই।

'কাজের জিনিস, নয় কি?' কবীর চৌধুরী বলতে শুরু করল বক্তৃতার ভঙ্গিতে, 'এই জিনিস দিয়ে তৈরি আমার আকাশযান। যে কোন হিট সহ্য করবার ক্ষমতা আছে এর। এবার দুটো কথা বলব হাইড্রোজেন বোমা সম্পর্কে। তুমিও জানো যে এই বোমা একটি কনটেনারে রাখা মূল্যবান এবং দুষ্প্রাপ্য বস্তু ছাড়া আর কিছুই না এবং প্রচুর শক্তিসম্পন্ন উত্তাপ নিয়োগ করার পর সেটা ফাটে, আর ফাটলে উৎসারিত হয় ভয়ঙ্কর পরিমাণ এনার্জি গ্যাস, প্রধানত হিলিয়াম। সূর্যে যা প্রতি মুহূর্তে ঘটছে তাই ঘটে, একই পদ্ধতিতে। প্রতিটি হাইড্রোজেন বোমার চাবিকাঠি হচ্ছে ক্ষুদ্র একটি অ্যাটোমিক ডিটোনেটর। প্র্যাকটিসের সময় এই ডিটোনেটর মিসাইল বা বোমায় সংযুক্ত করা হয় না। সব সময়ই বোমা এবং ডিটোনেটর আলাদা আলাদা গুদামে রাখা হয়। এমন কি এয়ারক্র্যাফটে করে নিয়ে যাবার সময়ও বোমার ভেতর ঢোকানো হয় না ডিটোনেটর। ব্যবহার করার পূর্ব মুহূর্তেই শুধু তা করা হয়। আলাদা কম্পার্টমেন্টে থাকে ওগুলো। আমি যা বলতে চাইছি তা হলো প্রতিটি হাইড্রোজেন বোমা ফাটে শুধু মাত্র অ্যাটোমিক ডিটোনেটরের প্রচণ্ড উত্তাপ

পেয়ে। আমার বিজ্ঞানীরা এমন একটি যন্ত্র এবং পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে যা দিয়ে পনেরো মাইল দূরের হাইড্রোজেন বোমা ফাটিয়ে দেবার মত যথেষ্ট পরিমাণ উত্তাপ সৃষ্টি হতে পারে। দুটো প্রশ্নের সমাধানে পৌঁছুতে হবে এবার। কোথায়, ঠিক কোন্ জায়গায় বোমাগুলো আছে তা জানা। ইতিমধ্যেই একটা তালিকা আমরা করে ফেলেছি। দ্বিতীয় প্রশ্নটাও গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের এমন একটি ট্র্যান্সপোর্ট চাই যেটা কোন জায়গায় বোমা ফাটাবার পর পরই দ্রুত সেই জায়গা থেকে দূরে সরে যেতে পারে শক-ওয়েভের হাত থেকে বেঁচে। এয়ারক্র্যাফটটা সমাধান করেছে এই সমস্যা। এটা সম্পূর্ণ হিট-প্রুফ। এবার কি রকম ভাবে বোমা ফাটাতে পারব আমরা তার একটা ক্ষুদ্র নমুনা দেখো—এটা দেখে অনেকটা অনুমান করতে পারবে।' কবীর চৌধুরী সিনেক্যামেরার মত দেখতে একটা বাক্সের মুখ ঘুরিয়ে ধরল দূরের দেয়ালের দিকে। যেদিকে খানিক আগে একজন মেকানিক রেখে এসেছে এক টুকরো ধাতব বস্তু।

মুহূর্তের জন্যে বাক্সের গায়ের একটা বোতাম স্পর্শ করেই ছেড়ে দিল কবীর চৌধুরী। চোখের পলকে রানার চোখের সামনে থেকে বেমালুম অদৃশ্য হয়ে গেল দেয়ালের গায়ে ঝোলানো ধাতব বস্তুটা।

হাসছিল কবীর চৌধুরী, রানা তার দিকে তাকাতে বলল, 'ব্যাপারটা ঘটল এক সেকেন্ডের একশো ভাগের এক ভাগ সময়ের মধ্যে। এয়ারক্র্যাফটের ভিতর প্রকাণ্ড যে মেশিনটি আছে সেটির বোতাম যদি কয়েক সেকেন্ড টিপে রাখি তাহলে উত্তাপ, এমন কি পনেরো মাইল দূর থেকেও, কয়েক হাজার গুণ বেশি হবে। সবসময় আমরা সফল হব, বলছি না। তার দরকারও নেই। ধরো, একটি বোমাও যদি আমার পদ্ধতিতে ফাটিয়ে দিই তাহলে কি হুলস্থূল কাণ্ডই না ঘটে যাবে। কিন্তু আমি তা চাই না। যদি করি তাহলে মানব জাতিকে যে আতঙ্ক থেকে বাঁচাতে আমি বদ্ধপরিকর সে আতঙ্কেই টেনে আনব নির্মম ভাবে। আমি তা চাই না। কিন্তু চাই পৃথিবীর মানুষ, বিশেষ করে দুটি প্রধান পাওয়ার-ব্লক জানুক আমার কথা, আমার ক্ষমতার কথা, আমার হুমকির কথা।'

রানা কি যেন বলতে যাচ্ছিল। কবীর চৌধুরী থামিয়ে দিল ওকে।

'চলো এবার আমার স্টাডিরুমে গিয়ে প্ল্যান-প্রোগ্রাম সম্পর্কে কথা বলি।'

কুড়ি মিনিট ধরে রানার মুখোমুখি বসে নিজের প্ল্যানটা প্রকাশ করল কবীর চৌধুরী। প্রস্তাব দিল রানা লন্ডনে ফিরে গিয়ে সব ঘটনা মেজর জেনারেল রাহাত খানকে খুলে বলুক এবং মেজর জেনারেল রাহাত খান ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ও সেখানে অবস্থিত পৃথিবীর সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ দেশের এমব্যাসিকে পরিস্থিতির গুরুত্ব বোঝাবার চেষ্টা করুক।

রানাকে কোনও কথা বলার সুযোগ না দিয়েই দ্রুত স্টাডি থেকে বেরিয়ে গেল কবীর চৌধুরী তার কথা শেষ করে।

'তুমি রাজি হয়ে গেলে, রানা?'

কথা বলল না রানা। খোলা ছাদে দাঁড়িয়ে দূরে চন্দ্রালোকিত উপত্যকার

দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ও।

'সব দেখে আমি ভয় পেয়েছি,' বলল রানা খানিক পর।

'সব কথা তুমি বসকে বলার পর তিনি ব্রিটেনের প্রাইম মিনিস্টার এবং অন্যান্যদের বোঝাবেন। তাদের কাছ থেকে কি আশা করো তুমি?'

রানা বলল, 'তারা কে কি বলবে জানি না। আমার দায়িত্ব তাদেরকে খবরটা জানানো।'

সোহানা চেয়ার ছেড়ে রানার পাশে এসে দাঁড়াল, 'তাঁরা যদি শয়তানটার প্রস্তাব মেনে নিতে না চান?'

'কবীর চৌধুরী যে-কোন জায়গায় একটি হাইড্রোজেন বোমা ফাটিয়ে দেবে,' রানা এক মুহূর্ত পর আবার বলল, 'আমাকে ওর আর তখন দরকার হবে না। প্রতিশোধ নেবে আমাকে খুন করে। আজীবনের শত্রুকে সে সরিয়ে ফেলবে চিরতরে।'

'আর আমি? আমার কি হবে?'

'তোমাকেও শেষ করবে ও—তবে আমাকে শেষ করার পর।'

'তাহলে উপায়?' ফিসফিস করে জানতে চাইল সোহানা।

জোর করে হাসল রানা, 'উপায় একটা হবেই। চিন্তা কোরো না। আমি যাচ্ছি, ফিরেও আসব। কবীর চৌধুরী চাইলেও আসব, না চাইলেও আসব।'

'কিন্তু তুমি ফিরে আসলেই কি সব সমস্যার সমাধান হবে?'

'সমাধান?' রানা অন্যমনস্ক ভাবে বলল, 'হ্যাঁ, সমাধান একটা হতে তো হবেই। একটা কথা, আমি না ফেরা অবধি কিছু করতে যেয়ো না তুমি। আমার জন্যে অপেক্ষা কোরো।'

সোহানা একটা হাত রাখল রানার কাঁধে, 'ভেবে দেখো, রানা। এই জায়গা দুর্ভেদ্য দুর্গের মত। একবার বেরিয়ে গেলে আবার ঢোকার সুযোগ তুমি নাও পেতে পারো। আমরা দু'জন মিলে এখুনি কিছু একটা করতে পারি না? মোট দুশো সশস্ত্র লোক আছে কবীর চৌধুরীর, ওদের মুখোমুখি হওয়াটা বোকামি। বরং চৌধুরীকে হঠাৎ আক্রমণ করে মেরে ফেললে বারো আনা কাজ শেষ হয়ে যায়। লীডার নিহত হবার পর ওদের মনোবল ভেঙে যাবে। সেই সুযোগে...'

'দুর্বলচেতা লোকদের নিয়ে কাজ করে না কবীর চৌধুরী। তাছাড়া প্রতিটি সেকেন্ডে গোপন টি. ভি-তে আমাদের চলন-বলনের ওপর নজর রাখা হয়েছে। আক্রমণ করার আগেই ধরা পড়ে যাব।' রানা একটু থেমে বলল, 'তাছাড়া এয়ারক্র্যাফটের ভিতর মেশিন বসানো আছে। সে-মেশিনের কলকজা কিছুই জানা নেই আমার। কবীর চৌধুরীর সহকারীদের কেউ না কেউ অবশ্যই জানে। সে যদি ইচ্ছে করে ফেটে যাবে কোথাও না কোথাও হাইড্রোজেন বোমা। না, এতবড় রিস্ক আমি নিতে পারব না, সোহানা। বিশ্ব-যুদ্ধ বেধে যাবে।' ঘড়ি দেখল ও। রাত দশটা বাজতে তিন মিনিট, 'আমার যাবার সময় হয়েছে, সোহানা। যা বললাম মনে রেখো। আমি না ফেরা অবধি অপেক্ষা কোরো। আর বিশ্বাস রেখো—আমি আসবই।'

পাশ থেকে সরে গিয়ে রানার মুখোমুখি দাঁড়াল সোহানা। চাঁদের আলোয় ম্লান দেখাল ওর মুখটা। রানার দুই কাঁধে হাত দিয়ে মুখ তুলে দাঁড়াল ও, 'মরতে আমি ভয় পাই না, রানা। তুমি ফিরে না এলে আমি দুঃখ করব না। এই অ্যাসাইনমেন্টেই তুমি দু'দুবার বাচিয়েছ আমাকে। তুমি মহৎ, রানা। বারবার তুমি বাঁচাবে আমাকে সে-ভাগ্য হয়তো করে আসিনি…' ওর চোখের জমিতে চিকচিক করে উঠল পানি।

রানা দুই হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল সোহানাকে। আস্তে আস্তে মাথা নামিয়ে চুমু খেলো ওর ঠোঁটে। মুখ তুলে নিয়ে তাকাল ও। চোখ বন্ধ করে মুখ তুলে রেখেছে সোহানা। আবার মাথা নুইয়ে চুমু খেলো রানা। অনেকক্ষণ।

'এই শুরু, কিন্তু এই শেষ নয়,' ফিসফিস করে বলল রানা সোহানাকে ছেড়ে দিয়ে, 'আমি ফিরে আসব।'

এক তালে পা ফেলে খোলা ছাদে এসে হাজির হলো দু'জন লোক। কয়েক কদম দূর থেকেই একজন বলল, 'মি. রানা, ঈল কাপো আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন।'

কথা না বলে ঘুরে দাঁড়াল রানা। লোক দু'জনের পিছু পিছু যাবার সময় একবারও পিছন ফিরে তাকাল না ও। সোহানা ওর গমন পথের দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজতে লাগল চাঁদের আলোয়, একা।

রানা দেখল জি-স্যুট, অক্সিজেন মাস্ক, প্যারাস্যুট, টেমপারেচার কন্ট্রোল ইকুইপমেন্ট, কিছুরই দরকার নেই। অথচ জটিল ফ্লাইটে এসবের দরকার হয়। এয়ারক্র্যাফটের ভিতরটায় উজ্জ্বল আলো। ভিতরের আঙটির মত খোলটার মধ্যে একটা গদিমোড়া চেয়ারে অপেক্ষা করছিল কবীর চৌধুরী, তার সামনে পর পর সাজানো চারটে টিভি পর্দা। একটি টিভি সেট চালু। পর্দায় দেখা যাচ্ছে কয়েকজন লোককে। তাদের মধ্যে ফ্যালকনকে দেখা যাচ্ছে। ইটালিয়ান, জার্মান, রাশান, ইংরেজ, চীনা—সব জাতেরই লোক রয়েছে দলটির মধ্যে। কবীর চৌধুরী একটা মাউথপিস মুখের সামনে ধরে নির্দেশ দিচ্ছে তাদেরকে, 'মিস সোহানাকে আগের মতই যত্নে রাখবে তোমরা। ও কোনও গোলমাল করবে বলে মনে হয় না। যদি একান্তই করে তাহলে বিপদ পুষে রাখবার দরকার নেই।' সোহানাকে হত্যা করবার নির্দেশও দিয়ে রাখল কবীর চৌধুরী, 'মেজর মাসুদ রানা লন্ডন থেকে টেলিফোন করে জানাবে তোমাদেরকে কখন সে পৌঁছুবে সিয়ামপেনো এয়ারপোর্টে। একটা গাড়ি পাঠিয়ে দিয়ো ওর জন্যে। আগামীকাল রাত ঠিক এগারোটায় ফিরে আসব আমি। আগামীকাল লাঞ্চ সারব আমি অস্ট্রেলিয়ায়। বিপদসূচক কিছু ঘটতে যাচ্ছে সন্দেহ করলে বারলেটায় টেলিফোন করবে মানাটোফকে। সে যোগাযোগ করবে আমার সাথে। গুড নাইট, মাই বয়েজ।'

রানার দিকে ফিরে হাসল কবীর চৌধুরী, 'তৈরি তুমি?'

রানা মাথা নাড়তে সুইচ-বোর্ডের একটা বোতাম টিপল সে, মুখে বলল, 'প্রিপেয়ারিং টু টেক অফ। জিরো গ্র্যাভিটি।'

মৃদু গুঞ্জন ধ্বনি শোনা গেল ইঞ্জিনের।

'আমাদের নিজস্ব গ্র্যাভিটিতে প্রতিষ্ঠিত হলাম আমরা,' ব্যাখ্যা করল কবীর চৌধুরী, 'এয়ারক্র্যাফট এবং এয়ারক্র্যাফটের ভিতর যা কিছু আছে—সব ওজনহীন এখন। কোনও মুভমেন্ট অনুভব করতে পারছ কি? পারবে না, অথচ এয়ারক্র্যাফটের মাঝখানটা, নিচের এবং উপরের প্লেট দুটো ছাড়া ঘুরতে শুরু করেছে। পৃথিবী যে গতিতে ঘুরছে নিজ মেরুদণ্ডের ওপর সেই গতিতে ঘুরছে এয়ারক্র্যাফটের মাঝখানটা।'

মাথার উপর থেকে স্লাইডিং রুফ সরে গেল ধীরে ধীরে, টিভির পর্দায় দেখতে পেল রানা।

সুইচ-বোর্ডের পাশে পরপর অনেকগুলো হাতল। রানা লক্ষ করল সুইচ-বোর্ডের বোতাম বা হাতলগুলোর নিচে কিছু লেখা নেই। ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে কবীর চৌধুরী বলল, 'লিখিনি কিছু। আমি ছাড়া আর কেউ এই এয়ারক্র্যাফট অপারেট করতে পারবে না। হাতল আর সুইচগুলোর মধ্যেই আছে এয়ারক্র্যাফটের ধ্বংস। নির্দিষ্ট একটা হাতল বা একটা বোতাম টিপলেই গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাবে সব। আনাড়ি কেউ এট্যাকে চালাতে গেলে আর রক্ষা নেই।'

একমুহূর্ত পর কবীর চৌধুরী একটা হাতল ধরে টানল, খটাস্ করে শব্দ হলো একটা। কবীর চৌধুরী জানাল, 'নেগেটিভ গ্র্যাভিটি-ওয়ান।' ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করল সে তারপর, 'গতি বাড়াচ্ছি আমি। নেগেটিভ টেনে পৌঁছে সোজা ওপর দিকে সেকেন্ডে বত্রিশ ফিট উঠতে পারি আমরা। ইচ্ছা করলেই হাজার গুণ বাড়বে এই বেগ।' পর পর কয়েকটা বোতামে চাপ দিল সে, 'নেগেটিভ—টু—থ্রী—ফোর—ফাইভ—সিক্স। চেক।'

এক মুহূর্ত স্পীড মিটারের কাঁটার দিকে তাকিয়ে থেকে কবীর চৌধুরী বলল, 'নেগেটিভ সিক্স সেট।'

মৃদু গুঞ্জন ধ্বনি ছাড়া কোথাও আর কোনও শব্দ নেই। বিন্দুমাত্র বদলায়নি টেম্পারেচার, লক্ষ্য করল রানা। অল্টিমিটারের দিকে তাকাল ও। তীর চিহ্নটা, দু'হাজার নম্বরে গিয়ে ঠেকেছে।

'এখন,' কবীর চৌধুরী বলল, 'মাটি থেকে আমরা পনেরো মাইল উপরে।' বোতাম টিপল সে দুটো। 'ওপরে উঠছি না আর, সোজা এগোচ্ছি। সব কিছুর ওজন এখন মাইনাস টোয়েন্টি পাউন্ডস্। আঠারো টন ওজন ছিল সর্বমোট।'

চারটে টি. ভি. সেটের তিনটিই অন্ করা।

ইউরোপের উপর দিয়ে যাবার সময় কোন ঘটনাই ঘটল না।

'দেখো রানা, প্যারিস।' টিভির একটা পর্দার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল কবীর চৌধুরী, 'সাসেক্স পৌঁছে যাব এখুনি আমরা।' বোতাম টিপে ডায়ালের দিকে চোখ রাখল সে। এয়ারক্র্যাফট নামতে শুরু করল কয়েক মুহূর্ত পরই।

'বীচি হেড-এর একটা পার্কে নামছি আমরা। পার্কের মেন গেট দিয়ে বেরিয়ে যাবে তুমি। ওখানে একটা গাড়ি অপেক্ষা করছে তোমার জন্যে। লন্ডন

পৌঁছে দেবে শোফার তোমাকে।' হঠাৎ গলার স্বর পরিবর্তন করল সে, 'আগামীকাল রাত বারোটার মধ্যে তোমার মুখ থেকে সব শুনতে চাই আমি, রানা। তার আগেই লুসেরায় পৌঁছুতে হবে তোমাকে। আমার প্রস্তাবটা আর একবার শোনো: আমাকে থার্ড ব্লক হিসেবে স্বীকার করে নিলে আগামী মাসের কোন এক তারিখে আমার প্রতিনিধিদের সাথে বৃহৎ রাষ্ট্রবর্গকে বৈঠকে বসতে হবে। মধ্যবর্তী সময়ে আণবিক বোমার পরীক্ষা করা চলবে না— সমুদ্রের নিচে বা মাটির নিচে, কোথাও না। আর যে সব গুদামে নিউক্লিয়ার বোমা আছে তা সরিয়ে অন্যত্র রাখার চেষ্টা করাও চলবে না। চেষ্টা করা হলে আমি তা সাথে সাথে জানতে পারব। সেক্ষেত্রে আমার অস্ত্র ব্যবহার করতে বাধ্য হব আমি। আমি জানি,' কবীর চৌধুরী ক্রূর হাসি হাসল, 'আমার সব শর্তই মেনে নিতে হবে ওদেরকে। তাছাড়া আমাকে ঠেকাবার কোনও উপায় নেই। আমার প্রথম প্রস্তাব স্বীকার করে নিলে প্রতিনিধিদের মাধ্যমে আমি জানাব আমার পরবর্তী কর্মপন্থা।'

'তোমার পরবর্তী কর্মপন্থাটা কি হবে?' রানা শান্ত ভাবে জানতে চাইল।

'সেটা যাই হোক, শেষ পর্যন্ত গোটা দুনিয়াকে আমরা ক্ষমতার ভিতর টেনে আনবই আমি। সেটা ধীরে ধীরে আমি পারব, তুমি বুঝতে পারছ নিশ্চয়ই। আমার হাতে যে কী ভীষণ অস্ত্র আছে তা তো তুমি দেখেইছ। তোমার কি মনে হয়? পারব না আমি এই অস্ত্র দিয়ে পৃথিবী শাসন করতে?'

'জানি না,' মৃদু স্বরে বলল রানা। 'তবে পারা উচিত।'

হা হা করে গলা ছেড়ে হাসল কবীর চৌধুরী। 'তুমি স্বীকার না করে পারবে না, আমি জানতাম। ধন্যবাদ। আমরা নেমে গেছি, রানা।'

কোনও ধাক্কা, কোনও ঝাঁকানি কিছুই টের পায়নি রানা। টিভির পর্দায় দেখা যাচ্ছে পার্কটা। দরজা খুলে দিল কবীর চৌধুরী, 'গুড লাক, রানা। আশা করি ওদেরকে বোঝাতে পারবে তুমি। বুঝতেই তো পারছ ওরা যদি আমার ক্ষমতাকে স্বীকার করে না নেয় তাহলে গোটা মানবজাতিকে ধ্বংস করে দেবার আশঙ্কা সৃষ্টি করব আমি প্রথমে একটি হাইড্রোজেন বোমা ফাটিয়ে দিয়ে। আগামীকাল রাত বারোটার মধ্যে তোমার মুখ থেকে কোনও কথা না পেলে বড়জোর একঘণ্টা অপেক্ষা করব আমি। তারপর ব্যবহার করব চরম অস্ত্র। পৃথিবীর সমস্ত বোমা ফাটিয়ে দেব প্রয়োজন হলে। আশা করি উত্তর নিয়ে তার আগেই পৌঁছে যাবে তুমি। গুড লাক টু ইউ, রানা। ডু ইওর বেস্ট।'

লাফিয়ে ঘাসের উপর নামল রানা। দরজা বন্ধ করে দিল কবীর চৌধুরী ভিতর থেকে। এদিক ওদিক তাকিয়ে মেন গেটটা কোন্ দিকে দেখার চেষ্টা করল রানা। তারপর তাকাল এয়ারক্র্যাফটটার দিকে।

ওটার কোনও চিহ্ন নেই মাটিতে বা আকাশে। অদূরেই একা ভেড়া ব্যা ব্যা করছে। আর কোথাও কোনও শব্দ নেই।

পার্ক থেকে বেরিয়ে এল যেন স্বপ্নাচ্ছন্ন অবস্থায়। বড় একটা অস্টিনের পাশ দিয়ে যাবার সময় গাড়ির দরজাটা খুলে গেল। একজন ইংরেজ শোফার

বেরিয়ে এল ভিতর থেকে, 'মেজর রানা, স্যার?'

দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। তারপর বিনা বাক্যব্যয়ে এগিয়ে গেল গাড়ির দিকে। পিছনের দরজা খুলে ধরল শোফার। গম্ভীর মুখে ভিতরে ঢুকল রানা।

পথে কোনও কথাবার্তা বলল না ও। রাতের অপেক্ষাকৃত নির্জন হাইওয়ে। পঁচাত্তর মাইল বেগে গাড়ি চালিয়ে লন্ডনের পিকাডেলিতে রানাকে নিয়ে পৌঁছে গেল শোফার রাত সাড়ে এগারোটায়। পিছনের দরজা খুলে দিয়ে টুপি ছুঁয়ে সম্মান দেখাল ব্যাটা। রানা ধীরে সুস্থে নামল গাড়ি থেকে।

'আপনার আর কোনও কাজে লাগব আমি, স্যার?'

রানা দুই পকেটে হাত ঢুকিয়ে পা বাড়াতে গিয়েও থমকে গেল। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল শোফারের দিকে, 'ধন্যবাদ। তোমার কাজ শেষ করছ তুমি।' এমব্যাসির গেটের দিকে দৃঢ় পায়ে এগিয়ে যেতে যেতে পিছনে গাড়ি স্টার্ট নেবার শব্দ শুনতে পেল রানা।

গেট খুলে দিয়ে সালাম দিল দারোয়ান। লন পেরিয়ে করিডরে উঠল ও। ডেস্ক-ক্লার্কের দিকে না তাকিয়ে জুতোর শব্দ তুলে রিসেপশন লেখা রুমটার পাশ ঘেঁষে সোজা লিফটের দিকে এগোল রানা। দ্রুত শব্দ শোনা গেল হাইহিলের। রিসেপশনিস্ট যুবতীটি রুম থেকে বেরিয়ে থমকে দাঁড়াল। রানা ঢুকে পড়ল লিফটের ভিতর। ডেস্ক-ক্লার্ক বলে উঠল যুবতীটিকে লক্ষ্য করে, 'মেজর মাসুদ রানা। অন্য কেউ নয়।'

সেকেন্ড ফ্লোরে থার্ড সেক্রেটারির দেখা পেল ও। রানা গম্ভীর গলায় জানতে চাইল, 'বস্ ওপরে আছেন?'

'না। ইটালিয়ান এমব্যাসিতে গেছেন। খবর পাঠাব?'

'এখুনি।' রানা দ্রুত চিন্তা করে বলল, 'আমাকে পৌঁছে দিন ওঁর চেম্বারে। ফোনে আমি কথা বলব ওঁর সাথে।'

'ফোন তুলে আমার গলা শুনেই ধমকে উঠবেন।' থার্ড সেক্রেটারি একটু হাসল, 'ডিস্টার্ব করতে মানা করে গেছেন। আপনার কথা আলাদা···'

ইটালিয়ান এমব্যাসিতে কেন রাহাত খান? প্রশ্নটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে চারতলার সেই নির্দিষ্ট চেম্বারে পৌঁছুল রানা। নাম্বারটা বলে দিয়ে থার্ড সেক্রেটারি বেরিয়ে যেতেই ফোনের রিসিভার তুলে ডায়াল করল রানা।

'হ্যালো,' ইংরেজীতে অ-ইংরেজ একটি মেয়ে অপরপ্রান্ত থেকে বলল, 'এটা ইটালি সরকারের লন্ডনস্থ দূতাবাস।'

'মেজর জেনারেল রাহাত খান আছেন আপনাদের দূতাবাসে। ওঁকে বলুন মাসুদ রানা—এমব্যাসি থেকে বলছি।'

দু'মিনিট চুপচাপ কাটল। তারপর সেই ভরাট গম্ভীর কণ্ঠস্বর, 'কখন ফিরলে, রানা? খবর দিয়ে ফিরতে পারলে না?'

'এখুনি ফিরেছি, স্যার। খবর দেয়া সম্ভব হয়নি। আড়াই ঘণ্টা আগে ইটালিতেই ছিলাম আমি, স্যার।'

'কি বললে?' বিরক্ত কণ্ঠস্বর রাহাত খানের। রানা অনুমান করল ভিতরে ভিতরে চমকে গেছে বুড়ো। পাঁচ ঘণ্টার কমে ইটালি থেকে লন্ডনে ফেরা

আধুনিকতম প্যাসেঞ্জার প্লেনের পক্ষেও অসম্ভব।

'আপনার সাথে জরুরী কথা আছে, স্যার। এখুনি একবার আসতে হয়।'

উত্তর শুনে মনে হলো রানার ডাঁট দেখাচ্ছে বুড়ো। বললেন, 'জরুরী মীটিং চলছে এখানে। ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করো তুমি। তোমার অ্যাসাইনমেন্ট সম্পর্কেই নতুন সব তথ্য পাওয়া গেছে। মীটিংটা শেষ করেই ফিরছি আমি।'

'না, স্যার।' রাহাত খান রিসিভার নামিয়ে রাখার আগেই বলল রানা, 'ওসব মীটিং করে কোন ফল হবে না। আপনি সব শুনলে বুঝতে পারবেন।'

'ওহ!' রাহাত খান থমকে গেলেন কথা শুনে। 'অত্যন্ত বেশি গুরুত্ব দিচ্ছ ব্যাপারটার ওপর।'

'সত্যি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, স্যার। এখুনি চলে আসুন। আমি অপেক্ষা করছি এখানেই।'

কয়েক মুহূর্তের নিস্তব্ধতা, তারপর বললেন মেজর জেনারেল, 'ঠিক আছে। আমি আসছি।' রিসিভার নামিয়ে রাখার শব্দ শুনল রানা।

ঘণ্টাগুলো একে একে কেটে গেল তীব্র ঝড় তুলে। জীবনের সবচেয়ে দীর্ঘ সময় কাটাল রানা বন্ধ চেম্বারে মেজর জেনারেল রাহাত খানের সাথে। ডজন ডজন প্রশ্নের উত্তর আর সেগুলোর ব্যাখ্যা দিতে হলো ওকে। রাত দুটোর সময় এমব্যাসি থেকে বেরিয়ে সোজা নিকটস্থ বারে গিয়ে বসল রানা। মেজর জেনারেল রাহাত খান অত রাতে এমব্যাসি থেকে বেরিয়ে নিজে গাড়ি চালিয়ে ব্রিটেনের পররাষ্ট্র দফতরের প্রধান অফিসে গিয়ে হাজির হলেন। সেখানে ফোন পেয়ে আগেই জমায়েত হয়েছে ইটালি, যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট রাশিয়া ও ফ্রান্সের অ্যামবাসাডররা। আরও আছেন ব্রিটেনের পররাষ্ট্র সেক্রেটারি ও প্রধান মন্ত্রী।

রুদ্ধদ্বার কক্ষে ওদের বৈঠক চলল ভোর সাড়ে পাঁচটা অবধি।

বারে বসে রানা কল্পনা করার চেষ্টা করল রাহাত খান বৃহৎ শক্তিবর্গের প্রতিনিধিদের কতটা বোঝাতে সক্ষম হবেন। ও লন্ডনে পৌঁছুবার আগেই ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস মানাটোফ সম্পর্কে অনেক তথ্য সংগ্রহ করে ফেলেছিল ইটালিয়ান দূতাবাসের সহযোগিতায়। ইটালি সরকার বহুদিন ধরেই মানাটোফের উপর তীক্ষ্ণ নজর রেখেছে। ও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীদের সাথে প্রায় দেখা-সাক্ষাৎ করত এই তথ্য পেয়ে ইন্টারপোলের এজেন্টরা বাছা বাছা ক'জন লন্ডননিবাসী বিজ্ঞানীদের জিজ্ঞাসাবাদ করে। তাঁদের মধ্যে দু'জন স্বীকার করেছে যে মানাটোফ মোটা টাকা দিয়ে তাদের কাছ থেকে সহযোগিতা কিনেছে। বিজ্ঞানী দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তারা যে ধরনের তথ্য ও ফর্মূলা বিক্রি করেছে মানাটোফের কাছে তা দেশের নিরাপত্তার জন্যে বিপজ্জনক। তারপরই লন্ডনস্থ ইটালিয়ান দূতাবাসে ফরেন অফিসারদের এক বৈঠক ডাকা হয়। রানা যখন লন্ডন পৌঁছেছে মেজর জেনারেল রাহাত খান তখন সেই বৈঠকে যোগ দিতে গিয়েছিলেন।

বার থেকে বেরিয়ে রাত সাড়ে তিনটেয় এমব্যাসিতে ফিরে এল রানা।

থার্ড সেক্রেটারি অপেক্ষা করছিলেন ওর জন্যে, 'আপনার জন্যে রুম তৈরি, মি. রানা। বিশ্রাম নিন আপাতত। মেজর জেনারেল ফিরে আপনাকে কল করলে খবর দেব আমি।'

কথা না বলে ওর জন্যে নির্দিষ্ট ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল রানা। পোশাক ছেড়ে নরম গদিওয়ালা বিছানায় শুয়ে পড়ল ও।

ঘুম এসে দুই চোখ দখল করে নেবার আগে ওর মানসপট থেকে সোহানার চন্দ্রালোকিত মুখটা আবছা হয়ে মিলিয়ে গেল ধীরে ধীরে।

সাড়ে পাঁচটার সময় থার্ড সেক্রেটারি ঠক্ ঠক্ করে দরজায় টোকা মারতেই রানা চোখ মেলে তাকাল। 'কাম ইন।'

দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকলেন থার্ড সেক্রেটারি, 'মেজর জেনারেল আশা করছেন আপনাকে আধঘণ্টার মধ্যে। বাথরুমে সব তৈরি আপনার, ফিরলেই ব্রেকফাস্ট দিয়ে যাবে বেয়ারা।'

'ধন্যবাদ।' রানা মুচকি হাসল, 'বুড়োর মেজাজ কেমন মনে হলো দেখে?'

'ধোঁয়া বেরুচ্ছে না, কিন্তু পাইপ টানছেন ঘনঘন চেম্বারে বসে, দেখে এলাম।' থার্ড সেক্রেটারি চিন্তান্বিত।

'সেরেছে তাহলে।' বিছানায় উঠে বসল রানা। থার্ড সেক্রেটারি বেরিয়ে গেলেন।

বাথরুম থেকে শাওয়ার সেরে বেডরুমে ফিরে এসে ব্রেকফাস্ট সারল রানা ধীরেসুস্থে। একটা সিগারেট ধরিয়ে ঘড়ির দিকে তাকাল ও। তিন মিনিট বাকি আধঘণ্টার। কি বলবে বুড়ো? 'রানা, ওরা কেউ রাজি হয়নি কবীর চৌধুরীর প্রস্তাবে, এখন কি করতে চাও তুমি?' এ কথার উত্তরে কি বলবে ও?

সিগারেট শেষ করে রুম থেকে আস্তে আস্তে বেরিয়ে এল রানা। রাহাত খানের চেম্বারের দরজার সামনে নিঃশব্দে এসে দাঁড়াল ও। পনেরো সেকেন্ড নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থেকে মনটাকে সবরকম পরিস্থিতির জন্যে তৈরি করে নিল। তারপর দরজা ঠেলে ঢুকল ভিতরে।

রাহাত খান পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে জানালা পথে তাকিয়ে আছেন বাইরের রাস্তার দিকে। মাথার উপর ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে, দাঁতে চাপা জ্বলন্ত পাইপ।

'বোসো, রানা,' একই ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থেকে ভারী গলায় বললেন রাহাত খান।

রানা নিঃশব্দে বসে পড়ল একটা চেয়ারে।

নিস্তব্ধতা ভাঙল না কিছুক্ষণ।

তারপর ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়ালেন রাহাত খান। রানার দিকে তাকালেন। দুই চোখ যেন অন্তস্তল পর্যন্ত দেখে নিচ্ছে রানার। ধীরে ধীরে ডেস্কের ওধারে নিজের চেয়ারটায় বসলেন। 'ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী তোমার সাথে কথা বলবেন, রানা,' বললেন তিনি। 'সময়টা এখনও ঠিক হয়নি। তিনি বিদেশী প্রতিনিধিদের সাথে আবার মিলিত হচ্ছেন আধঘণ্টার মধ্যে। আমিও থাকব। কিন্তু ফাইন্যাল কথা তোমার সাথেই বলবেন। তুমি তৈরি থেকো।'

দ্রুত চিন্তা করছিল রানা। চীফ অসন্তুষ্ট বোধ করছেন, বুঝতে বাকি রইল না ওর। আলোচনায় নিরাশ হয়েছে বুড়ো—তারমানে ওরা কি কেউ কবীর চৌধুরীর প্রস্তাব স্বীকার করতে সম্মত হয়নি? নাকি ওরা স্বীকার করে নেবার পক্ষে কথা বলেছে বলেই অসন্তুষ্ট হয়েছেন বস্ ?

'ওদের সাথে আলোচনার ফল কি হলো, স্যার?' ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করল রানা।

ওর দিকে তাকালেন রাহাত খান, থমথমে হয়ে উঠেছে মুখের চেহারা, 'আলোচনা এখনও চলছে। সময়মত সব জানতে পারবে তুমি। এমব্যাসি ছেড়ে কোথাও যেয়ো না। যখন-তখন দরকার হতে পারে তোমাকে। যাও, বিশ্রাম নাও গে।'

বোকার মত চেম্বার থেকে বেরিয়ে এসে মনে মনে খেপে উঠল রানা। বুড়োর ভীমরতি ধরেছে। ওই কটা ফালতু কথা শোনাবার জন্যে ঘুম না ভাঙালেই কি চলত না।

নিজের ঘরে ফিরে এসে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে সিগারেট ধরাবার পর গরম মেজাজটা ঠাণ্ডা হলো রানার। হঠাৎ খেয়াল হলো অপ্রয়োজনীয় কথা বলবার জন্যে তো বুড়ো নিজের কাছে ডাকে না কখনও ওকে। আজ কেন ডাকল? বেশিক্ষণ গবেষণা করতে হলো না ওকে। চীফের আসল উদ্দেশ্যটা ধরে ফেলল ও। সারারাত মীটিং করে ফল যা হয়েছে তার আভাস দেবার জন্যই ডেকেছিলেন রানাকে। ব্রিটেনের প্রাইম মিনিস্টার ফাইন্যাল আলোচনা রানার সাথে করবেন এর মানে কি? কি বলবেন তা মেজর জেনারেল রাহাত খান জানেন না তা হতেই পারে না। অথচ খুলে বলল না বুড়ো। তার মানে প্রধানমন্ত্রী উৎসাহ দেবেন না রানাকে, দুঃখ প্রকাশ করবেন। কিসের জন্যে দুঃখ প্রকাশ?

পরিষ্কার ধরে ফেলল রানা ব্যাপারটা। কবীর চৌধুরীর প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়নি। হয়তো কবীর চৌধুরীকে ফাঁদে ফেলার কোনও পরিকল্পনা ফেঁদেছে ওরা সবাই মিলে। ফাঁদটা কি হতে পারে?

মন্টি সোরানো আগ্নেয়গিরিটা উড়িয়ে দেবার পরিকল্পনা করেছে কি? প্লেন দিয়ে বোমা ফেলবে, মর্টার দিয়ে গোলা ছুঁড়বে আর ডিনামাইট ফিট করে উড়িয়ে দেবে কাসা বিলাভিসটা?

হঠাৎ ঠাণ্ডা একটা শিরশিরে অনুভূতি ওর পিঠ বেয়ে উঠতে শুরু করল। দুঃখ প্রকাশ করবেন প্রধানমন্ত্রী। সোহানার জন্যে।

নয়

লাঞ্চের আগে থার্ড সেক্রেটারি খবর দিলেন মেজর জেনারেল রাহাত খান সকাল আটটায় বেরিয়ে গেছেন, ফেরেননি এখনও। অবাক হলো রানা। এত

দেরি হচ্ছে কেন ওকে ডাকতে?

বাইরে লাঞ্চ সারার ইচ্ছা থাকলেও বেরুতে পারল না রানা। সময় পেরিয়ে যাচ্ছে, ভিতর ভিতর অস্থির হয়ে পড়ছে ও। শেষ পর্যন্ত কি শুনতে হবে কে জানে।

থার্ড সেক্রেটারি মাঝে-মধ্যেই খবর নিচ্ছেন লোক পাঠিয়ে ওর কোনও অসুবিধা হচ্ছে কিনা। বেয়ারা লাঞ্চ দিয়ে যাবার পর দেরি করল না খেয়ে নিতে। এমন অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করার কথা ভাবতে পারেনি ও। ভাল করে খেতে পারল না রানা। বেশির ভাগ খাবারই পড়ে রইল প্লেটে।

নির্জন মনে হচ্ছে বাড়িটাকে। যে-যার অফিস রুমে নিঃশব্দে কাজ করছে। গল্প করার জন্যে লাঞ্চের পর এসেছিলেন থার্ড সেক্রেটারি। রানার সম্পর্কে অসম্ভব কৌতূহল ভদ্রলোকের। কিন্তু ওর গম্ভীর হাবভাব দেখে উঠে গেছেন দশমিনিট পরই।

কফি নিয়ে এল বেয়ারা। কফির পেয়ালা শেষ করতে করতেই তিনবার হাতঘড়ির দিকে তাকাল রানা। বুড়ো কি হার্টফেল করেছে মীটিঙে বসে?

দ্বিতীয় কাপ কফি শেষ করল রানা বিকেল চারটেয়। কাপটা তেপয়ের উপর নামিয়ে রাখার সাথে সাথে নক হলো দরজায়।

অনুমতি পেয়ে থার্ড সেক্রেটারি ঢুকলেন রুমের ভিতর, 'মেজর জেনারেল অপেক্ষা করছেন ডাউনিং স্ট্রীটে আপনার জন্যে। গাড়ি তৈরি নিচে। আপনি...'

কথা শেষ হবার আগেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দ্রুতপায়ে রুম থেকে বেরিয়ে এল রানা। পিছন পিছন থার্ড সেক্রেটারি ওকে অনুসরণ করে এলেন, 'গেটে থাকবে প্রধানমন্ত্রীর চীফ অভ বডিগার্ড। পাস দেখালেই ভিতরে নিয়ে যাবে সে।'

নিচে নেমে গাড়িতে ওঠার আগে থার্ড সেক্রেটারির হাত থেকে ভিজিটিং পাসটা নিল রানা। 'ধন্যবাদ,' বলল ও।

গাড়ি ছেড়ে দিল শোফার।

দশ নম্বর বাড়িটার মেন গেটে রাতদিন গুটিকয় সাংবাদিক জটলা পাকায়। ওদের চোখকে ফাঁকি দেয়া সম্ভব নয় কারও পক্ষে। তাছাড়া গেট সংলগ্ন গার্ডরুমে ঢুকতে দেখেছে ওরা প্রধানমন্ত্রীর চীফ অভ বডিগার্ডকে।

রানা গাড়ি থেমে নামতেই হাঁটু মুড়ে পজিশন নিয়ে ফটো তুলে নিল জনাকয়েক ফটোগ্রাফার। এগিয়ে এল দ্রুত পায়ে চার-পাঁচজন নোট বুক আর বল পেন্সিল হাতে নিয়ে।

ওদেরকে পাত্তা না দিয়ে দৃঢ় পদক্ষেপে খোলা গেটের দিকে এগোল রানা। গার্ড-রুম থেকে বেরিয়ে এল দীর্ঘকায় এক ভদ্রলোক। হাত বাড়িয়ে দিয়ে সহাস্যে বলল, 'আপনার সাথে মিলিত হয়ে আনন্দবোধ করছি, স্যার। দয়া করে আমার সাথে আসুন। প্রধানমন্ত্রী আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন।'

পকেট থেকে ভিজিটিং পাসটা বের করে চীফ অভ বডিগার্ডের হাতে দিয়ে পাশাপাশি হাঁটতে শুরু করল রানা। একপলক পাসটা দেখে নিয়ে চলার গতি বাড়িয়ে দিল চীফ অভ বডিগার্ড।

করিডর, রিসেপশন রুপ, হলরুম পেরিয়ে এলিভেটরে চড়ল ওরা। তারপর আবার রিসেপশন রুম, আবার হলরুম, তারপর আবার করিডর। কোথাও কেউ বাধা দিল না ওদেরকে। সোজা প্রধানমন্ত্রীর অফিস রুমের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল ওরা। দরজার দুই দিকে দুই পুলিস প্রহরী পাথরের মূর্তির মত নিঃসাড় দাঁড়িয়ে আছে। চোখের পাতা পর্যন্ত পড়ে না যেন ওদের। নক করার পর একটি যুবতী দরজা খুলে ধরল। এটা ইনটিরিওর রিসেপশন রুম। ঘরের ভিতর ঢুকে এগিয়ে গেল ওরা ভারী পর্দা ঝোলানো একটা দরজার দিকে। কোন অনুমতি ছাড়াই চীফ অভ বডিগার্ড ঢুকল ভেতরে। নিয়ম অনুযায়ী অপেক্ষা করে রইল রানা। দশ সেকেন্ড পর ভিতর থেকে চীফ অভ বডিগার্ডের গলা ভেসে এল, 'প্লীজ, কাম ইন, স্যার।'

ভিতরে ঢুকে রানা চোখ ঘুরিয়ে দেখে নিল সবাইকে। পৃথিবীর সবাই উপস্থিত এখানে, মনে হলো ওর। বড় বড় রাষ্ট্রের প্রতিনিধি, ব্রিটেনের পররাষ্ট্র বিভাগের সেক্রেটারি ও উর্ধ্বপদস্থ অফিসাররা, প্রধানমন্ত্রী ও মেজর জেনারেল রাহাত খান—এক ঘর লোক। রীতিমত গোলটেবিল বৈঠক। রাহাত খান পাইপ টানছেন একমনে। যেন কোন কিছুই জানেন না তিনি। প্রধানমন্ত্রীর মুখোমুখি বসেছেন তিনি। পাশের চেয়ারটা খালি।

রানার আপাদমস্তক দেখে নিল সবাই একযোগে ঘাড় ফিরিয়ে। একটি ঘাড় বড় সোজা, সেটি নড়ল না এতটুকু।

রানার পরিচয় জানিয়ে দিলেন প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং। তারপর বসার অনুরোধ করলেন তিনি। চেয়ার থেকে উঠে রানার সাথে করদর্মন করলেন তিনি একা। নিঃশব্দে রাহাত খানের পাশের খালি চেয়ারটায় বসল রানা।

দেয়ালের গায়ে গা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকজন কর্মচারী। প্রধানমন্ত্রীর পার্সোন্যাল সেক্রেটারি তাদের একজনকে ইঙ্গিত করতে একটা টেপ রেকর্ডারের বোতাম টিপে দিয়ে সেটাকে টেবিলের উপর রেখে লোকটা আবার দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়াল।

টেপ-রেকর্ডার যখন আবিষ্কার হয়নি তখন প্রধানমন্ত্রীর মত লোকেরা কিভাবে কাজ সারত? মনে মনে ভাবল রানা।

প্রথম প্রশ্নের উত্তরে রানা পরিষ্কার ভাবে বলে গেল আগাগোড়া সম্পূর্ণ ঘটনাটা, প্রধানমন্ত্রীর দিকে সরাসরি চোখ রেখে। কবীর চৌধুরীর ক্ষমতা কতটুকু তা নিখুঁত ভাবে বর্ণনা করল ও। উপসংহারে বলল, 'আমার চোখে, স্যার,' ওর চোখের পাতা পর্যন্ত নড়ল না বলার সময়, 'কবীর চৌধুরীর প্ল্যান সমস্ত পৃথিবীটা নিজের হাতের মুঠোয় আনা ছাড়া আর কিছুই নয়। এবং সে-ক্ষমতা তার আছে।'

'মানুষকে আতঙ্ক থেকে নিষ্কৃতি দেবার ইচ্ছেটা তার নীতির দিক থেকে গ্রহণযোগ্য, কিন্তু পদ্ধতির দিক থেকে ভুল। হুমকি দিয়ে ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে কিছুই সে আদায় করতে পারবে না,' ধীরে ধীরে বললেন প্রধানমন্ত্রী। 'আপনার এবং গিয়াকোমার কথা অনুযায়ী সে পৃথিবীকে হাতের মুঠোয় আনতে চায়, আমরা বিভিন্ন উপায়ে যে খবরের আভাস পেয়েছি তাতেও তাই

প্রমাণ হয়। কিন্তু হুমকি তার খাটবে না কোনও ভাবেই। তাকে চরম শিক্ষা দেয়া ছাড়া দ্বিতীয় কোনও পথ নেই। ইতিমধ্যেই সব ব্যবস্থা করে ফেলা হয়েছে। রাত একটায় সে তার হুমকি কার্যকরী করবে। রাত এগারোটায় সে কোর্টিনা থেকে এয়ারক্র্যাফটটা নিয়ে মন্টি সোরানোতে ফিরবে। ঠিক রাত এগারোটা পাঁচ মিনিটে শুরু হবে আমাদের অপারেশন। পাঁচটা বেস থেকে এক সাথে বম্বার্ডমেন্ট করা হবে মন্টি সোরানোয়। দশ মাইল দূর থেকে হেভি মর্টার ও মিসাইল ছুঁড়ে উড়িয়ে দেয়া হবে কাসা বিলাভিসটা। ডিনামাইট ফিট করার ব্যবস্থাও বাদ যায়নি। মন্টি সোরানোর আশপাশ থেকে গোপনে লোকজন সরানো শুরু হয়ে গেছে ইতিমধ্যেই।' রানার নিষ্পলক চোখের দিকে তাকিয়ে খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন প্রধানমন্ত্রী, তারপর সম্পূর্ণ ভিন্ন কণ্ঠে কথা বললেন, সহানুভূতি আর বেদনা তাঁর কথায়, 'আমি জানি আপনার এক সহকর্মিনী কাসা বিলাভিসটায় বন্দী হয়ে আছে। এবং এ-ও শুনেছি তার ব্যাপারে আপনি কতটা সেন্টিমেন্টাল···মানে, কন্‌সার্নড। আমাদের পরিকল্পনার সবচেয়ে বড় ক্রটি হচ্ছে মিস সোহানার মৃত্যু। জীবনে যতগুলো বেদনাদায়ক, মর্মান্তিক সিদ্ধান্ত আমি নিয়েছি এটি তার মধ্যে অন্যতম। রিপোর্ট অনুযায়ী কবীর চৌধুরী পৃথিবীর মানুষকে ধ্বংস করার পদক্ষেপ নেবে রাত একটায়। মিস সোহানার জন্যে আমরা সবাই আঘাত পাব। কিন্তু তাকে উদ্ধার করার কোনও উপায় নেই আমাদের সামনে। মানুষের বৃহত্তর কল্যাণের দিকে চেয়ে এই ত্যাগকে স্বীকার করে নিতে বাধ্য হচ্ছি আমরা। আমাদের সিদ্ধান্ত···'

শেষ দিকে প্রধানমন্ত্রীর একটি কথাও কানে ঢুকছিল না রানার। ওর মনে হলো সটান দাঁড়িয়ে আছে ও। আশপাশের সবাই কড়া পাহারা দিচ্ছে ওকে। ও বন্দী। কোর্টের সেশন চলছে যেন। জজ ঘোষণা করছে। শাস্তি দেয়া হচ্ছে ওকে। না ওকে না, সোহানাকে। মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করা হয়ে গেল।

রানা তাকাল প্রধানমন্ত্রীর দিকে, 'ভেরী গুড, স্যার। ইফ দ্যাট ইজ ইওর ডিসিশন।' কারও অনুমতির অপেক্ষা না করেই ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল ও তারপর। ধীর পায়ে ওর পাশে এসে দাঁড়ালেন প্রধানমন্ত্রী। 'আপনার মানসিক অবস্থাটা অনুভব করতে পারছি আমরা,' রানার কাঁধে হাত রেখে নিচু গলায় বললেন তিনি। 'আপনার মুখ চেয়ে বসে আছে সোহানা। কিন্তু এছাড়া আমাদের করার কিছুই নেই। একটা চরম যুদ্ধ বাধতে দিতে আপনিও রাজি নন, নিশ্চয়। অথচ মিস সোহানাকে উদ্ধার করার চেষ্টা করতে গিয়ে দেরি হয়ে গেলে ঠিক তাই ঘটবে। আশা করি আমাদেরকে ভুল বুঝবেন না আপনি, মি. রানা।'

ওর মুখ দিয়ে একটি শব্দই মাত্র বের হলো, 'অভকোর্স নট, স্যার।'

বেরিয়ে এল রানা প্রধানমন্ত্রীর মন্ত্রণালয় থেকে। কারও অপেক্ষা করল না ও। সোজা হেঁটে গেট দিয়ে বেরিয়ে গাড়িতে চেপে বসল। গাড়ি ছেড়ে দিল শোফার। রানা সিগারেট বের করে ধরাল একটা। দাঁতে দাঁত চেপে অস্ফুট স্বরে গাল দিল ও, 'কুত্তার বাচ্চা!'

'কিছু বললেন, স্যার?' ইংরেজ শোফার প্রশ্ন করল।
'হ্যাঁ। সন অভ এ বীচ,' চিবিয়ে চিবিয়ে উচ্চারণ করল রানা।
'কি বললেন, স্যার?' শোফার হতচকিত।
'ওহ্। আমার এক শত্রুকে বললাম। ডোন্ট মাইন্ড।'
এমব্যাসিতে ফিরে নিজের রুমে গিয়ে বসল রানা। চারটে বিশ বাজছে ঘড়িতে।
পাঁচ মিনিট পরই ওর ডাক পড়ল মেজর জেনারেলের চেম্বারে। ফিরে এসেছে বুড়ো। যাবার আগে অকারণেই শার্টের আস্তিন গুটিয়ে নেবার একটা ইচ্ছা হলো রানার। কিন্তু সময়ের অপব্যয় না করে সোজা চেম্বারে গিয়ে ঢুকল ও।
'বসো, রানা।'
রানা বসল। রাহাত খান পাইপে টোবাকো ভরছেন ধীরেসুস্থে। সারা গা জ্বালা করে উঠল ওর।
'এবার, স্যার?' মরিয়া ভাবটা কোনও রকমে চেপে প্রশ্ন করল রানা। মুখ তুলে তাকালেন রাহাত খান। কয়েক মুহূর্ত দেখলেন রানাকে।
'কিছু বলবার আছে তোমার, রানা?' শান্ত গলায় জানতে চাইলেন রাহাত খান।
বলবার নেই, করবার আছে, মনে মনে বলল রানা। এক ঘুসিতে তোমার মুণ্ডু ঘুরিয়ে দেবার···
মুখে বলল, 'ওদের কথাই শেষ কথা, স্যার?'
উত্তর দেবার আগে ধীরেসুস্থে পাইপে অগ্নিসংযোগ করলেন রাহাত খান। 'কথা তো একটাই। কিছু টের পাবার আগেই ধ্বংস করে ফেলতে হবে কবীর চৌধুরীকে। এরপর আর কথা কি?'
পাগল হয়ে গেছ তুমি, রানা বলল নিঃশব্দে। সোহানার কথা, যাকে তুমি জান দিয়ে ভালবাস তার কথা বেমালুম ভুলে যাবার ভান করছ। কপালের সেই শিরাটা ধক ধক করে লাফাচ্ছে কেন তোমার? ভেবেছ কিছুই টের পাচ্ছে না মাসুদ রানা?
'সোহানার কি হবে? ও মরবে জেনেও চুপ করে বসে থাকব আমরা?'
'তাছাড়া উপায় কি?' রানার দিকে চোখ তুললেন রাহাত খান, 'ওকে উদ্ধার করতে যাওয়ার কোনও প্রশ্ন ওঠে না। কাউকে পাঠাবার কোনও ইচ্ছা নেই আমার। একজনকে হারাতে হচ্ছে, এই যথেষ্ট, দু'জনকে হারাতে চাই না আমি।'
চুপ করে রইলেন মেজর জেনারেল দু'মিনিট। নিজের অজান্তেই মাথা নাড়লেন একবার ভুরু কুঁচকে। অন্য দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ওদের সিদ্ধান্তের সাথে আমি একমত, রানা। তোমার কাজ শেষ হয়ে গেছে। তোমাকে আর দরকার হবে না ইউরোপে। রাত আটটায় একটা প্লেন আছে, করাচি যাচ্ছে। থার্ড সেক্রেটারি সব ব্যবস্থা করে রাখবে। তুমি সেই প্লেনে ফিরে যাচ্ছ। এটা অফিশিয়াল অর্ডার। এবার তুমি যেতে পারো।'

পাগলের সাথে কথা বলে লাভ নেই, মনে মনে বলে উঠে দাঁড়াল রানা চেয়ার ছেড়ে।

চুলে আঙুল চালাচ্ছেন একহাতে রাহাত খান, অন্য হাতের দুই আঙুলে পাইপটা ধরা, পা দুটোর বিশ্রাম নেই গত দশ-পনেরো মিনিট ধরে। ঘরের মধ্যে অবিরাম পায়চারি করছেন তিনি। অস্থির একটা ভাব ফুটে বেরুচ্ছে মুখের চেহারা থেকে। মাঝেমধ্যে ফোনটার দিকে কড়া চোখে তাকাচ্ছেন। মাঝেমধ্যে ঘড়ি দেখছেন হাত তুলে। কুঁচকে আছে কাঁচা পাকা ভ্রূজোড়া।

রানা ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার দশ মিনিট পর এই খানিক আগে থার্ড সেক্রেটারি রিপোর্ট করে গেছে। দুটো পিস্তল চুরি গেছে তার টেবিলের দেরাজ থেকে। রানাকেও পাওয়া যায়নি এমব্যাসির কোথাও। অথচ কেউ বেরিয়ে যেতে দেখেনি ওকে। থার্ড সেক্রেটারির সন্দেহ ও জানালা গলে নেমে গেছে নিচে।

ঠিক পনেরো মিনিট পর রিং হলো ফোনের। থমকে দাঁড়িয়ে তাকালেন রাহাত খান ফোনের দিকে। তারপর ধীর পায়ে এগিয়ে গেলেন। ধীরে ধীরে রিসিভারটা তুলে নিলেন তিনি। 'ইয়েস?'

'ডবল ফোর নাইন বলছি, স্যার।' লন্ডনস্থ বি. সি. আই-এর এজেন্ট বলছে অপরপ্রান্ত থেকে, 'রানাকে পেয়েছি, স্যার। কিন্তু ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে গেছে সে। বাজার থেকে ছোট সাইজের কুড়াল, হাতুড়ি, ছেনি এইসব কিনে একটা ব্যাগে ভরে সোজা এয়ারপোর্টে এসেছিল খানিক আগে। রানওয়েতে ঢোকার চেষ্টা করলে গার্ডরা বাধা দেয় ওকে। দু'জনকে আহত করে ভিতরে ঢুকে পড়েছে একটু আগে। একটা জেট পাঁচ মিনিট আগে ল্যান্ড করেছিল। সেটায় গিয়ে উঠেছে জবরদস্তি করে। জেটটা রানাকে নিয়ে এইমাত্র উড়েছে আকাশে। স্যার, আমার কোনও সন্দেহ নেই যে মাসুদ রানা হাইজ্যাক করেছে প্লেনটা। এখন আমি...'

'ফিরে এসো,' চাপা স্বরে কথাটা বলে রিসিভার নামিয়ে রাখলেন রাহাত খান। রানা তাঁর সব নির্দেশ অমান্য করে ছুটে চলেছে ইটালির দিকে।

নিজের চেয়ারে বসে একমনে খানিকক্ষণ চিন্তা করলেন রাহাত খান। নিভে যাওয়া পাইপের দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে এক টুকরো হাসি ফুটে উঠল তাঁর ঠোঁটে।

'অসম্ভব, মিস্টার,' জার্মান পাইলট ঘোর আপত্তি জানাল। 'চাঁদের আলোয় পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না কিছু। প্লেন কোথায় নামছে তা না জেনে—ধরুন, যদি একটা গর্ত থাকে রানওয়েতে? সবাই মরব আমরা—আপনিও বাঁচবেন না।'

রানা হাতের পিস্তলটা নেড়ে বিরক্তির সাথে বলল, 'বেশি বকবক করেন আপনি। যা বলছি তাই শুনুন। এখানেই নামাতে হবে প্লেন। প্লেন ক্র্যাশ হয়ে মরার ভয় পাচ্ছেন, কিন্তু আমার কথা না শুনলে সে সুযোগও পাবেন না। নিন, তাড়াতাড়ি করুন।'

কো-পাইলটের দিকে ফিরে অনিচ্ছাসত্ত্বেও পাইলট বলল, 'রেডি হও, বুঝলে? উন্মাদের পাল্লায় পড়া গেছে।'

কোনও দুর্ঘটনাই ঘটল না। নির্বিঘ্নে নামল জেট ফোগিয়া এয়ারপোর্টে। মাইলখানেক ছোটার পর দাঁড়িয়ে পড়ল প্লেনটা। ককপিটের দরজা খুলে লাফ মারল রানা। হাতের পিস্তলটা হাত থেকে পকেটে ভরেনি ও। অন্যহাতের ব্যাগটা লাফ দেবার আগে ফেলে দিয়েছে রানওয়েতে।

নিচে নেমে রানা বলল, 'দরজা বন্ধ করে দিন। পাঁচ মিনিট পর ওড়বার চেষ্টা করবেন আবার। ধন্যবাদ।' ব্যাগটা তুলে কাঁধে ঝুলিয়ে নিল রানা। তারপর চাঁদের আলোয় পথ দেখতে দেখতে দ্রুত হাঁটতে শুরু করল গেটের দিকে। ঘড়ি দেখে নিয়ে চলার গতি আরও বাড়িয়ে দিল ও। রাত ন'টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট।

সান নিকানডো রোড ধরে এক মিনিট হাঁটলেই মন্টি সোরানোর গা। কিন্তু কাঁটাতারের বেড়া পেরিয়ে পাহাড়ে উঠে আগ্নেয়গিরির দুই জ্বালামুখের মাঝখানে যাবার পরিকল্পনা করে লাভ হবে না কোনও। রানা ঠিক করল পাহাড়টা ডানদিকে রেখে সান নিকানডো রোডে না থেমে সোজা খানিকদূর গিয়ে সরু একটা পথ দিয়ে অ্যাপ্রিসিনা দিয়ে সান মার্কোয় যাবার রাস্তাটায় পৌঁছুতে হবে ওকে। ও রাস্তার পাশেই পাহাড় উঠে গেছে একেবারে খাড়া হয়ে। খাড়া হলেও ওখান দিয়েই উঠতে হবে ওকে। ওদিকটা দুর্গম বলে প্রহরীর নজর থাকবে কম, আর খানিকদূর ওঠার পর যদি দাঁড়াবার জায়গা পায় রানা তাহলে পাথর কেটে চেষ্টা করবে ও ভিতরে ঢোকার। পাহাড়ের গা ওখানে খুব চওড়া নয়, তাছাড়া ওখান দিয়ে ভিতরে ঢোকার চেষ্টা সফল হলে কবীর চৌধুরীর আস্তানার একেবারে মাঝখানে পৌঁছুনো যাবে।

কিন্তু সান নিকানডো রোডে পৌঁছেই দুটো আলোর হলুদ চোখ দেখে দমে গেল রানা।

গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে মাঝরাস্তায়। হেডলাইট দুটো দেখতে পেয়েই রাস্তার পাশে ঝোপে লুকোল রানা। সম্ভবত ইটালিয়ান আর্মি টহল দিচ্ছে গাড়ি নিয়ে। দেখে ফেলেছে নাকি ওরা?

ঝোপের আড়াল থেকেই রানা দেখল লোক ক'জনকে। মোট তিনজন নামল গাড়ি থেকে। দু'জনের গায়ে ইউনিফর্ম। যা সন্দেহ করেছিল ও ঠিক তাই। আর্মি। কিন্তু তৃতীয়জন কে? লাল শার্ট গায়ে লোকটার, সাদা প্যান্ট। পকেটে একটা হাত ভরা। দু'জনের হাতে টমিগান। গাড়ি রেখে দ্রুত পায়ে এগিয়ে আসছে এদিকেই। কাঁটা তারের বেড়া ঘেঁষে হাঁটছে ওরা। বেড়ার ওপারে পঞ্চাশ গজ পরই পাহাড় শুরু। লাল শার্ট পরা লোকটা অপেক্ষাকৃত আস্তে আস্তে হাঁটছে। পঞ্চাশ গজ দূর থাকতেই পরিষ্কার চিনতে পারল রানা—গিয়াকোমা। লন্ডনেই জানতে পেরেছে ও গিয়াকোমার আসল পরিচয়। ইটালিয়ান সিক্রেট সার্ভিসের লোক ও।

সৈন্য দু'জন পাহাড়ের দিকে ইঙ্গিত করে কথা বলতে বলতে এগোচ্ছে। সন্দেহ করার কোনও কারণ পেল না রানা কিন্তু ধরে ফেলল ও গিয়াকোমার

আচরণে। পকেটে হাত দিয়ে হাঁটার কারণ কি গিয়াকোমার, ইচ্ছা করে পিছিয়ে পড়ছে কেন সে? কিন্তু সব বুঝেও করার কিছু নেই ওর। পিছন থেকে সরে যাবার উপায় নেই। সমতল ভূমি। ডানে-বাঁয়ে নিচু ঝোপ-ঝাড়। সামনে ফাঁকা রাস্তা। কিন্তু ওদের হাতে বন্দী হওয়া মানে নিজে রক্ষা পাওয়া এবং সোহানার মৃত্যু। রানা তা হতে দেবে না।

গিয়াকোমা কি গুলি করবে? প্রশ্নটার উত্তর পেল না। অসম্ভব নয়। রানা বন্ধু বলেই ওকে মৃত্যু গুহায় যেতে দেবার পথে হয়তো বাধা দেবে সে। দরকার হলে আহত করবে। খবর পেয়েই এসেছে ওরা ওকে ধরতে।

রানার কাছ থেকে দুই গজ দূর দিয়ে চলে যাচ্ছে সৈন্য দু'জন। আর দু'এক পা গিয়ে ঘুরে দাঁড়াবে ওরা, অনুমান করল রানা। কিন্তু তার আগেই আধহাত কুড়ুলটা ছুঁড়ে মারল রানা রাস্তার অপর পারের কাঁটা তারের বেড়ার উপর। শব্দ শুনেই ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল দুই সৈন্য। গিয়াকোমাও সেদিকে ঘাড় ফিরিয়েছে। একলাফে কাছের আর্মিটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল রানা ক্যাঙারুর মত। টমিগানটা ছিনিয়ে নিল পলকের মধ্যে। প্রায় একই সময়ে অব্যর্থ লাথিটা বসিয়ে দিয়েছে ও দ্বিতীয় সৈন্যের তলপেটে। সে ছিটকে পড়ে যাবার আগেই টমিগান ধরল রানা গিয়াকোমার বুক লক্ষ্য করে, 'সাবধান, দোস্ত, এটা ছেলেখেলা নয়,' বলতে বলতে রানা দুই লাফে গিয়াকোমার পিছন দিকে চলে গেল। দ্বিতীয় সৈন্যটা তখন টমিগান বাগিয়ে ধরে উঠে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু নিরুপায় সে। গিয়াকোমার পিছনে রানা। গিয়াকোমার পিঠে টমিগানের নলটা ঠেকিয়ে বলল ও, 'পকেট থেকে অস্ত্রটা বের করে ডান পাশে পাঁচ হাত দূরে ফেলে দাও, গিয়াকোমা। আর তোমার সঙ্গীদের বলো টমিগান ফেলে দিয়ে দড়ির ব্যবস্থা করতে। আমি যেখানে ছিলাম সেখানেই ব্যাগটা পাবে ও।' কথা শেষ করেই এক পা পিছিয়ে এসে টমিগানের ট্রিগারে চাপ দিল রানা।

দুই আর্মির মাথার উপর দিয়ে দুই ঝাঁক বুলেট বেরিয়ে গেল। বাক্যব্যয় করল না গিয়াকোমা। পকেট থেকে রিভলভার বের করে ফেলে দিল সে। সশস্ত্র আর্মিটাও অনুসরণ করল তাকে। বলতে হলো না দ্বিতীয় বার, ঝোপের দিকে লক্ষ্মী ছেলের মত এগোল সে। ঝোপের ভিতর গিয়ে ঝুঁকে পড়ল। গিয়াকোমার সাথে লোকটা দৃষ্টি বিনিময় করল। ইশারা করল গিয়াকোমা। টের পেল না রানা।

উসখুস করছিল গিয়াকোমা। ডান পা-টা তুলে চুলকাচ্ছে সে বারবার। রানা কথা বলে উঠল, 'আমি এসেছি জানতে নিশ্চয়?'

'জানব না মনে?' গিয়াকোমা উত্তর দিল তিক্ত কণ্ঠে, 'ফোনে সব জানিয়েছে ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্স। প্লেনের শব্দও শুনেছি আমরা। তোমাকে দেখেও ফেলেছিলাম। তোমার ভাগ্য ভাল, রানা। অতি চালাকি করতে গিয়ে ভুল করে ফেলেছি আমরা। যাকগে, তোমার উদ্দেশ্যটা কি?'

'উদ্দেশ্য ভাল নয়।' রানা হাসল, 'বুঝতেই পারছ।'

'তুমি কি মন্টি সোরানায় ঢুকতে চাও? তাতে কি মিস সোহানাকে রক্ষা করতে পারবে?'

'চেষ্টা করব।'

'ঢুকতেই পারবে না তুমি। ঢুকতে পারলেও দেরি হয়ে যাবে। তুমি বেরুবার আগেই ঝাঁক ঝাঁক প্লেন এসে গুঁড়ো করে দেবে মন্টি সোরানোকে। এক্সকিউজ মি, রানা—পিঁপড়ে মেরে ফেলল আমাকে...' বলতে বলতে পা চুলকাবার জন্যে বসে পড়ল গিয়াকোমা হঠাৎ।

ঝোপের কাছ থেকে সবেগে উড়ে এল ভারী একটা হাতুড়ি রানার মাথা বরাবর। বিদ্যুৎবেগে একপাশে সরিয়ে নিল রানা মাথাটা। মাথার আধ ইঞ্চি দূর দিয়ে উড়ে গিয়ে কাঁটা তারের বেড়ার দিকে চলে গেল হাতুড়িটা। টমিগানের বোতামে চাপ দিল রানা।

ঝোপের নিচের দিকে মুখ করে টমিগানের বোতাম টিপছে রানা। লোকটার গায়ে গুলি লাগল না একটাও। কিন্তু দু'হাত উপরে তুলে সাথে সাথে দাঁড়িয়ে পড়েছে সে। একটা হাতে দড়ির বান্ডিলটা দেখতে পেল রানা। গিয়াকোমা ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ছাড়ল।

রানা কঠোর গলায় বলে উঠল, 'চালাকি, না?' আর্মির উদ্দেশে বলল ও, 'এদিকে আয়, শুয়োর। এই বাঁদরটাকে বেঁধে ফেল চটপট।'

বেশি কথার দরকার হলো না আর। গিয়াকোমাকে বেঁধে দড়ির বাকি অংশ অন্য সৈন্যের হাতে ধরিয়ে দিল রানার নির্দেশে। অপর জন তার দোসরকে বাঁধল। রানা বাঁধল শেষের জনকে। শেষে তিনজনের হাত বেঁধে গাড়ির দিকে হাঁটার নির্দেশ দিল ও। ওরা হাঁটতে শুরু করলে রানা হাতুড়ি আর আধহাতি কুড়ুলটাকে কুড়িয়ে নিল রাস্তার অপর দিক থেকে। হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল দশটা বাজে।

হাসি পেল রানার। তিনজন একসাথে জীপের পিছনে ওঠার চেষ্টা করছে। ওরা উঠে বসল অতি কষ্টে। রানা ওদের পাগুলো অবশিষ্ট দড়ি দিয়ে বাঁধার পর ড্রাইভিং সীটে এসে বসল। পাদানির কাছে একটা বাক্সে গ্রেনেড দেখে পুলকিত বোধ করল ও। ঘুরিয়ে নিয়ে তীব্র বেগে ছুটিয়ে দিল জীপ।

মাইল আড়াই দূরে নিয়ে গিয়ে নিচু খাদের ধারে ঝোপ ঝাড়ের মধ্যে তিনজনকে নামিয়ে দিল রানা নানারকম কসরৎ করে। নামাবার পর আর একবার বাঁধল ও তিনজনকে একসাথে শক্ত করে। জীপের ভিতর দড়ির কমতি নেই। ফিরতি পথে রওনা হলো ও।

অ্যাপ্রিসিন দিয়ে সান মার্কোয় যাবার রাস্তায় এসে জীপ দাঁড় করাল ও। কেউ নেই এদিকটায়। একঘণ্টা মাত্র বাকি প্লেন অপারেশনের। মন্টি সোরানোর পশ্চিম দিকটার গা একেবারে খাড়া। এদিক দিয়ে পালাবার বা ঢোকার উপায় নেই বলে ধরে নেয়াটা স্বাভাবিক।

দুই পকেটে পিস্তল। কোটটা পরে নিল রানা ব্যাগ থেকে বের করে। কোটের দুই পকেটে রাখল চারটে হ্যান্ড গ্রেনেড। হাতুড়িটা নিল কোমরে গুঁজে। অব্যবহৃত টমিগান ঝুলিয়ে নিল কাঁধে। টুকিটাকি বাকি জিনিসগুলো রইল পকেটেই।

আঙটা বাঁধা দড়ি ছিল জীপে। পাহাড়ে ওঠার জন্যেই। পশ্চিম দিকের

পাহাড়ের ত্বক অসমতল বলেই রক্ষে। আঙটা পঞ্চাশ কিংবা ষাট হাতের উপরে আটকে গেল ছুঁড়ে দেয়াতে। দেহের সমস্ত ভার দিয়ে ঝুলে পড়ে পরীক্ষা করল। জীপটার দিকে তাকাল। একশো গজের মধ্যেই রেখে যাচ্ছে ও গাড়িটাকে। পালাবার সময় এটাই একমাত্র সম্বল হবে ওর।

এবড়োখেবড়ো পাহাড়ের গায়ে পা রেখে দড়ি ধরে ধরে অবলীলাক্রমে উঠে গেল রানা ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ হাত। দশ সেকেন্ড জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলে আবার উঠতে শুরু করার ঠিক আগের মুহূর্তে গাড়ির শব্দ কানে এল।

রানা জীপটাকে যেখানে দাঁড় করিয়ে রেখে এসেছে সেই জায়গায় আরও দুটো জীপ এসে দাঁড়াল। আগেই ভাবা উচিত ছিল। গিয়াকোমাদের খোঁজে ওরা আসবে তাতে আর আশ্চর্য কি। উপর থেকে দেখতে পেল রানা জীপ দুটোর কপালে ফ্ল্যাশ লাইটের বড় ঢাকনি।

এখন উপরে ওঠার চেষ্টা করলে নির্ঘাত ধরা পড়ে যেতে হবে। দু'পাশে পালাক্রমে দেখে নিল রানা। ডান দিকে হাত দশেক দেখা যাচ্ছে। তারপর বাঁক নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে পাহাড়ের গা। দড়ি ছাড়ল না ও। কিন্তু দড়ির সাহায্য না নিয়ে দুই হাত দিয়ে পাহাড়ের খাঁজ ধরে ধরে ডান দিকে এগোতে শুরু করল। দড়িটা দাত দিয়ে ধরে রেখেছে।

উদ্দেশ্য ব্যর্থ হতে চলেছে ওর। বুঝতে বাকি রইল না রানার। দশটা পনেরো মিনিট হয়ে গেছে ঘড়িতে। পঞ্চাশ মিনিট বাকি আর। পাহাড় ভেদ করে ভিতরে ঢুকে দুইশো লোককে পরাজিত করে সময় থাকতে থাকতে এই কঠিন পথ দিয়ে সোহানাকে নিয়ে বেরিয়ে এসে নিরাপদ দূরত্বে সরে যাওয়ার চেষ্টা করা পাগলামি বলে মনে হলো ওর।

দশ হাত দূরত্ব অতিক্রম করে নতুন আশার সঞ্চার হলো ওর বুকে। হাত তিনেক চওড়া একটা জায়গা, পাহাড়ের গা যেখানে বাঁক নিয়েছে তার হাত দেড়েক পরই। সেখানে দাঁড়িয়ে ও দেখল পাহাড় এখান থেকে নেমে গেছে ঢালু হয়ে জঙ্গলাকীর্ণ একটা সমতল ভূমির দিকে—সেখানে গভীর জঙ্গল। চাঁদের আলোয় জঙ্গলের মধ্যেকার সরু পায়ে চলা রাস্তাটা ঠিক চিনতে পারল রানা। পথটার উপর আগাছা জন্মেছে। তার মানে অব্যবহৃত পথ। চওড়া জায়গাটার উপর বসে পড়ে পাহাড়ের গা পরীক্ষা করল ও। বুকের ভিতর আনন্দে লাফিয়ে উঠল হৃৎপিণ্ড। আগন্তুক সেনাবাহিনীকে ধন্যবাদ জানাল মনে মনে। ওরা এসে ওকে নির্দিষ্ট পথ থেকে সরতে বাধ্য না করলে এতবড় সুযোগটা চোখে পড়ত না। পাহাড়ের গা ছিল না এখানে! ছিল গুপ্ত পথ, তারপর সিঁড়ির ধাপ। পথটা সিমেন্ট আর ইঁট দিয়ে বন্ধ করে দিয়েছে কবীর চৌধুরী।

জুতোর শব্দ এগিয়ে এল। পাহাড়ের গায়ে ফ্ল্যাশলাইটের আলো পড়ল। কিন্তু দড়িটা আঙটা সমেত ছাড়িয়ে নিয়েছে রানা ইতোমধ্যেই নাড়া দিয়ে। ওকে দেখতে পেল না ওরা। কিন্তু ওর কানে অস্পষ্ট কথার শব্দ এল। নাম্বার ধরে কয়েকবার ডাকল ওরা। গিয়াকোমাকে ডাকছে। সাঙ্কেতিক নাম্বার। পনেরো মিনিট পর ফিরে গেল জীপ দুটো। কি ভেবে আগের জীপটাকে সাথে

করে নিয়ে গেল না ওরা।

জীপের শব্দ দূরে মিলিয়ে যাবার পর পরই রানা নিজের কাজ শুরু করল। আধ হাত লম্বা বাঁটওয়ালা কুড়ুল দিয়ে সতর্ক ভাবে সিমেন্ট চটিয়ে ফেলার পর ইটের দেখা পাওয়া গেল। সিমেন্ট চটিয়ে ফেলে জায়গাটা আরও চওড়া করা দরকার। পনেরো মিনিট লাগল ওর একহাত লম্বা একহাত চওড়া জায়গার সিমেন্ট তুলে ফেলতে। শব্দ করল না রানা এতটুকু। শব্দের ভয়ে অত্যন্ত ধীরে কাজ করতে হচ্ছে। হু হু করে বয়ে যাচ্ছে সময়। দশটা পঁয়ত্রিশ ঘড়িতে। সময় নেই।

প্রথম ইঁটটা নামিয়ে আনতে তিন মিনিট লাগল ওর। সুড়ঙ্গের দেখা নেই তবু। তারপরও ইঁটটার উপরের, নিচের আর ডান-দিকের মোট চারটে ইঁট খসাতে আরও কাটল সাত মিনিট। এরপর দ্বিতীয় স্তরের ইঁটে হাত দিল রানা। আর বিশ মিনিট।

চারটে ইঁট খসাতে আরও সাত মিনিট লাগল ওর। সুড়ঙ্গ পাওয়া গেল। মাথাটা গলিয়ে দিয়ে এপার থেকে ওপারে গলে যেতে লাগল ও। গোটা দেহটা কোমর পর্যন্ত ঢুকিয়ে দিয়ে হঠাৎ নিঃসাড় হয়ে গেল। পা দুটো রয়ে গেছে বাইরে। বাকি দেহটা একটা মৃদু আলোকিত প্যাসেজের দিকে ঢুকে পড়ছে। সামনেই জুতোর শব্দ। আবছা আলোয় দেখা যাচ্ছে না কাউকে। কিন্তু জুতোর শব্দটা এগিয়ে আসছে। তিন সেকেন্ড নিঃসাড় থাকার পরই দ্রুত পা দুটো প্যাসেজের ভিতর নিয়ে এল রানা। সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়ে হাত ঢুকিয়ে ওপার থেকে টেনে আনল টমিগানটা। উঠে দাঁড়াল ও। জুতোর শব্দ কাছাকাছি এসে আবার মিলিয়ে গেল দূরে। প্যাসেজের দশ বারো হাত দূরে, বাঁ দিকে সিঁড়ির একটা ধাপ দেখা যাচ্ছে। তারপর সোজা এগিয়ে গেছে প্যাসেজ, শেষ প্রান্তে মোড় নিয়েছে দুদিকে। সিঁড়ির ধাপ যেদিকে সেদিক থেকেই আসছে আলোর আভা। নিঃশব্দে এগোল রানা সেদিকে।

সিঁড়ির ধাপটার কাছে উঁকি মারল ও। তিনটে ধাপের পরই খোলা দরজা। ঘরের ভিতর বিরাট এক সেক্রেটারিয়েট টেবিলের দু'পাশে দু'জন লোক বসে রয়েছে। একজন রানার দিকে মুখ করে বসে বই পড়ছে, দ্বিতীয়জন চুপচাপ বসে আছে পিছনে ফিরে। সিঁড়ির প্রথম ধাপটায় পা রেখে উপর দিকে তাকিয়ে কাঠের একটা মাচা দেখতে পেল রানা। টমিগানটা সেখানে রাখল নিঃশব্দে। পকেট থেকে পিস্তল বের করে বাঁ হাতে ধরল ও। দুটো সিঁড়ির ধাপ পেরিয়ে চৌকাঠের উপর গিয়ে দাঁড়াল। নিঃশব্দে একটা পা এগিয়ে দিল। তারপরই বিদ্যুৎ খেলে গেল ওর দেহে।

পিছন ফিরে বসা লোকটার ঘাড়ে কারাতের এক কোপ মেরে মুখোমুখি বসা লোকটার বুক লক্ষ্য করে পিস্তল ধরল ও।

চেয়ার থেকে ঢলে পড়ে গেল কারাতের কোপ খাওয়া লোকটা। পড়ে আর নড়াচড়া করল না। দ্বিতীয় লোকটার হাত থেকে বইটা খসে পড়ল টেবিলের নিচে। উঠে দাঁড়াতে গিয়েও বসে পড়ল সে। দু'চোখে রাজ্যের বিস্ময়। রানা দ্রুত বলল, 'উঠে দাঁড়াও। মিস সোহানার রুমে নিয়ে চলো

আমাকে। জলদি।' ঘড়ি দেখল ও। এগারোটা পাঁচ বাজতে আর দশ মিনিট বাকি।

'ইয়েস, স্যার।' লোকটা টেবিলের কিনারে দুই হাত রেখে উঠে দাঁড়াল, 'কিন্তু অস্ত্রটাকে ভয় করে—একটু সরিয়ে নিন দয়া করে।'

'কথা নয়।' হঠাৎ রানা চমকে উঠে কান পাতল। বেল বাজছে দূরে। পরক্ষণেই লোকটার হাত দুটোর দিকে চোখ পড়ল ওর। টেবিলের কিনারায়, রানার চোখের আড়ালে ওয়ার্নিং বেলের বোতামটা চেপে ধরে রেখেছে লোকটা। পিস্তলের বাঁট দিয়ে বিদ্যুৎবেগে আঘাত করল ও লোকটার মাথায়। নিঃশব্দে চেয়ারে বসল লোকটা ধপাস করে, তারপর উল্টে পড়ে গেল চেয়ার সমেত। রানা দ্বিতীয় দরজা দিয়ে দুই লাফে একটা আলোকিত প্যাসেজে নেমে এল রুমের ভিতর থেকে। পঁচিশ তিরিশ হাত এগোবার পরই কোটের পকেটে হাত ঢোকাল ও। একদল লোক ছুটে আসছে। প্যাসেজটার শেষ প্রান্ত পঁচিশ গজ দূরে। মোড় নিয়েই দলটা রানাকে দেখতে পাবে একমুহূর্ত পরই। তার মানে নির্ঘাত মৃত্যু। দাঁত দিয়ে পিন ছাড়িয়ে গ্রেনেডটা ছুঁড়ে দিল রানা প্যাসেজের দিকে। তিন কদম এগিয়ে বন্ধ একটা দরজার গায়ে ধাক্কা মারার উপক্রম করছিল রানা, দরজাটা অকস্মাৎ সশব্দে খুলে গেল ভিতর থেকে। কপালে লাগল কবাট। কিন্তু সামলে নিল ও। কবাটটা সজোরে বন্ধ করে দিতেই রুমের ভিতরের লোকটার নাকে গিয়ে ধাক্কা মারল সেটা। আবার এক টানে কবাট খুলে এক লাফে রুমের ভিতর ঢুকে পড়ল রানা। আহত লোকটাকে ডিঙিয়ে খোলা দরজা দিয়ে দ্বিতীয় একটি ঘরের দরজা পেরিয়েই দু'হাত মাথার উপর তুলে দাঁড়াল রানা। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে ফ্যালকন। তার হাতে একটা ল্যুগার পিস্তল। রানার জন্যে ঘরের মাঝখানে অপেক্ষা করছিল সে।

গুপ্ত টি. ভি. সেটের কথা মনে পড়ল রানার।

'পিস্তল ফেলে দাও, রানা,' আদেশ জারি করল ফ্যালকন। উপায় নেই রানার। পিস্তলটা ছেড়ে দিল ও উপর দিকে ওঠানো হাত থেকে। খট্ করে শব্দটা মিলিয়ে যাবার আগেই প্রচণ্ড এক বিস্ফোরণ কাঁপিয়ে তুলল মেঝে। ঠিক সময়ে লাফিয়ে পড়ল রানা। ফ্যালকন বিস্ফোরণের ধাক্কা সামলে ওঠার আগেই নাকের উপর প্রচণ্ড একটা ঘুসি খেয়ে ছিটকে পড়ল দেয়ালের গায়ে। এবার তলপেটে লাথি চালাল রানা। ফ্যালকন জ্ঞান হারিয়েছে দেখে নিজের পিস্তলটা মাটি থেকে তুলে নিয়ে দ্বিতীয় দরজা পেরিয়ে ছুটল রানা। আরও দুটো খালি ঘর পেরিয়ে একটা প্যাসেজে এল ও। নির্জন প্যাসেজ। চারদিকে জুতোর শব্দ। মাঝে মাঝে গুলি হচ্ছে। চিৎকার করে ডাকাডাকি করছে সবাই। হুলস্থূল পড়ে গেছে কাসা বিলাভিসটায়। কবীর চৌধুরীর ফিরে আসতে আর তিন মিনিট। গোটা পাহাড় ধ্বংস হতে বাকি আট মিনিট। অসম্ভবকে সম্ভব করতে হবে এখন। সোহানাকে নিয়ে পৌঁছতেই হবে জীপের কাছে।

পিছন দিকে বারবার তাকাতে তাকাতে সামনে এগিয়ে চলল রানা।

কাসা বিলাভিসটার সব জায়গা পরিচিত না ওর। কোন দিকে চলেছে ও কে জানে। ঘড়ি বলছে সাত মিনিট সময় বাকি আর। দমে যাচ্ছে বুকটা। দু'মিনিটের মধ্যেই এয়ারক্র্যাফট নিয়ে ফিরে আসবে কবীর চৌধুরী। তারপর বাকি থাকবে পাঁচ মিনিট। অসম্ভব, পালাবার কথা পাগল ছাড়া ভাবতে পারে না কেউ। কোনদিকেই কোন উপায় নেই। নিশ্চিত মৃত্যু! কিন্তু এখন ভাবছে না রানা কিছুই। এখন একটা ভয়ঙ্কর যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয় সে।

দ্রুত দৌড়ুতে শুরু করল রানা। পিছন দিকে গুলির শব্দ। সেই সাথে চার-পাঁচজনের ছুটে আসার পদশব্দ শোনা যাচ্ছে। বাম হাতে পকেট থেকে একটা গ্রেনেড বের করল ও। পিস্তলটা ডান হাতে। প্যাসেজের গায়ে কোন দরজা নেই। মরিয়া হয়ে ছুটছে ও। হঠাৎ থমকে দাঁড়াল রানা। পদশব্দ এসে পড়েছে। পিছনে, সামনেও।

মোড় নিতেই সামনে দেখা গেল শত্রু। স্টেনগানটা তুলে লক্ষ্য স্থির করার আগেই গুলি করল রানা। বুকে গিয়ে বিঁধল বুলেট। বুকে হাত দিয়ে বসে পড়ল লোকটা। পিছনে ফিরে না তাকিয়ে গ্রেনেডের পিন আলগা করে জোরে গড়িয়ে দিল রানা। তারপর দ্রুত ছুটে নিহত লোকটাকে টপকে মোড় নিয়ে একটা খোলা দরজা দেখতে পেল সে। দরজা দিয়ে নিঃশব্দ পায়ে হলরুমে ঢুকল রানা। চিনতে পারল ও। হলরুমের একটা দরজা দিয়ে ঢোকা যাবে লিফটে। এই সোজাসুজি তিন তলার উপর সোহানার রুম।

লিফটের দরজা খুলতেই পরপর চারটে গুলি বেরিয়ে এল ভিতর থেকে। আগেই সন্দেহ করছিল রানা। লিফটের বোতাম টিপেই বসে পড়েছিল ও। গুলি করতে করতে বেরিয়ে আসছে মানাটোফ। ওকে গুলি করল রানা। কিন্তু ঠিক জায়গায় লাগেনি রানার গুলিটা। মানাটোফের মুখের ডান দিকটায় দগ দগ করছে ঘায়ের মত টাটকা ক্ষত। রক্তের ধারা গলার দিকে নেমে আসছে ক্ষত থেকে।

দ্বিতীয়বার পিস্তলের ট্রিগারে চাপ দেবার আগেই লাথিটা এসে লাগল রানার বুকে। চিৎ হয়ে পড়ে যেতে যেতে সামলে নিল রানা। মানাটোফ লিফটের বাইরে নেমে এসে টাল সামলাতে সামলাতে লক্ষ্য স্থির করছে রানার মাথা বরাবর। পা দিয়ে বিদ্যুৎবেগে ধাক্কা মারল রানা। লাফ মেরে হলরুমের খোলা একটা দরজার দিকে দৌড় দিল ও। মানাটোফ উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে আরও দুটো গুলি করল। চিৎকার করে বলল, 'বেরিয়ে গেল, বেরিয়ে গেল—ধরো ওকে...'

অন্য একটা দরজা দিয়ে হুড়মুড় করে তিনজন লোক ঢুকল হলরুমে। শব্দ পেয়েছিল রানা। মানাটোফকে শেষ না করেই হলরুম থেকে বেরিয়ে পড়তে হয়েছে ওকে। হলরুম থেকে বেরিয়ে প্যাসেজ ধরে ছুটল রানা। সামনেটা ফাঁকা। কিন্তু নিশ্চিত হবার জন্যে দুটো গুলি চালাল ও। ঝট্ করে খুলে গেল দুটো দরজা। প্রথম দরজাটা হাত তিনেক দূরে। গুলি করল রানা। চৌকাঠের উপরই পড়ল একজন বুকে হাত চেপে ধরে। লাফ মেরে চৌকাঠের ভিতরে চলে গেল রানা। হাতটা বের করে গুলি করল দ্বিতীয়বার। প্যাসেজে বেরিয়ে

এসেছিল দ্বিতীয় দরজাটা খুলে। হাত পনেরো দূর থেকে এক ঝাঁক বুলেট এসে দরজার কবাটে লাগল। মাথা বের না করে আবার গুলি করল রানা। আর একটা চিৎকার উঠল সাথে সাথে। শব্দ হলো ধাতব বস্তু পাথরের মেঝেতে পড়ার। স্টেনগানটা পড়ার পর দুই সেকেন্ডের নিস্তব্ধতা। তারপর দেহটা পড়ার শব্দ শুনতে পেল রানা। রুমের ভিতর থেকে প্যাসেজে বেরিয়ে আবার ছুটতে আরম্ভ করল। মোড় নিতেই দেখা গেল সিঁড়িটা।

একতলায় উঠে কাউকে দেখতে পেল না রানা। দোতলায়ও কেউ নেই। কি ব্যাপার?

পিছনের সিঁড়িতে দ্রুত পদশব্দ। লাফিয়ে বাকি ধাপ ক'টা পেরিয়ে বারান্দা ধরে ছুটতে ছুটতে সোহানার দরজায় গিয়ে ধাক্কা মারল রানা।

দরজা খোলাই ছিল। সোহানা দাঁড়িয়ে রয়েছে দ্বিতীয় দরজাটার গায়ে পিঠ ঠেকিয়ে। আতঙ্কিত দৃষ্টি। ভিতরে ঢুকল রানা। তারপরই সোহানার পিছনের দরজাটা খুলে গেল নিঃশব্দে। মানাটোফ সোহানার পিঠে রিভলভারের নল ঠেকিয়ে হা হা করে বিকট স্বরে হেসে উঠল। হাসি থামতে খালি হাতটা দিয়ে গলা থেকে রক্তের ধারা মুছে নেবার চেষ্টা করতে করতে বলল, 'অনেক হয়েছে, রানা। এবার পিস্তলটা ফেলে দাও।'

হিসেব করছিল রানা। ছ'টা গুলি করেছিল মানাটোফ। ও কি অস্ত্রটা বদলেছে বা গুলি ভরেছে নতুন করে? রানার পিস্তলে গুলি আছে মাত্র একটা।

সময় নেই। আর মাত্র এক মিনিট আছে কবীর চৌধুরী এসে পড়ার। পিছনের বারান্দায় পদশব্দ, গুলির শব্দ। মানাটোফ জড়িয়ে ধরেছে একহাতে সোহানাকে। রিভলভারের নলটা সোহানার কপালের বাঁ পাশে ঠেকানো। আদেশ অমান্য করলেই ট্রিগার টিপবে ও। মাথার উপর ধীরে ধীরে হাত তুলতে শুরু করল রানা।

এক টুকরো হিংস্র হাসি ফুটে উঠল মানাটোফের ক্ষত-বিক্ষত মুখে। গা ঘিন ঘিন করে উঠল রানার। মানাটোফের একদিকের চোয়াল নেই বললেই চলে। লোকটা এখনও স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে কি করে সেটাই আশ্চর্য।

হাত উপরদিকে ওঠাবার সময়েই ট্রিগার টিপল রানা। সন্দেহ করেনি মানাটোফ। কিন্তু প্রস্তুত ছিল। ডান হাতের কনুইয়ের কিছুটা উপরে গিয়ে লাগল গুলি। ট্রিগারটা টিপে ধরল ও তার আগেই। চোখ বন্ধ করে ফেলেছিল সোহানা। কিন্তু গুলির শব্দ হলো না। চেম্বার খালি মানাটোফের রিভলভারের। ঝাঁপিয়ে পড়ল রানা ওর উপর। পিস্তলের বাঁটটা ভেঙে যাবার উপক্রম হলো ওর মাথার সাথে সংঘর্ষে। ঢলে পড়ল মেঝেয় মানাটোফের মোটা দেহটা। ফেলে দিল রানা পিস্তল। সোহানা রানার হাত ধরে বলল, 'তুমি আসবে আমি জানতাম, রানা!'

মানাটোফ যে দরজা দিয়ে ঢুকেছিল সে দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল ওরা প্যাসেজে। হুড়মুড় করে ঢুকে পড়েছে দলটা সোহানার ঘরে।

ঘড়ি দেখল রানা। আর ছয় মিনিট। পৌঁছুতে পারবে ওরা জীপের কাছে?

প্যাসেজটা পরিচিত ঠেকল রানার। হঠাৎ মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল।

দ্রুত একটা গ্রেনেড বের করে রুমের ভিতর ছুঁড়ে দিল ও পিন ছাড়িয়ে। তারপর সোহানার হাত ধরে ছুটতে শুরু করল প্যাসেজের শেষ প্রান্ত লক্ষ্য করে। পকেটের দ্বিতীয় পিস্তলটা বের করে হাতে রাখল রানা।

প্যাসেজের শেষে স্টীলের প্রকাণ্ড দরজাটা। পিছনে বিস্ফোরণের শব্দে কেঁপে উঠল মেঝে। বিরাট তালাটার মাঝখানে গুলি করল রানা পরপর দুটো। ভেঙে গেল তালা। দরজা খুলে সোহানাকে নিয়ে লিফটে উঠল ও।

লিফট নেমে এল নিচে। নিঃশব্দে লিফট থেকে নামল রানা। পিস্তলটা সোহানার হাতে ধরিয়ে দিয়ে ইশারা করল হাত দিয়ে। সোহানা আলোকিত জ্বালামুখের বিরাট মেঝেতে নামল বিস্ফারিত চোখে। রানার ইঙ্গিত বুঝতে পেরে দেয়াল ঘেঁষে এগোতে শুরু করল ও। পঞ্চাশ গজ দূরে, মাঝামাঝি জায়গায় দেখা যাচ্ছে গর্তটা। কবীর চৌধুরীর এয়ারক্র্যাফট আর ক'সেকেন্ড পর ওখানেই এসে নামবে।

সোহানা ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ হাত এগিয়ে একটা চাকাওয়ালা ঠেলাগাড়ির আড়ালে আত্মগোপন করল। কাঁচ ঘেরা কন্ট্রোল রুমে দু'জন লোক বসে বসে যন্ত্রপাতি ঘাঁটাঘাঁটি করছে। কাঁচের ঘরটা সাউন্ড প্রুফ, রানা অনুমানেই তা বুঝতে পারল। লোক দু'জন কিছুই জানে না উপরে কি ঘটে গেছে।

নিঃশব্দ পায়ে এগোতে লাগল রানা। দশ সেকেন্ডে দশ পা অতিক্রম করে থামল ও। দরজাটা খোলা। কন্ট্রোলরুমে দু'জনের কানেই হেডফোন। টেবিলের ওপর একটা কোল্ট অটোমেটিক রেখে কথাবার্তা বলছে ওরা কবীর চৌধুরীর সাথে। দ্রুত নিঃশব্দ পায়ে আরও খানিকটা এগোল রানা।

'রুফ উইথড্রন!' একজন অপারেটর আওড়াল। কথাটা বলেই হেডফোন খুলে ফেলে পিছন দিকে তাকাল সে। রানাকে দেখেই ছানাবড়া হয়ে উঠল তার চোখ দুটো। বিদ্যুৎ খেলে গেল রানার শরীরে। গলার পাশে প্রচণ্ড এক কারাতের কোপ খেয়ে দড়াম করে আছড়ে পড়ল লোকটা দ্বিতীয় জনের উপর। টেবিলের উপর থেকে পিস্তলটা তুলে নিল রানা, যেন নিজের জিনিস। দ্বিতীয় অপারেটরের হাত পকেটে চলে গেছে, কিন্তু বেরিয়ে আসার আগেই মারা গেল সে চেয়ারে বসা অবস্থায়। কোল্টের গুলিতে ফুটো হয়ে গেছে তার হৃৎপিণ্ড।

সরে গেছে আগ্নেয়গিরির উপরের অংশের কৃত্রিম ছাদ। এয়ারক্র্যাফটের মৃদু গুঞ্জন ধ্বনি কানে এল। নামছে সেটা। ধীরে ধীরে নেমে আসছে।

কোনও বিশেষ ঘটনা ঘটল না। নিরাপদে নামল এয়ারক্র্যাফট নির্দিষ্ট জায়গায়। কাঁচ ঘেরা কন্ট্রোলরুম থেকে এয়ারক্র্যাফটটার পেটের দিকে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল রানা। মৃদু গুঞ্জন ধ্বনি থেমে গেল হঠাৎ।

দরজাটা ধীরে ধীরে খুলে গেল এয়ারক্র্যাফটের। কবীর চৌধুরীর একটা পা দেখা গেল নিচের দিকে নেমে আসছে। সিঁড়ির ধাপে পা রেখে রেখে গর্তের ভিতর নেমে পড়ল সে। তিন সেকেন্ড পর আবার উঠতে শুরু করল। এবার অন্য একটা সিঁড়ি বেয়ে। উপরে উঠে কন্ট্রোলরুমের দিকে চোখ ফেলল কবীর চৌধুরী। এবং থমকে দাঁড়াল।

একা রানাকে কন্ট্রোলরুমে দেখতে পেয়ে বোকার মত তাকিয়ে রইল কবীর চৌধুরী দুই সেকেন্ড। তারপরই পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিল সে। সোহানার গলা শোনা গেল কবীর চৌধুরীর পিছন থেকে, 'খবরদার, চৌধুরী। মাথার খুলি উড়িয়ে দেব। হাত বের করে ফেলো। খালি হাত।'

সোহানার কথা শেষ হবার সাথে সাথে লিফটের দরজা খুলে গেল। পাঁচ ছ'জন লোক উত্তেজিত ভাবে নেমে পড়ল লিফট থেকে। দ্রুত পায়ে আসছে এদিকে।

কবীর চৌধুরীকে লক্ষ্য করে গুলি করল সোহানা। তার আগেই লাফিয়ে সরে যাবার চেষ্টা করল কবীর চৌধুরী। কিন্তু বাঁকা হয়ে গেল শরীরটা। গুলি লেগেছে পিঠে।

রানা সেদিকে লক্ষ না করে লিফট থেকে যে লোকগুলো নেমেছে তাদের দিকে পিস্তলের মুখ করে গুলি করল পরপর চারটে। সোহানা আবার গুলি করল দুটো।

ছয়জনই সিনেমার ডামির মত ঢলে পড়ল লিফটের সামনে। মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করছে। এরই মধ্যে পিস্তল বের করল দু'জন। আরও দুটো গুলি করল রানা।

কবীর চৌধুরী আহত অবস্থায় ছটফট করছে মেঝেতে শুয়ে। হাতে পিস্তল। পাশ ফিরল সে।

কন্ট্রোলরুম থেকে বেরিয়ে কবীর চৌধুরীর হাত লক্ষ্য করে গুলি করতে গিয়েও নিরস্ত হলো রানা। গুলি নেই। সোহানার দিকে লক্ষ্যস্থির করেছে কবীর চৌধুরী। রানা ঝাঁপিয়ে পড়ল তার উপর।

নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে সোহানা। কান পেতে কি যেন শোনার চেষ্টা করছে সে।

একটা লাথি মারল রানা কবীর চৌধুরীর হাতে। রিভলভারটা ছিটকে চলে গেল কয়েক হাত দূরে। কি ভেবে হঠাৎ থমকে গেল রানা। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে তড়াক করে লাফিয়ে উঠল। আর দুই মিনিট!

সোহানাকে টেনে নিয়ে দৌড় মারল ও এয়ারক্র্যাফটের দিকে। লাফ দিয়ে নামল ওরা অগভীর গর্তটায়। এয়ারক্র্যাফটের দরজা খুলেই সোহানাকে ভিতরে ঢুকিয়ে দিল রানা ধাক্কা মেরে।

পিছন দিকে তাকাল রানা। উঠে দাঁড়িয়েছে কবীর চৌধুরী যন্ত্রণায় না আক্রোশে বুঝতে পারল না রানা, দাঁতে দাঁত চেপে, দুই হাতের মুঠি শক্ত করে, দুই চোখ বিস্ফারিত করে টলতে টলতে এগিয়ে আসছে সে।

এয়ারক্র্যাফটের ভিতর উঠে গেল রানা। দরজা বন্ধ করে দেবার আগে কবীর চৌধুরীর প্রায়োন্মাদ চেহারার দিকে তাকিয়ে কেমন যেন মায়া হলো ওর।

দশ

পাগলের মত সুইচ বোর্ডের বোতাম টিপতে শুরু করল রানা। কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। স্টার্ট নিচ্ছে না এয়ারক্র্যাফট। অথচ এটাই এখন একমাত্র ভরসা।

ঘড়ির দিকে তাকাতে ভয় করছে রানার। শেষবার দেখেছে ও, তখন সত্তর সেকেন্ড বাকি ছিল।

'কিসের শব্দ হচ্ছিল, রানা?' সোহানা জিজ্ঞেস করল হঠাৎ। শুনতে পেয়েছে রানাও। জানে কিসের শব্দ ওটা। অসংখ্য বোমারু বিমান ছুটে আসছে। উত্তর দিল না ও। সুইচ বোর্ডের বোতামগুলো একটার পর একটা টিপে যাচ্ছে রানা। হাতলগুলোও বাদ দিচ্ছে না।

প্লেন রানা চালিয়েছে আগে। কিন্তু স্বাভাবিক অস্বাভাবিক কোন প্লেনের সাথেই এটার কোন মিল নেই। কিন্তু সময়ও তো নেই আর!

হঠাৎ গুঞ্জন ধ্বনি কানে ঢুকল। ঘেমে গেছে রানা। পাগলের মত দুটো হাতল ধরে টান মারল ও। হঠাৎ চিৎকার করে উঠল সোহানা, 'হালকা বোধ হচ্ছে কেন, রানা!'

টিভির সুইচগুলো চিনে ফেলেছে ইতোমধ্যে রানা। চারটে পর্দার দিকে পালাক্রমে তাকাল ও, তারপর হঠাৎ সব ছেড়ে দিয়ে পাশের চেয়ার থেকে সোহানাকে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে নিজের দিকে টেনে এনে রাক্ষসের মত চুমু খেতে শুরু করল গালে, ঠোঁটে, নাকে। সোহানা চেঁচিয়ে উঠল, 'এই ছাড়ো, ছাড়ো, কি হচ্ছে!'

'বেঁচে গেছি সোহানা! বেঁচে গেছি এ যাত্রা! হুররে…'

টিভির পর্দার দিকে চোখ রাখল রানা হঠাৎ সোহানাকে ছেড়ে দিয়ে। অসংখ্য বোমারু বিমান থেকে বোমা বর্ষণ করা হচ্ছে নিচের দিকে। সোহানা সেদিকে চোখ ফেলেই চেঁচিয়ে উঠল, 'একি, রানা, সিনেমা হচ্ছে নাকি?' ব্যাপার কিছুই জানে না ও।

অল্টিমিটারের দিকে চোখ রেখে রানা বলল, 'আচ্ছা সোহানা, বলো তো আমরা এখন কোথায়?'

'কেন, কাসা বিলাভিসটায়।'

'না, মেম সাহেব, না।' রানা হাসল, 'আমরা এখন মন্টি সোরোনা আগ্নেয়গিরির চূড়া থেকে পাঁচ মাইল উপরে। ওই দেখো বোমা ফেলা হচ্ছে পাহাড়ের ওপর।' না জেনেই বোতাম টিপল রানা একটা, দুটো হাতল টানল। স্পীডমিটারের দিকে চোখ রেখে ঢোক গিলল ও। তারপর যেন কিছুটা হতভম্ব হয়েই বলল, 'এখন আমরা ছুটছি, প্রতি সেকেন্ডে পাঁচ মাইল করে। মাটি থেকে পনেরো মাইল উপর দিয়ে। দেখো, দেখো সোহানা, টিভির পর্দায়

প্যারিস সিটি দেখা যাচ্ছে।'

'রানা!' সোহানা শঙ্কিত গলায় বলল, 'শেষ পর্যন্ত তুমি পাগল হয়ে গেলে!'

আধ মিনিট কথা বলতে পারল না রানা। তারপর বোকার মত বলে উঠল, 'বাঁচার কোনও উপায় নেই, সোহানা। আমি চালাতে জানি না এই এয়ারক্র্যাফট।'

'হ্যালো,' ওয়্যারলেসের মাউথপিসটা মুখের সামনে তুলে ধরে যোগাযোগ করার চেষ্টা করল রানা পৃথিবীর সাথে। একই সাথে বোতাম টিপছে ও।

টিভির পর্দায় দৃষ্টি পড়তেই ছানাবড়া হয়ে উঠল চোখ জোড়া। দাঁড়িয়ে আছে গ্রেট ব্রিটেন টিভির পর্দায়। তার মানে মহাশূন্যে স্থির হয়ে আছে এয়ারক্র্যাফট গ্রেট ব্রিটেনের মাথার উপর।

দুঃখে কপাল চাপড়াতে ইচ্ছে করল রানার। কোন্ বোতাম টেপার ফলে এয়ারক্র্যাফটটা স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছে তা লক্ষ করেনি ও।

'কি হলো তোমার?' ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করল সোহানা। ঘড় ঘড় করে শব্দ হলো ওয়্যারলেসে।

সেটটা খোলা আছে মনে পড়ল রানার। মাউথপিসটা মুখের সামনে তুলে ধরে রানা চেঁচিয়ে উঠল, 'হেলপ! হেল্প!'

উত্তর এল না কোনও।

রানা একটা হাতল টানতে গিয়ে অকস্মাৎ চমকে উঠল। হাত নড়ল না ওর। মনে পড়ে গেল কবীর চৌধুরীর কথা। সে বলেছিল এই এয়ারক্র্যাফট কোন আনাড়ি লোক চালাতে গেলে স্রেফ আত্মহত্যা করবে। এমন একটি বোতাম বা হাতল আছে যেটা চাপ দিলে বা টান মারলে সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যাবে এয়ারক্র্যাফটটা।

'হেল্প!' রানা আবার চেঁচিয়ে উঠল, 'হেল্প!'

এগিয়ে এল সোহানা। 'কি হয়েছে, রানা? এরকম করছ কেন? মাথা…'

'না, মাথা খারাপ হয়নি এখনও। কিন্তু শিগ্গিরই হবে। তোমারও।' বিষণ্ন হাসি হাসল রানা, 'শোনো তাহলে…' গড় গড় করে বলে গেল ও সব কথা।

আঁতকে উঠল সোহানা, 'সর্বনাশ! এবার তাহলে নিশ্চয় মরব আমরা, রানা!'

রানা উত্তর দিল না। আতঙ্কিত দৃষ্টিতে চোখ বুলিয়ে একবার সুইচবোর্ডের বোতাম আর হাতলগুলো দেখল। প্রায় একশোর মত বোতাম। এক একটার কাজ এক এক রকম। হাতলের সংখ্যা পঞ্চাশটার মত। ছোট বড় বিভিন্ন আকারের। সবচেয়ে বড়টি সর্ব বাঁয়ে। সেটার দিকে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল রানা। মনে মনে ঠিক করল প্রাণ থাকতে ওই হাতলটা ধরে টান মারবে না ও। কেমন যেন সন্দেহের সৃষ্টি করছে মনে ওটা। বড় বলেই হয়তো। কিন্তু কে জানে। ওটা ধরে টানলেই এয়ারক্র্যাফটটা ধ্বংস হয়ে যাবে কিনা কেউ বলতে পারে?

'ওয়ান ফোর ফাইভ কলিং…ওয়ান ফোর…!' ওয়্যারলেসে শব্দ ভেসে

আসছে।

চমকে উঠে মাউথপীসটা মুখের সামনে তুলল রানা, 'হেল্প! হেল্প!'

ক্ষীণ কণ্ঠ ভেসে এল, 'লন্ডন এয়ারপোর্ট থেকে বলছি। আপনার কথা শুনতে পাচ্ছি আমরা। কিন্তু পরিষ্কার করে বলুন। কোথা থেকে বলছেন আপনি?'

রানা চিৎকার করে উঠল, 'লন্ডনের ঠিক মাথার উপরে আমরা। মাটি থেকে...' অল্টিমিটার দেখে নিল রানা, 'আঠারো মাইল উপরে। স্পেশাল এয়ারক্র্যাফট এটা। আটকা পড়েছি আমরা দু'জন এর ভিতর। আমরা কেউ চালাতে জানি না এটা। সুইচের নিচে কিছু লেখা নেই। আমাকে কিভাবে সাহায্য করতে পারবেন কিছুই বুঝতে পারছি না। আপনারা এক্ষুণি পাকিস্তান এমব্যাসিতে মেজর জেনারেল রাহাত খানকে একটা খবর দিন।'

'আপনার নাম কি, স্যার?' বিমূঢ় কণ্ঠ ভেসে এল, 'আমাদের রাডারে পাওয়া গেছে আপনাদের এয়ারক্র্যাফট। পৃথিবীর বাসিন্দা তো আপনি?'

'সময় নষ্ট করবেন না,' বলল রানা, 'যা বলছি তা করলে আমরা হয়তো প্রাণে বেঁচে যেতে পারি।'

'কত মাইল উপরে বললেন, স্যার? আঠারো মাইল? অ্যাবসার্ড! হাউ এভার, আপনার নাম কি বলব, স্যার?'

'মাসুদ রানা।' রানা চেঁচিয়ে বলল, 'এমব্যাসিতে ফোন করে আমার নাম বললেই হবে।'

'ইয়েস, স্যার।' ক্ষীণ যান্ত্রিক স্বর ভেসে এল, 'আমি যোগাযোগ করছি। আপনি অপেক্ষা করুন।'

সোহানা বলে উঠল, 'এমব্যাসিতে খবর পাঠিয়ে কি লাভ হবে?'

'মাফ চেয়ে নেব বুড়োর কাছ থেকে শেষ সময়ে, এই লাভ। জীবনে আর দেখা হচ্ছে না—হয়তো। মনে মনে অনেকবার নরকে পাঠিয়েছি ওঁকে,' রানা গম্ভীর ভাবে বলল।

'ঠাট্টা রাখো। এলোপাতাড়ি টিপতে থাকো না বোতামগুলো। একটা না একটা কাজে লেগে যাবে হয়তো। খামোকা শূন্যে ঝুলে থেকে লাভ কি?'

'তাই করব, কিন্তু আগে বুড়োর কাছ থেকে চিরবিদায় নিয়ে নিই।'

সোহানা কি বলতে যাচ্ছিল, ওয়্যারলেসে শব্দ ভেসে এল, 'আপনারা কোন্ ভাষায় কথা বলছেন, স্যার?' অপারেটরের কণ্ঠে রাজ্যের বিস্ময়। ওদেরকে মঙ্গলগ্রহের অধিবাসী বলে ধরে নিয়েছে কিনা কে জানে।

'কেন? ভাষাটা খুব মিষ্টি লাগছে বুঝি?' রানা টিটকারি মেরে বলল।

'সত্যি তাই, স্যার!' অপারেটর অবরুদ্ধ কণ্ঠে বলল, 'অনেকটা আমাদের পৃথিবীর ভাষারই মত। আপনাদের ভাষাটা কোথাকার, মানে কোন্ গ্রহের জানতে পারলে...'

রানা ধমক লাগাল, 'বাজে কথা রাখুন। খবর পাঠিয়েছেন এমব্যাসিতে?'

'ইয়েস, স্যার। এমব্যাসি থেকে লোক আসছেন আমাদের কন্ট্রোলরূমে,' বলল অপারেটর।

রানা বলল, 'তাহলে চুপচাপ থাকুন।'

'ইয়েস, স্যার।'

সোহানা আবার বলল, 'কোন আশা দেখতে পাচ্ছি না, রানা। উদ্ধার পাওয়ার কোনও পথ নেই। কিন্তু এ নিয়ে ভেবেও লাভ নেই। যা হবার হবে।'

রানা কথা বলল না। ঘড়ি দেখল ও। সাড়ে এগারোটা। মন্টি সোরোনা এবং কাসা বিলাভিসটা গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেছে ইতোমধ্যে। কবীর চৌধুরীর স্বপ্ন শেষ। কবীর চৌধুরী শেষ···রয়েছে কেবল তার আশ্চর্য কীর্তি—এবং সেটা জ্বালিয়ে মারছে ওদের।

'আমার কিন্তু ভালই লাগছে, রানা। দাও যে কোন একটা বোতাম টিপে, চলে যাই চাঁদে।'

সোহানার কথা শেষ হতেই মেজর জেনারেল রাহাত খানের ভারী গলা ক্ষীণ ভাবে ভেসে এল ওয়্যারলেসের মাধ্যমে। 'কি ব্যাপার, রানা?'

সব কথা খুলে বলল ও রাহাত খানকে।

রানার কথা শেষ হতেও অপর প্রান্ত থেকে কোনও উত্তর এল না।

আধমিনিট অপেক্ষার পর রাহাত খানের বিচলিত কণ্ঠ শোনা গেল, 'সর্বনেশে কাণ্ড! পথ দেখতে পাচ্ছি না কোনও। দু'একটা বোতাম বা হাতল নাড়াচাড়া করে দেখো দেখি। মনে আছে কোন্‌গুলো কি বেগে নাড়াচাড়া করেছ?'

'স্পষ্ট মনে নেই, স্যার···'

'যেগুলো মনে আছে সেগুলোই শুধু নাড়াচাড়া করো। বাকিগুলোয় হাত দিয়ো না। রানা?' রাহাত খানের কণ্ঠস্বর নরম না কঠোর বোঝা গেল না অতদূর থেকে।

'জী, স্যার?'

'অর্ডার ভায়োলেশনটা মাফ করে দিলাম। নিশ্চিন্তে নেমে এসো নিচে। তোমাদের জীবিত দেখতে চাই আমি। কথাটা ভুলো না,' কঠোর কণ্ঠ রাহাত খানের।

হি হি করে হেসে উঠল সোহানা। 'শুনলে, রানা, মরবারও অর্ডার নেই আমাদের।'

জবাব না দিয়ে একটা বোতাম টিপল রানা অনুমানের উপর নির্ভর করে। দুলে উঠল গ্রেট ব্রিটেন। 'চললাম, আবার,' চেঁচিয়ে উঠল রানা।

রাহাত খানের কণ্ঠ ভেসে এল অস্পষ্ট ভাবে, 'হোয়াট! কি বললে?'

'চললাম, স্যার।'

'কোথায়? কোন্ দিকে?' উদ্বিগ্ন কণ্ঠ রাহাত খানের। খুবই অস্পষ্ট।

'জানি না···'

বোতামে হাত দিতে ভয় করছে রানার। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠল নতুন করে।

ওয়্যারলেসের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে।

এয়ারক্র্যাফট ঝড়ের বেগে ছুটে চলেছে। কিন্তু কোন্‌দিকে তা বোঝার

উপায় নেই।

কুড়ি মিনিট পর স্পীডমিটার দেখে রানা বলল, 'সেকেন্ডে ছয় মাইল বেগে এগোচ্ছি আমরা।'

সোহানা হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, 'রানা, ঘড়ি দেখো তো। সকাল হয়ে গেল নাকি!'

'কেন?' প্রশ্ন করল রানা অবাক হয়ে। ঘড়ি দেখল ও। বারোটা বাজতে দশ।

'টিভির পর্দার দিকে দেখো।'

রানা চেয়ে দেখল ভোর হচ্ছে দক্ষিণ আমেরিকায়। ক্রমে দুপুর হলো, সন্ধে হলো এবং তারপর আবার রাত হয়ে গেল অল্পক্ষণের মধ্যেই। যেন অ্যারাবিয়ান নাইট্সের কল্পনার জগতে ঢুকে পড়েছে ওরা।

কি করবে বুঝতে পারল না রানা। চুপচাপ বসে থাকলে এখন ছয় মহাদেশের উপর ঘুরতে থাকবে ওরা অনবরত। নামতে পারবে না। একটা কিছু করা দরকার। কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে চিন্তা করল রানা, তারপর ভয়ে ভয়ে নতুন একটা বোতামে টিপ দিল। গতিপথ পরিবর্তন হলো শুধু, আর কোন ফল হলো না।

মিনিট দশেক অপেক্ষা করার পর মরিয়া হয়ে স্থির করল রানা, বড় হাতলটাই টান দেবে সে। যা হয় হোক। এই অনিশ্চয়তার মধ্যে আর থাকা যায় না। সোহানাকে মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দিয়ে চোখ বন্ধ করে টান দিল রানা বড় হাতলটা। মিনিট খানেক চোখ খুলল না।

চোখ খুলে প্রথমে কিছুই দেখা গেল না। পর মুহূর্তে চমকে উঠল রানা। টেলিভিশনের পর্দায় ফুটে উঠেছে প্রত্যুষের প্রাকৃতিক দৃশ্য। ধীরে ধীরে ফুটে উঠেছে গাছ, মাঠ, নদী…

এক লাফে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রানা। টেনে তুলল সোহানাকে হাত ধরে। চোখের পলকে এয়ারক্র্যাফটের দরজা খুলে ফেলল ও। খুব ধীরে ধীরে ল্যান্ড করছে এয়ারক্র্যাফট। নিচেই নদী। দশ হাত বাকি থাকতেই লাফ দিল দু'জন হাত ধরাধরি করে। আফ্রিকার কুমীর ভর্তি লেম্পোপো নদী না হলেই হয়!

দশ মিনিটে তীরে পৌঁছে গেল ওরা। নদীতে স্রোতের টান বেশি নয়। কিন্তু বেশ গভীর বোঝা গেল ঢেউয়ের দোলা অনুভব করে। অনুচ্চ পাড়ে উঠে এল ওরা। ডুবে গেছে এয়ারক্র্যাফট পানির নিচে। কোন চিহ্ন নেই তার। মৃদুমন্দ বাতাসে শীত শীত লাগছে সোহানার।

'এটা কোন্ দেশ? পৃথিবী তো?' প্রশ্ন করল সোহানা অনুচ্চ কণ্ঠে।

ভোর হচ্ছে। একটা পাখি ডেকে উঠল। কেমন যেন পরিচিত ঠেকল ডাকটা। বোঝা গেল এটা পৃথিবীই। চারদিকে ভাল করে লক্ষ করল রানা। অন্ধকার কাটেনি, নদীর ওপারে ঘন জঙ্গল বলে মনে হচ্ছে। লোকালয় কাছেই, বোঝা গেল নদীর পাড়ে মানুষের বর্জ্য দেখে।

'রানা, আমরা বোধহয় অস্ট্রেলিয়ার কোন জঙ্গলে নেমেছি।'

রানার একটা হাত চেপে ধরল সোহানা অ্যাবরিজিন মানুষখেকোর ভয়ে।

'মাঝি বাইয়া যাওরে...' দূরে একটা নৌকার মাঝি গেয়ে উঠল গান। হো হো করে হেসে ফেলল রানা। 'না, এটা অস্ট্রেলিয়ার জঙ্গল নয়, এটা সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা আমার সোনার বাংলা।' নৌকাটা কাছে আসতেই হাঁক দিল সে, 'ও মাঝি, কই যাও?'

'এই তো সামনে ডেমরা।...অকুল দরিয়ার মাঝি আমার ভাঙা নাও...'

'তাহলে শেষ পর্যন্ত কোথায় ল্যান্ড করেছি আমরা?' লজ্জিত কণ্ঠে প্রশ্ন করল সোহানা।

'ডেমরা।' গম্ভীর রানার কণ্ঠ।

***

A SUVOM CREATION